কথামৃত — সপ্তম পর্ব
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ভক্তের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুক্তপুরুষের শরীরত্যাগ কি আত্মহত্যা?

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। বৃহস্পতিবার, ইংরেজী ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ ১১৩)। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীযুক্ত বলরামের সাথে নৌকা করে কলকাতা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। এখানে মাস্টারমশাই খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – **রবিবারই বেশি লোক সমাগম হয়। যে-সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন**।

শ্রীরামকৃষ্ণের খুব বিশেষ যাঁরা ছিলেন, এমনকি পরে সন্ন্যাসী সন্তানরা, স্বামীজী আদি অন্তরঙ্গদের ঠাকুর অন্যান্য দিনে ডাকতেন। কারণ রবিবার দিন অনেকে মন্দির দেখতে আসেন, আর অনেকে যাঁরা ঠাকুরের নাম শুনেছেন, তাঁরা ওই দিন এসে ঠাকুরের কাছে বসতেন। আমরা বড়দের কাছে শুনে এসেছি যে, ঠাকুর অন্যান্য দিনে তাঁর বিশেষ ভক্ত বা অন্তরঙ্গদের উপদেশ দেওয়ার সময় দরজা বন্ধ করে দিতেন। যাঁরা সংসারে আছেন, গৃহস্থদের জন্য এত বেশি ত্যাগের কথা ভাল না।

মাস্টারমশাই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর খুব সুন্দর একটা বর্ণনা দিচ্ছেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁর ভূমিকা ও কাজকর্ম নিয়ে বলছেন। বলছেন, বিজয় অতি পবিত্র বংশে –অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপর বংশের প্রভাব এখন বিস্তার করেছে। এখন তিনি ভক্তিতে ডুবে যাচ্ছেন। ঠাকুরের কাছে এলে তিনি মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শ্রবণ করেন। আবার যখন ঠাকুর হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করেন, বিজয়ও তাঁর সাথে নৃত্য করতে থাকেন। ঠাকুরের কথা শুরু হওয়ার আগে কিছু কথা বলে দিলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আজকে যে প্রসঙ্গগুলি আমরা আলোচনায় আসবে, সেগুলো সম্বন্ধে একটা দুটো কথা বলে দিতে হবে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক সক্রেটিসের নাম আমরা অনেকেই শুনে থাকব। সক্রেটিস সব কিছু খুব যুক্তিপূর্ণ ভাবে দেখতেন। পরে প্লেটো সক্রেটিসের অনেকগুলো কথা তাঁর ডায়লগসে লিখেছেন, যদিও বোঝা যায় না, কোনটা প্লেটোর কথা, কোনটা সক্রেটিসের কথা। সক্রেটিস খুব সাধারণ জীবন-যাপন করতেন, দেখতে ভাল ছিলেন না, ভাল যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু যুদ্ধের বিরোধিতা করতেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত পরিবারের ছেলেরা সক্রেটিসের পিছন পিছন ঘুরত, তাঁর কথা শুনত, inspired ছিল। সক্রেটিসের সাথে এথেন্সের ছেলেদের মেলামেশাটা এথেন্সের কর্তারা পছন্দ করতেন না। সক্রেটিসের একটা বড় সমস্যা ছিল, তিনি খুব ঠোঁটকাটা লোক ছিলেন, কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না। ব্যঙ্গোক্তি সবাইকে করতেন, আর যুক্তিতর্ক দিয়ে সবাইকে ছোট করে দিতেন। এইসব নানা কারণে এথেন্সের কর্তৃপক্ষরা সক্রেটিসের উপর খুব বিরক্ত ছিল।

একবার ওনাকে ডাকা হল, তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ আনা হল যে, তিনি এথেন্সের যুবকদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছেন। এই অভিযোগের জন্য সক্রেটিসকে সাজা দেওয়া হল, তাঁকে রাজ্য ছেড়ে অর্থাৎ এথেন্স

ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওখানে তখনকার দিনে শহরগুলিই ছিল রাজ্য। সক্রেটিস সেখানে ওদের ব্যঙ্গ করতে শুরু করলেন। শহর কর্তৃপক্ষ তখন সক্রেটিসকে বিষপান করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিল। প্লেটোর মত তাঁর শিষ্যরা অনেক চেষ্টা করল, যদি তাঁকে জেল থেকে বার করে নিয়ে আসা যায়। এথেন্সের কর্তৃপক্ষরাও চাইছিল যে সক্রেটিস যদি রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায় ভাল, কারণ তারা চাইছিল না যে সক্রেটিসের মৃত্যুর কারণ তাদের উপর বর্তায়। সক্রেটিস কিন্তু রাজী হলেন না।

এই জায়গাতে একটা খুব সুন্দর কথা আছে – সক্রেটিসের একজন শিষ্য এই ভেবে কান্নাকাটি করছে যে, সক্রেটিস মারা যাবেন। সক্রেটিস তখন হেসে বলছেন, 'মৃত্যুর পর কি হয় আমরা জানি না। মৃত্যুর পর যদি কিছুই না থাকে, তাহলে আমি শূন্যে বিলীন হয়ে যাব'। গীতাতেও যেমন বলছেন, *অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা,* যদিও এটা গীতার মত নয়। অর্থ হল শূন্য থেকে জন্মেছি, মৃত্যুর পর শূন্যে বিলীন হয়ে যাব; আমার চেতনা আর থাকবে না, এরজন্য কান্নাকাটি করার কি আছে। তখনকার গ্রীস দেশের যে চিন্তকরা ছিলেন তাঁদের ধারণা ছিল একটা অনন্ত স্বর্গ আছে; যে ধারণা পরবর্তিকালে খ্রীশ্চান ও মুসলমানরা নিল। ওরা বলে One-time Heaven –ওখানে একবার ঢুকে গেলে ওখানেই থাকবেন। আমরা পরলোক যেভাবে বলি, এটা অনেকটা তাই। একমাত্র হিন্দুরা, তার সাথে বৌদ্ধ, জৈন ও শিখরা মানেন যে, পরলোকে গিয়ে আবার সবাইকে ইহলোকে ফিরে আসতে হবে। অনেকে বলেন যে, এক সময় গ্রীক ফিলজফিতে এই মতবাদ ছিল, কিন্তু পরে তাঁরা এই মতবাদকে সরিয়ে দিলেন।

সক্রেটিস তখন খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – 'সত্যিই যদি পরলোক বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে ওখানে নিশ্চয় আগেকার দিনের জ্ঞানীপুরুষরা আছেন, সেখানে তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু আলাপ-আলোচনা করার দরকার আছে, তাঁদের কাছে আমার অনেক কিছু জানার আছে, আমার অনেক প্রশ্নও আছে। এখানে থেকে আমি সেই প্রশ্নগুলো করতে পারছি না। দু-দিক থেকেই আমার ভাল, এই জীবনে আমি একটা সৎ-জীবন যাপন করলাম, আমার যে জীবনশৈলী, সেখান থেকে আমি নড়লাম না। মৃত্যু যখন হয়ে যাবে, আমি শূন্যে বিলীন হয়ে যাব, আমার কোন চেতনা থাকবে না, সেইজন্য আমার কোন অশান্তি পাওয়ারও কোন সম্ভবনা নেই। আর পরলোক যদি থাকে, এর আগে আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে জ্ঞানীগুণীরা ছিলেন, আমি তাঁদের সাথে দর্শনের উপর কথাবার্তা আদান-প্রদান করব, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে'।

গীতাতে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছাব্বিশ, সাতাশ ও আটাশ এই তিনটে শ্লোকে তিনটে জীবন-দর্শন নিয়ে বলছেন। আমাদের জীবনে প্রধান সমস্যা হল, আমাদের কোন জীবন-দর্শন নেই, আর একেবারেই যে নেই তাও না। আমরা কোথাও মনে করি, আমার এই যে জীবন, এখন যে মুহুর্তে আমি আছি, এটাই একমাত্র সত্য। মহাভারতে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন, জগতে সবচেয়ে বড় আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, মানুষ দেখছে রোজ মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু লোকে মনে করে আমি মরব না। এটা আমাদের একটা বিরাট বড় সমস্যা। যেটা চিরন্তন সত্য, সেটা আমরা মানতে চাই না। মেনে নিলে সেটাকে নিয়ে আমরা ভয়ে মরি।

একটা মজার ঘটনা পড়েছিলাম। আমেরিকাতে এক মা তার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। প্রথম দিন ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে, ছেলেটি খুব কান্নাকাটি করছে। মা তখন ছেলেকে বুঝিয়ে বলছে, 'দেখ বাবা, সবাইকে লেখাপড়া শিখতে হয় আর দশ থেকে পনের বছর সবাইকে পড়াশোনা করতে হয়'। বাচ্চা ছেলে, মায়ের কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করছে, 'মা, ততদিনে তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো'? বাচ্চাটা মনে করছে, পনের বছরের জন্য সে স্কুলে যাবে, মা ততদিন তাকে ভুলেই যাবে। একদিকে তাকে বলা হচ্ছে, পড়াশোনা সবাইকেই করতে হয়, কিন্তু যাকে বলা হচ্ছে, সে আতঙ্কিত হয়ে ভয় পেয়ে যায়। আমাদেরও ঠিক এই সমস্যা। আমরা জানি মৃত্যুই একমাত্র সত্য। কিন্তু

সবার ভিতরে কোথাও একটা এমন ভয় ঢুকে আছে যে, আমরা জীবনটাকে ধরে রাখতে চাই। আমরা এটা ভুলে যাচ্ছি যে, প্রতিক্ষণে আমরা পাল্টাচ্ছি। যখন সুখে থাকি, তখন চেষ্টা করি এটাকে যেন ধরে রাখতে পারি। আবার যখন দুঃখ-কষ্ট আসে, তখন আশা করি আবার আমার ভাল দিন আসবে, সুখ আসবে, এই দুঃখের দিন চলে যাবে। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, প্রতিক্ষণ আমরা পাল্টাচ্ছি, প্রতি মুহূর্তে আমরা disintigrate করে যাচ্ছি।

এই যে আমাদের সমস্যা, গীতাতে যে সুন্দর করে ভগবান তিনটে দর্শন দিলেন – হয় তুমি নিজেকে অবিনাশী আত্মা মনে কর, যে আত্মা সর্বব্যাপী, যে আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। দ্বিতীয়, তুমি নিজেকে সেই আত্মা রূপে মনে কর, যে আত্মা জন্মজন্মান্তরে ঘুরে যাচ্ছে। তৃতীয়, তুমি নিজেকে মনে কর তুমি দেহ, এই দেহে তুমি জন্ম নিলে, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত আর সংযোগ-বিয়োগের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলে, মৃত্যুর পর সব শেষ। এরপর তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, তুমি এটাকেই তুমি সত্য বলে ধরলে। আমাদের সমস্যা ঠিক এই জায়গাতে। একদিকে আমরা মনে করছি জীবনটা সত্য। কিন্তু জীবনটা যদি সত্য হয়, জীবন কোন রূপে সত্য? সেটাকে আমরা আর বুঝতে পারি না। আমি মনে করি, আমার এই অবস্থাটা সত্য, আমার এই অবস্থা যেন চিরন্তন থাকে, যেটা বাস্তবে কখনই সম্ভব না। যদি আমরা একবার বুঝে নিই, ঠিক আছে মানলাম জীবন সত্য, কিন্তু বিভিন্ন মলিক্যুলস দিয়ে আমার এই শরীর, এটা বিঘটিত হয়ে সব ভেঙে যাবে। তখন এই দেহরূপে আমি আর নেই।

ঠাকুর এখন যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন, মূলতঃ দুটো জিনিসকে নিয়ে ঠাকুর এখানে আলোচনা করবেন। জীবনে আপনি যদি শান্তি চান, তাহলে একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, মৃত্যুর পর আপনি কি চান? এই মুহূর্তে যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তখন এই জগৎটা আপনার পিছনে থেকে গেল। আপনার বাড়িতে যে কজন আছেন, বন্ধুবান্ধব যাঁরা আছেন, সবাই আপনার পিছনে থেকে গেল। সামনে এবার আপনি কি পেতে চান? আপনি যখন কোথাও বেড়াতে যান, তখন আপনি আশা করেন, আমি অমুক জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে আমি এই এই জিনিস পেতে চাই। এই এই দেখার জিনিস থাকবে, থাকার জন্য এমন জায়গা হবে, খাওয়া-দাওয়া এমন এমন হবে, এগুলো আপনি পেতে চাইছেন। ঠিক তেমনি ভেবে দেখুন, মৃত্যুর পর আপনি কি চান? সক্রেটিস যেমন বলছেন, মৃত্যুর পর আমি ওখানে আগেকার জ্ঞানীদের সাথে কথা বলব। আপনি কি চান? টিয়া পাখির মত দুটো কথা শুনে আমরাও সহজ উত্তর দিয়ে দিই – ঠাকুরের কাছে থাকব। ঠিকই, ঠাকুরের কাছেই থাকবেন।

কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে, শূন্য থেকে আকাশে যাওয়া যায় না। কোন মাল্টি-স্টোরেড বিল্ডিংএর তলায় মাটিতে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছেন হুঁশ করে চল্লিশ তলায় পৌঁছে যাবেন, সেটা হয় না। হয় আপনাকে সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে, নয় লিফট বা এসকেলাটার দিয়ে, যেটা দিয়েই হোক, আপনাকে ধাপে ধাপে ওখানে পৌঁছাতে হবে, ম্যাজিক্যালি আপনি যেতে পারবেন না। ঠাকুরের যদি দর্শন হয়, সেটাও আপনার ম্যাজিক্যালি হবে না, ধাপে ধাপে হবে। ঠাকুর আগের এক জায়গায় বলছিলেন, একটা পুকুরে কাঠ শেকল দিয়ে বাঁধা, একটা একটা শেকল ধরে ধরে এগোতে হয়। সক্রেটিস বলছেন, আমি আগেকার জ্ঞানীদের সাথে কথা বলব। সক্রেটিসের একটা প্রস্তুতি আছে, সেই প্রস্তুতির জন্য তিনি তখন এই কথা বলতে পারছেন।

যাঁদের মধ্যে সত্যিকারের একটা সংস্কৃতির বোধ আছে, তাঁদের যদি বলা হয়, যাঁরা মারা গেছেন তাঁরা সবাই স্বর্গে আছেন, আপনিও সেখানে যাবেন। তখন আপনার মধ্যে যদি সাহিত্যের সংস্কৃতি থাকে তখন আপনার খুব ইচ্ছে হবে যে, যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁর চরণস্পর্শ করে তাঁকে আমার প্রণাম জানাব বা শরৎচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম করব। আবার যারা ক্রিকেটের ভক্ত, তারা কোন বড় ক্রিকেটারের নাম করে বলবে। আপনার মন যেমনটি, আপনি তেমনটি লোকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে চাইবেন, তাদের সাথে কথা বলবেন বা তাঁদের সাথে থাকতে চাইবেন। এই প্রস্তুতিটা যদি

না থাকে, তখন আপনার সামনে থাকলেও বুঝতে পারবেন না। আমার যেমন ব্যক্তিগত ভাবে ফুটবলে কোন আগ্রহ নেই, প্লেয়ারদের নামও সব জানি না। একটা নাম শুনেছি পেলে, ছোটবেলায় চুনী গোস্বামীর নাম শুনতাম, পরে বাইচুং ভুটিয়া, এই কয়েকটা নাম শোনা, কিন্তু এনাদের সাথে মেলামেশা করার কোন আগ্রহ আমার নেই।

মৃত্যুর পর আমি যদি এমন কোন স্বর্গে যাই যেখানে এই রকম নামকরা ফুটবলাররা আছেন আর যদি এমন হয় ওনাদের সঙ্গেই থাকতে হবে, সময় কাটাতে হবে, তাহলে আমাকে একটা প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি ঠাকুর, ঠাকুরের পার্ষদরা আর আগেকার বড় বড় স্বামীজীরা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সাথে যদি সময় কাটাতে চান, আপনার কি সেই প্রস্তুতি আছে? ঠাকুরকে একবার দেখে বললেন, খুব ভাল লাগল আপনাকে দেখে। একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম না হয় করবেন। তারপর কি বলবেন? যাঁদের সাথে আমাদের মনের মেলবন্ধন নেই, মন সেই অবস্থায় পৌঁছে যায়নি, সেখানে একটা দুটো কথা বলার পর, আর কথা বলার কিছু খুঁজে পাবেন না। সেইজন্য বারবার ভাবতে হয় মৃত্যুর পর আমি কি চাই। যেটা চাই, সেটার জন্য কি প্রস্তুত? জীবনে যদি শান্তি চান, জীবনে যদি সমৃদ্ধি চান, তাহলে এ-জিনিসটা খুব দরকার।

এই জায়গাতে তখন পরবর্তি যেটা আসে, সেটা হল আত্মহত্যা, যেটা এখানে এক্ষুণি আলোচনা হতে যাচ্ছে। মানুষ যে আত্মহত্যা করে, তার মানে মৃত্যু যেটা হবার, সেটাকে সে জোর করে এগিয়ে নিয়ে এলো। ভাল, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কি আশায় আপনি মৃত্যুকে ডেকে আনলেন? মানুষ আত্মহত্যা কেন করে? Clinical depressionএ মানুষ আত্মহত্যা করে। Clinical depression কেন হয়, এর উপর ডাক্তাররা অনেক গবেষণা করে যাচ্ছেন। ডোপামিন নামে একটা কেমিক্যাল আছে, সেটা যখন ব্রেনে কমে যায় তখন মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে আত্মহত্যা করার প্রবণতা এসে যায়। বিশেষ একটা ওষুধ খাইয়ে দিলে ওই কেমিক্যালটা আবার নরমাল হয়ে যায়।

এর বাইরে যারা আত্মহত্যা করে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কারণ একটাই –কোন জিনিসের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি। আসক্তি এত প্রচণ্ড, আর এত গভীর যে, সেই আসক্তি কখন পূরণ হতে পারে না। গীতাতে ভগবান আবার বলছেন *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে*, একটা জিনিসকে চিন্তা করতে করতে এমন আসক্তি জন্মায় যে, সেখান থেকে নামতে নামতে তার বুদ্ধিটাই নাশ হয়ে যায়। যারাই আত্মহত্যা করে, যদি clinical depression না থাকে, একটা জিনিসকে চিন্তা করে করে সেই জিনিসে তার এত আসক্তি হয়ে গেছে যে, নিজেকে সে আর সামলাতে পারে না। ওই আসক্তি যখন আর মেটাতে পারে না, তখন সে বলে আমি আর বাঁচতে চাই না। খুব ভাল, তুমি তো গলায় দড়ি দিয়ে, ট্রেনের তলায় ঝাপ দিয়ে, গলায় খুড় দিয়ে বা যা যা করে আত্মহত্যা করা যায় করে নিলে, তোমার মৃত্যু হয়ে গেল। কিন্তু তারপর কি? মানুষ যখন কিছু করে, এতক্ষণ আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম; যদি আপনি মনে করেন, এই জীবনের পরে কিছু নেই, you only live once(YOLO), এটাই যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তো আর কটা দিনের ব্যাপার, শুধু শুধু মরে গিয়ে তোমার লাভ কি?

কিন্তু যেটা বলা হল, জীবনে যদি শান্তি চান, সমৃদ্ধি যদি চান, শক্তি যদি চান; সব সময় ভাববেন –মৃত্যুর পর আপনি কি চাইছেন। আগামী জীবন আপনি কি রকম চাইছেন? আগামী যে জীবন আপনি চাইছেন, সেটা আপনাকে এই জীবনে অর্জন করে নিতে হবে। চাষীরা যখন ধান উৎপাদন করতে চান, তখন ধানের বীজ বপন করেন, গম চাইলে গমের বীজ বপন করেন। আগামীকাল আপনি কি চাইছেন, আজকে আপনাকে সেই বীজ বপন করতে হবে। যে লোকটি আত্মহত্যা করছে, আগামীকাল সে কি চাইছে? সে মনে করছে, আমি চোখ বুজলেই সব শেষ, কিন্তু কিছু শেষ হয় না। আমার নূতন বই ক্রতুতে এটাই দেখিয়েছি, কিছু শেষ হয় না, যেমন আছে তেমন চলতে থাকে। কোন মেয়ে ওই

রকম আত্মহত্যার প্রবণতা আছে শুনে ঠাকুর বলছেন, মরে প্রেতনী হবে, তার মানে প্রেতলোকে গিয়ে পড়বে। প্রেতলোকে কামনা-বাসনা সাংঘাতিক, কিন্তু পুর্তি করার কোন উপায় নেই।

আমি যে মহারাজের কাছে অনেক কিছু শিখেছি, পূজ্যপাদ রাম মহারাজ, অনেক আগে উনি বলতেন, 'দেখ, কম বয়স থাকতে থাকতে প্রস্তুতি নিতে হয়। তা নাহলে কি হয়, একটা বয়স, ষাট পয়ষট্টি পেরিয়ে যাওয়ার পর মনের ভিতর কামনা-বাসনাগুলি থেকে যায়, কিন্তু শরীর আর ইন্দ্রিয় সাথ দেয় না, যার জন্য তখন ছটফটানিটা অনেক বেড়ে যায়'। প্রেতলোকে ঠিক এটাই হয়। ইচ্ছাটা থেকে যায়, ছটফটানিটা বেড়ে যায়; ফলে কি হয়, যন্ত্রণাটা অনেক গুণ বেড়ে যায়। আমরা শুনি ইয়ং ছেলে বা মেয়ে বাবা-মার কাছে মোবাইল চাইল, বাবার ক্ষমতা নেই কোত্থেকে দেবে, মোবাইল ফোন পেল না বলে সুইসাইড করে নিল। এই যে তার বাসনা, এই যে ইচ্ছা; সেই ইচ্ছা নিয়েই সে মরবে। জীবন চলতে থাকবে, এখন সে যে লোকে যাবে সেখানে তার ইচ্ছাটা থেকে যাবে, কিন্তু পূর্ণ করার কোন পথ নেই। সেইজন্য সময় থাকতে থাকতে একটা প্রস্তুতি নিতে হয়।

লোকেরা যে মনে করে বয়স হলে আমি ধর্মকর্মে মন দেব, বুড়ো বয়সে গীতা পড়ব –খুব ভুল মনে করছে, কখনই বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে ধর্মকর্ম হয় না। আমাদের দাদু, ঠাকুরমা, দিদিমাদের কথা মনে করুন, সারাটা জীবন এনারা সবাই একটা ধর্মজীবন পালন করে গেছেন, আর তার সাথে যেমন যেমন তাঁদের বয়স বেড়েছে, সাংসারিক কাজকর্ম কমিয়ে দিয়েছেন এবং সংসার থেকে আস্তে আস্তে মনটাকে তুলে নিয়েছেন। সাংসারিক কাজ যত কমবে আর তার সাথে ধর্ম পথে মন যত এগোতে থাকবে, এতেই প্রস্তুতিটা হয়ে যায়। ফলে কি হয়, মৃত্যু যখন আসে মানুষ তখন নির্বিকার ভাবে সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে। মৃত্যুচিন্তা সব সময় করতে হয়, আর মৃত্যুর পরে আমি কি চাই, সেটাকে পাওয়ার জন্য সর্বদা মৃত্যুচিন্তা করে করে প্রস্তুতি নিতে হয়। তার সাথে মনে রাখতে হবে, আত্মহত্যা জিনিসটা অত্যন্ত বাজে। এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে এবার আমরা দেখব কথামৃতে ঠাকুর কি বলছেন।

বিষ্ণুর এঁড়েদয়ে বাড়ি, তিনি গলায় ক্ষুর দিয়া শরীরত্যাগ করিয়াছেন। আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হইতেছে।

এখানে আমরা এই অংশের পুরোটা পাঠ করব না। শ্রীশ্রীমা যখন কথামৃত শুনেছিলেন তখন সেখানে এই বর্ণনাটা ছিল। মা এই জিনিসটা পছন্দ করেননি, মাস্টার যে কেন এই কথাগুলো ছাপলেন! মাস্টারমশাই একটু depressive tendencyর ছিলেন, অনেকবারই আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছিলেন। ফলে কিছু কিছু কথা এখানে আছে, যে কথাগুলো ঠাকুর বিশেষ লোককে বলছেন; সব কথা সবার জন্য নয়।

ঠাকুর বলছেন – **দেখ, এই ছেলেটি শরীরত্যাগ করেছে শুনলুম, মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে**। খুব interesting, পরে বলবেন, ওর হয়ত শেষ জন্ম ছিল। হয়ত শেষ জন্ম ছিল, এটা এক নম্বর। দ্বিতীয়, ঠাকুর অবতার, তাতেও তাঁর মন খারাপ হচ্ছে। কারণ আত্মহত্যা জিনিসটা অত্যন্ত বাজে। কোন ধর্মই আত্মহত্যার অনুমতি দেয় না। সক্রেটিস পরলোক বলে কিছু বিশ্বাস করতেন না, তাতেও তিনি এভাবে কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা হিন্দুরা মানি, শুধু আমরাই না, যাঁরাই ধর্ম পথে আছেন, এবং মোটামুটি সব ধর্মে মানে, মৃত্যুর পর একটা জীবন আছে। ওই জীবনের জন্য এই জীবনেই প্রস্তুতি নিতে হয়।

ঠাকুর বলছেন, **এখানে আসত, স্কুলে পড়ত, কিন্তু বলত –সংসার ভাল লাগে না...... ধ্যান করত, বলছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করি**। এইসব বলে ঠাকুর বলছেন –**বোধ হয় –শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হয়ে গেল**। ঠাকুর এখানে বলছেন না যে, জিনিসটা এই রকমই। বলছেন, বোধ হয় এই রকম ছিল। কারণ, ঠাকুরের খুব পরিচিত একজন গলায় খুর দিয়েছে, ওনারও এটা ভাল লাগছে না। উনি কোথাও নিজের মনকে শান্ত করছেন,

অপরের সামনে এই জিনিসটাকে আদর্শ রূপে থাকতে দিচ্ছেন না। কিন্তু ভালবাসেন বলে, একেবারেই যে উড়িয়ে দিতে চাইছেন তাও না, আর এই কথাগুলো সত্য যে, সে ধ্যান করত, দ্বিতীয় ঠাকুর মনে করছেন, এটা হয়ত ওর শেষ জন্ম ছিল।

ঠাকুর এরপরেই বলছেন –**পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়**। মৃত্যুর পরে কিছু যদি নাই থাকে, তাহলে তো ধর্ম থাকবে না। তাই এটাই স্বাভাবিক যে ঠাকুর এই জিনিসটা মানবেন। সংস্কারকে নিয়ে অনেক সময় নানা রকম প্রশ্ন ওঠে। কি করে সংস্কার চলে? আমাদের মন মৃত্যুর পরে এই দেহকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আত্মা যে মনের সঙ্গে জুড়ে থাকে, এটাই পুনর্জন্মের কারণ। মন যখন আত্মার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, সেটাই মুক্তি। শুদ্ধ চৈতন্য এই যে শরীর মনের সাথে জুড়ে থাকে, এটাই আমাদের এই শরীর, এই জীবন। শুদ্ধ চৈতন্য শুধু যখন মনের সঙ্গে জুড়ে থাকে, এটাই স্বপ্নাবস্থা। চৈতন্য যখন শুদ্ধ শরীরে চলে যায় শুদ্ধ রূপে সেটাই মুক্তি। পুনর্জন্মের বর্ণনা করেতে গিয়ে বলেন, মন আর ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে জীবাত্মা এই দেহ থেকে কিভাবে বেরিয়ে চলে যায়। মন একটা ডায়নামিক জিনিস, আমরা যাবতীয় যা চিন্তা-ভাবনা করেছি তার যে ছাপ, যে কর্মগুলি করেছি তার যে ছাপ, এটাই মন। মন সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। পিছন থেকে যে জিনিসগুলোকে নিয়ে আসছে, এটাই হল সংস্কার।

ঠাকুর এখানে একটা গল্প বলছেন, খুব নামকরা গল্প। ঠাকুর এসব গল্প শুনেছিলেন, তিনি গল্প তৈরী করতেন না। সংক্ষেপে গল্পটা হল –একজন শবসাধন করছিল। হঠাৎ সে নানা রকম বিভীষিকা দেখতে লাগল, তন্ত্রাদিতে এরকম বলে। আর তাকে একটা বাঘ এসে নিয়ে চলে গেল। ঈশ্বরের নাম করছে, তাকে বাঘে খেয়ে নিল। অন্য দিকে আরেকজন বাঘের ভয়ে গাছের উপর বসেছিল। পূজার সব উপকরণ সব প্রস্তুত দেখে সে গাছ থেকে নেমে আচমন করে শবের উপর বসে জপ করতে শুরু করল। একটু জপ করতে না করতেই তাকে ভগবতী এসে দর্শন দিলেন। মা যখন তাকে বর নিতে বললেন, তখন লোকটি বলছে, 'বর পরে নেওয়া যাবে মা, আগে আপনি আমাকে এটা বোঝান, যে লোকটা এত কিছু আয়োজন করে সাধনা করল কিন্তু তাকে বাঘে খেয়ে নিল, তাকে আপনি দয়া করলেন না। আর আমি কিছুই করলাম না, আমি সাধন জানি না, ভজন জানি না, তাও আমাকে দর্শন দিলেন'।

ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, 'বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল কি বর চাও''? এগুলো আখ্যায়িকা, কাহিনী দিয়ে একটা সত্যকে বোঝান হয়, সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। কাহিনী বা উদাহরণ বা উপমা দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মনে রাখবেন, গল্পের গরু গাছে ওঠে, ওর কোন দাম নেই। শাস্ত্রে যখনই কোন আখ্যায়িকা আসে; ঠাকুর, মা, স্বামীজী, এনারা যখনই কোন গল্প বলেন, তখন তাঁরা একটা সত্যকে বোঝানর জন্য গল্প বলেন। যেমন সিংহের বাচ্চা ভেড়ার মধ্যে থেকে বড় হচ্ছে, এটা একটা গল্প, এই গল্প একটা সত্যকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। যেমন বলছেন, সিংহের বাচ্চা ঘাস খাচ্ছে, সিংহের বাচ্চা কি কখন ঘাস খেতে পারে? এই ধরণের নানা রকম প্রশ্ন আসবে। কিন্তু একবার যদি বুঝে যাই যে, গল্প দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় না, সত্যকে বোঝানর জন্য গল্প বলা হয়, তখন আর নানা ধরণের প্রশ্ন আসবে না। আমার আপনার তো জানা নেই আমার আপনার কি সংস্কার। ঠাকুর যখন দর্শন দেবেন, তখন জানতে পারব আমার কি সংস্কার। ততদিন তাই সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

ঠাকুর বলছেন – **আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে**। এটা ঠাকুরের কথা, এখানে আর কাহিনী কিছু নেই। এই জিনিসটাকে বলার জন্য আমরা এত বড় ভূমিকা নিলাম। পরের পরিচ্ছেদে ঠাকুর বলবেন –সংসারে কত যন্ত্রণা। আমরা শুনছিলাম আম্ফান আসছে। তার কিছুদিন পর বিশাল ঝড় এসে এক বিরাট তাণ্ডব চালিয়ে গেল।

বলছে, পনের হাজার গাছ নাকি পড়ে গেছে। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা বিরাট গাছ পড়ল, চারদিন আমাদের এখানে কোন বিদ্যুৎ ছিল না, জেনারেটারও চলছিল না। চারদিন ধরে আমরা চুপচাপ পড়ে ছিলাম। গ্রামে-গঞ্জে এখনও লোকেরা অন্ধকারে পড়ে আছে, তবে গ্রামের লোকেরা তাও সেইভাবে জীবনকে তৈরী করে রাখেন। কিন্তু আমাদের জীবন তো অন্য রকম হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। ইউনিভার্সিটির সমস্ত কাজ বন্ধ, সমস্ত সংস্থা বন্ধ, সব কিছু বন্ধ। কোন রকমে জীবন চালিয়ে যাওয়া।

আমার বন্ধুরা নামকরা কথা মেসেজ করছেন –This too shall pass। সে তো সবাই জানে, কিছুই থাকবে না, সব চলে যাবে, আমার জীবনটাও চলে যাবে। আম্ফানের যন্ত্রণার আগে থেকে করোনার যন্ত্রণা চলছিল, অনেকদিন ধরে চলেছে। এরপর আবার অন্য যন্ত্রণা আসবে। জীবন মানেই যন্ত্রণা থেকে যন্ত্রণাতে চলা। তারই মধ্যে আমরা মনে করি আমরা একটু সুখ পাচ্ছি। কিভাবে পাচ্ছি? ঠাকুর বলছেন –উট কাঁটা ঘাস খায়, নিজের মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, রক্তের নোনতা আস্বাদ পেয়ে বলছে –কি ভাল লাগছে। আমি দুজন কথা বলার লোক জুটিয়ে তাদের সাথে দুটি কথা বলে, মিষ্টি ব্যবহার করে মনে করতে থাকি, প্রাণটা যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, যে কোন লোকের আসাটাও যন্ত্রণা, থাকাটাও যন্ত্রণা, যাওয়াটাও যন্ত্রণা। বলে, টাকা আয় করাও কষ্ট, টাকা ধরে রাখাটাও যন্ত্রণা; এই বুঝি চোরে নিয়ে গেল আর টাকা যখন চলে যায় তখনও কষ্ট। নিউজে দেখি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, এটিএম জালিয়াতি কত কিছু হচ্ছে। কষ্ট করে টাকা আয় করেছেন, সেই টাকা নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা অশান্তির মধ্যে থাকতে হচ্ছে, কখন কি হবে কে জানে। যন্ত্রণা তো লেগেই আছে। প্রকৃতি এমন এক ব্যবস্থা করে রেখেছে, মাঝে মাঝে একটু সুখ দিয়ে আনন্দ পাইয়ে দেন, সেই আনন্দের আশায় জীবন যন্ত্রণা থেকে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে যায়।

তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে কেউ শরীরত্যাগ করে...... এই জিনিসটার আলোচনা আমরা এখানে করছি না। শ্রীশ্রীমাও এগুলো পছন্দ করতেন না, আমাদেরও পছন্দের জিনিস না। এখানে ঠাকুর কাউকে একটা কথা বোঝানর জন্য বলছেন। প্রথম কথা, যাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে সে মরতে চাইবে কেন? সে তো ঠাকুরের কথায় মজার কুটি মনে করবে, দেখবে সবটাই ঈশ্বরেরই। সব কিছুতে ঠাকুর ইতিবাচক কথা বলতেন, সেইজন্য তিনি এভাবে বলছেন। কিন্তু এটা মনে রাখবেন, কোন পরিস্থিতিতেই আত্মহত্যা করা যায় না, তা আত্মজ্ঞান লাভ করার পরেই হোক বা আত্মজ্ঞান লাভ না করেই হোক; আত্মহত্যা ঘোর ধর্মবিরোধী কর্ম। তবে আত্মজ্ঞানীর কাছে পাপপূণ্য বলে কিছু থাকে না, ধর্ম-অধর্ম বলে কিছু থাকে না। ঠাকুর ঠিক এর আগের লাইনে যেটা বললেন, আত্মহত্যা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হয়, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, এটাই হল সত্য।

কেন আসতে হয়? কারণ সংসার মানেই আসক্তি, আসক্তি থেকেই সংসার; আত্মহত্যা যারা করে তাদের আসক্তি হল চরম অবস্থায়। আমার আপনার সবারই আসক্তি আছে, আপনার মনেও কামনা-বাসনা আছে, আমার মনেও কামনা-বাসনা আছে। কিন্তু যারা আত্মহত্যা করে, তাদের যে আসক্তি, তাদের যে কামনা-বাসনা অনিয়ন্ত্রিত। একেবারে অনিয়ন্ত্রিত, পুরোপুরি উন্মাদ অবস্থা, ওই অবস্থায় কামনা-বাসনা, আসক্তি এগুলোকে সামলাতে পারে না; ব্রেকফেল গাড়ির মত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীব চার থাক – বদ্ধজীবের লক্ষণ কামিনী-কাঞ্চন

এর আগেও ঠাকুর বদ্ধ, মুমুক্ষ, মুক্ত ও নিত্য, জীবের এই চার থাক নিয়ে বলেছিলেন। পুকুরের উদাহরণ দিচ্ছেন। জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরে। কিছু মাছ সেয়ানা, তারা জালের ধারে কাছে আসে

না, এনারা নিত্যজীবের উদাহরণ। যে মাছগুলো জালের মধ্যে পড়ে গেল, তাদের মধ্যে কিছু মাছ জাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করে, এরা হল মুমুক্ষু জীবের উদাহরণ। ছটফট করা মাছের মধ্য থেকে কয়েকটা জীব বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, এনারা হলেন মুক্ত জীব। বাকিরা নিজেদের খুব সেয়ানা মনে করে, তারা মনে করে আমার কিছু হবে না, সে জালটাকে মুখে নিয়ে আরও পাঁকের ভিতরে মুখ গুজে পড়ে থাকে।

নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসারজালে পড়ে না। নারদের কাহিনী হল, ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করেন, প্রথমে তিনি তাঁর মন থেকে কয়েকজনকে সৃষ্টি করেন, নারদ তাঁদের মধ্যে একজন। ব্রহ্মা প্রথমে চারজন কুমারের জন্ম দেন –সনক, সনন্দন, সনৎ ও সনাতন। ব্রহ্মার শুদ্ধ সত্ত্বগুণের মন থেকে এই চার কুমারের জন্ম হওয়াতে এনারা সবাই ত্যাগ বৈরাগ্য নিয়ে সংসার থেকে বেরিয়ে গেলেন। নারদ ঠিক সনক সনন্দনদের মত ছিলেন না, কিন্তু তিনিও ঘর-সংসার করতে চাইলেন না। ব্রহ্মা চাইছিলেন নারদও সংসার ধর্ম পালন করে তাঁর সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করেন। কিন্তু নারদ সংসারে ফিরতে চাইলেন না। ব্রহ্মা তখন নারদকে অভিশাপ দিলেন, 'তুমি সংসার ছেড়ে চলে যেতে চাইছ তো, যাও তুমি গিয়ে গন্ধর্বলোকে জন্ম নাও, সেখানে গিয়ে তুমি নাচ-গান নিয়েই থাক'। নারদও গন্ধর্বলোকে এসে নাচ-গান শিখে ভগবানের কীর্তন করতেই থাকলেন। জীবনে নারদ অনেকের অভিশাপ কুড়িয়ে ছিলেন। মূল কথা হল, নারদ কোথাও, কোন লোকে গিয়ে ঘর-সংসার করলেন না, আর আমাদের বিশ্বাস এখনও তিনি আছেন ও সর্বদা ঈশ্বরের নামগুণগানকীর্তন করে যাচ্ছেন।

যাই হোক, বদ্ধজীব, মুমুক্ষজীবের উপর আগেও আলোচনা করেছি, তাই বেশি আলোচনাতে যাচ্ছি না। ঠাকুর বলছেন –**বদ্ধজীব, সংসারে –অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে –আসক্ত হয়ে আছে; কলঙ্ক-সাগরে মগ্ন, কিন্তু মনে করে বেশ আছি**। আমরা সবাই এতেই মগ্ন হয়ে আছি, আমাদের সবারই এই সমস্যা, মনে করছি আমরা সবাই বেশ আছি। **যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না। তাই কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর, ভগবানলাভের পর শরীরত্যাগ করে। কিন্তু সে-রকম শরীরত্যাগ অনেক দূরের কথা**। ঠাকুর বলছেন, নির্বিকল্প সমাধিলাভের একুশ দিন পর দেহত্যাগ হয়। এখানে অন্য জিনিস, তাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, এখন আর অন্য জিনিস ভাল লাগে না। কিন্তু শরীরত্যাগের ব্যাপারে বলছেন, *তবে এগুলো অনেক দূরের কথা*।

বদ্ধজীবের –সংসারী জীবের –কোন মতে হুঁস আর হয় না। আমাদের সবারই এই অবস্থা। অহরহ দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছি, জ্বালা-যন্ত্রণা পাচ্ছি কিন্তু আশায় থাকি এবার ভাল কিছু অবশ্যই হবে। ওই আশা নিয়েই আমরা ঘুরঘুর করে যাচ্ছি। কেন? এক সময় আমি মার্ক টুইনের লেখা খুব পড়তাম। এখন অবশ্য কারুরই লেখা পড়তে ভাল লাগে না। তিনি এক জায়গায় বলছেন, 'সিগারেট ছাড়া খুব সোজা, আমি শতাধিক বার ছেড়ে দিয়েছি'। যখন পড়েছিলাম, তখন আমার খুব মজা লেগেছিল; বয়স কম ছিল কিনা। পরে আমি ভাবতে লাগলাম, এ-রকম কেন হয়? বছরের প্রথম দিন আমরা সঙ্কল্প করি, আমরা এই এই করব, এই এই করব না। একটা দিন যেতে না যেতেই আমরা সঙ্কল্প থেকে সরে আসি। তার কারণ হল, আসলে আমাদের মনের যে অবস্থা, ভিতরে যে সংস্কার, সেই সংস্কারের দৌলতে ওই জিনিসটার প্রতি আসক্তি। কিন্তু কোনও একটা কারণে কোথাও আমরা শুনে নিয়েছি যে, জীবনটা এই রকম না হয়ে অন্য রকম হওয়া ভাল বা যে জিনিসটার প্রতি আসক্তি, সেই জিনিসটা থেকে যখন মার খেতে থাকি, তখন মনে হয় এখান থেকে বেরিয়ে আসব। কিন্তু যেটা আমাদের স্বরূপ, যেটা আমাদের স্বভাব, সেটা যাবে না। ফলে আমরা বারবার ওটাই করি।

কোন একটা অন্যায় একবার মানুষ করতেই পারে। যুধিষ্ঠির বলছেন, যে কোন মানুষ যদি একবার কোন দোষ করে থাকে, সেই দোষের জন্য মানুষটিকে অবশ্যই ক্ষমা করতে হয়। কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার সেই দোষটা করেন, সেই ভুলটাই করেন, তাহলে বুঝতে হবে, এটা সে দোষ করছে না,

এটাই তার স্বভাব। এই স্বভাবটাকে ঠিক করার জন্য তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তার জন্য আমাদের সংস্কারটা, অর্থাৎ ব্লুপ্রিন্টটা পাল্টাতে হবে।

এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না। চৈতন্য হবার কথা নয়, কারণ তার সংস্কারটাই অন্য রকমের, ওই সংস্কারকে পালটানো খুব মুশকিল। আগুনে কোন বাচ্চা যদি হাত দিয়ে দেয়, দ্বিতীয়বার সে আর কোন দিন আগুনে হাত দেবে না, কারণ সে জেনে গেছে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। মায়েরা যখন ওভেনে বা উনুনে রান্না করেন, ওনারা জানেন আগুন থেকে বাঁচিয়ে কিভাবে রান্নাবান্না করতে হয়, তাদের হাত পোড়ে না। তা সত্ত্বেও আমরা জীবনে কামিনী-কাঞ্চনের পিছনে দৌড়ে এত হাত পোড়াই কেন? কারণ, আমার ওটা স্বভাব, ওটা আমার স্বরূপ। সেখান থেকেই তো আমাদের এই যত জ্বালা-যন্ত্রণা। এই জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে আগে নিজের স্বভাবকে পাল্টাতে হবে। এরজন্য সব থেকে সহজ উপায় হল – হাতজোড় করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা। ঠাকুর পর কেউ নন, তিনি আমাদের অন্তর্যামী, আমাদের ভিতরেই তিনি আছেন, বাইরে কিছু নেই।

তবুও চৈতন্য হয় না বলে ঠাকুর উটের কাঁটা ঘাস খাওয়ার উদাহরণ দিয়ে বলছেন – **সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি**। কারণ এটা আমার স্বভাব, স্বরূপ আমার, এটা থেকে বেরোতে পারি না। যদি কেউ সত্যিকারের এই স্বভাব থেকে বেরোতে চায়, তাহলে দিনরাত ঠাকুরের কাছে যদি প্রার্থনা করা হয়, তখন আস্তে আস্তে স্বভাবের পরিবর্তিন হতে থাকে। ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, প্রথমে জ্বরটাকে কমানো হয়, এবার ওষুধটা কাজ করবে। এখনও তাই করা হয়, জ্বর খুব বেড়ে গেলে আগে ওষুধ খাইয়ে জ্বরটাকে নামানো হয়। আমরা হলাম হাই টেমপারেচারের রোগী, কোন রকমে আগে প্রাণ বাঁচাতে হবে। প্রাণ বাঁচানোর পর ওষুধটা কাজ করবে। ঠাকুরের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করলে, ওই স্বভাবের প্রকোপটা একটু কমলে, তারপরে লড়াই শুরু হয়। ঠাকুরের কাছে যদি প্রার্থনা করা হয়, তখন কি হয়, ওই যে কাঁকড়া বিছের মত আঁকড়ে ধরে আছে, ওটা একটু আলগা হয়; মরণকামড়টা আর হয় না, এরপর কিছু করা যায়।

স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করবে। ঠাকুরের এই অসতী হওয়ার কথা শুনে মাঝে মাঝে ভাবি, কোথায় কামারপুকুর গ্রামে থাকতেন, কলকাতায় অত ছোট জায়গায় ছিলেন, কোথা থেকে ঠাকুর অত কথা জানলেন ভেবে অবাক লাগে। অসতী হওয়া, তার মানে ঠাকুরের সময়ে, গ্রাম দেশেও এই জিনিসগুলো ছিল। **ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধল, গয়না পরল**।

আপনার মনে প্রশ্ন উঠবে, তাহলে আমি শোক পেলাম বলে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য শোক করতে থাকব? আপনি কখনই এটা করতে পারবেন না। আচার্যরা যখন আসেন, মানে অবতাররা যখন আসেন, ওনারা হাইডোজ্ ওষুধ দিয়ে দেন। ওটাই যখন আমাদের কাছে আসে, অনেক ডাইলুট করে করে তারপর নিয়ে আসা হয়। এনারা জীবনের আদর্শ দিয়ে দেন, উদ্দেশ্য হল, এটাকে মনে রাখবে, তুমি এখন যে পরিস্থিতিতে আছ, এই পরিস্থিতিতে কি কোন কষ্ট পেয়েছ? হ্যাঁ কষ্ট পাচ্ছি। আবার যদি ওটা কর আবার কষ্ট পাবে। যদি মনে কর, এখন যেটা করছ, পরে সেই জিনিস করে তোমার ভাল হবে, তাহলে মনে রেখো, তাতে ভাল হবে না। তার মানে এখানে কর্মের একটা ব্যাপার আছে। কিছু লোকের বাজে কর্ম থাকে, সে যেটাই করবে সেটাই খারাপ হবে। কোন কারণে একটা ভাল হয়ে গেল, তাতে লাফাতে শুরু করে – কিন্তু না, আবার ওই খারাপটাই হবে। দুম্ করে একটা লেগে গেছে বলে মনে করবেন না যে পরেও আবার এই রকম ভাল হবে, না হবে না, পরে আবার ওই খারাপটাই হবে, কারণ ওটা আপনার জীবনের ধারা নয়।

আবার বলছেন –**এরকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে**। সংসারের দিকে তাকালে দেখা যাবে চারিদিকে এই সমস্যা। **যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়**। আসলে আগেকার দিনের লোকেরা এতকিছু ভাবনচিন্তা করতেন না, বিশেষ করে গ্রামদেশে। এখন কিন্তু শহর আদিতে এ-রকম হয় না। এখন জীবনযাত্রার মানও অনেক বেড়ে গেছে। আগে বাড়ির লোকদের শিক্ষার্জনের পিছনে বেশি অর্থব্যয় করতে হত না, সেখানে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেইজন্য লোকেরা এখন অনেক ভাবনা-চিন্তা করে পরিবার ছোট রাখে। কিন্তু এই ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও মাথায় থাকে টাকা-পয়সার সাশ্রয় করা। তখনও কিন্তু জীবন আদর্শ রূপে হয় না।

আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না। ঠাকুর সংসারীদের বর্ণনা করছেন। কিন্তু এই অর্থে আমরা ঠিক সংসারী বা বদ্ধজীব নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা শাস্ত্রালোচনা শোনেন, তাঁরা বদ্ধ জীব নন, তাঁরা মুমুক্ষু। এনাদের চেষ্টা আছে, লড়াই এবার সমানে সমানে শুরু হয়ে গেছে। ঠাকুর যে বদ্ধজীবের বর্ণনা করছেন, মাছের উপমা টেনে যে বদ্ধজীবের কথা বলছেন, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত তাঁরা সে-রকম নন। সংসারের প্রতি একটা আসক্তি এখনও থেকে গেছে, সেইজন্য সংসারের দিকেও যাচ্ছেন, কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রের প্রতি যে নিষ্ঠা, এটা এবার লড়াই শুরু করিয়ে দিল। টাগ অফ ওয়ার, দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গেছে, এই লড়াইয়ে কিন্তু সংসার আর জিতবে না। কিছু দিন সংসার থাকবে, তারপর ধীরে ধীরে দেখা যাবে ঈশ্বর সংসার থেকে এবার টেনে নিচ্ছেন। যদি সংসারের হয়েও যান, কিন্তু ওই সংসারের হয়ে যাওয়াটা বেশি দিন থাকবে না।

কেশব সেনের একজন আত্মীয় পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি, তাস খেলছে। যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই। ঠাকুরের সময় পঞ্চাশ বছর একেবারে বৃদ্ধাবস্থা, এখন আশি বছর বয়সে যেমনটা হয়। তখনকার দিনে মানুষের আয়ু অনেক কম ছিল। ষাটের দশকে ভারতের গড় আয়ু ছিল সাঁয়ত্রিশ বছরের মত, এখন বেড়ে সেটা সত্তর বছরে চলে গেছে। তাস খেলাটা হল সময় কাটানো, সময় কাটছে না, কিভাবে সময় কাটাবো। ঠাকুর এসব দেখে কষ্ট পাচ্ছেন, অবতার কিনা। যে কোন অবতার আর যে কোন উচ্চমার্গের আচার্যরা মানুষের কষ্ট দেখলে খুব বেদনা পান।

বদ্ধজীবের আর-একটি লক্ষণঃ তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহলে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। এটাই হল পরীক্ষা –ঠাকুর বলছেন, কেউ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসে ঠাকুরের কথা শুনছে। তার সঙ্গের বন্ধুরা ঈশ্বরীয় কথা শুনতে চায় না। **বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই আনন্দ পায়**। তার ওটা খাদ্য কিনা। **ওতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, মরে যাবে**। আচার্য শঙ্করও বলছেন, বিষের পোকা, নর্দমাতে যে পোকাগুলো থাকে, ওকে যদি পরিষ্কার জলে রাখা হয়, মরে যাবে। আবার বলছি, এটা উপমা, উপমা দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না, সত্যকে বোঝানর জন্য উপমাগুলি নেওয়া হয়। একটা মানুষ, তার চেতনাটা কোথায়? ওকে যদি বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়, দেখতে হবে কোন জায়গাটা ওর কাছে comfort level। সংসারে থেকে আপনার comfort levelটা যদি এখন নাও পুরো হয়ে থাকে, তাহলে দেখতে হবে ঈশ্বরীয় কথা আপনি এখনও নিতে পারছেন কিনা। নিতে পারে না। দেখবেন, আপনার বাড়িতে অন্যান্য যাঁরা আছেন, তাঁদের যদি বলেন, কথামৃতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, গীতার আলোচনা হচ্ছে একটু শোন। দু-মিনিট শুনে হয় বলবে, ওসব জানা আছে, নয়তো বলবে, ধুস্ এসব ভাল লাগে না শুনতে; নিতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, মরে যাবে। ঠাকুর যখন কথাগুলো বলছেন, এমন ভাবে বলছেন যে, সকলে স্তব্ধ – এটাই হচ্ছে টেস্ট। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
তীব্র বৈরাগ্য ও বদ্ধজীব

১৪ই ডিসেম্বর, **১৮৮২** খ্রীষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, এই দিনের কথা চলছে। (পৃঃ **১১৬**) ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। বিজয়কৃষ্ণ আদি অনেক ভক্তরা আছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী খুব উচ্চমানের সাধক। সেই সময়ের বাংলার ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর খুব নাম ছিল, এখনও তাঁর খুব নাম আছে এবং তাঁর প্রচুর অনুগ্রাহী ভক্ত আছেন; অনেক আশ্রমাদিও আছে। ঠাকুরের কাছে সেই সময় আধ্যাত্মিক পথের যে যাত্রীরা আসা-যাওয়া করতেন, তাঁদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত এক উচ্চ আধারের। ঠাকুর বলছেন, গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে পেয়ে আনন্দিত হয়। সত্যিকারে ওই পথের কোন পথিক তাঁর নিজের মত কাউকে পেয়ে খুব আনন্দ বোধ করেন। এই জিনিসটাকে ভাল বুঝতে হলে এভাবে বোঝা যেতে পারে –আপনি কোন দূর দেশে গেছেন, সেখানকার ভাষা আপনার জানা নেই। হঠাৎ সেখানে একজন বাঙালীকে পেলেন, ভাবুন তখন আপনার কেমন আনন্দ হবে।

আমি একবার হিমাচলে বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন ঘুরতে ঘুরতে চিৎকুল নামে একটা গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। চীন সীমান্তে ওটা ভারতের শেষ গ্রাম। আমরা ওখানে কয়েক ঘন্টা ছিলাম। সেখানে একটা হোটেলে বড় করে বাংলায় লেখা দেখলাম – 'এখানে ভাত, পোস্ত পাওয়া যায়'। দেখে আমার হাসিও পেল, আনন্দও হল, মজাও পেলাম। কোথায় হিমাচলের চীনের বর্ডার, সেখানে একটা হোটেলে কাঠের উপরে বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানো। ওদের কাছে শুনলাম, এখানে বাঙালীরাই বেশি আসে। অনেকে এখানকার হোটেলগুলো বুক করে রেখে তিন-চার বছর ভাড়া খাটান। সেখানে বাংলায় একটা সাইনবোর্ড দেখে আপনার কেমন আনন্দ হবে! ওই রকম জায়গায় হঠাৎ যদি দেখেন কেউ বাংলায় কথা বলছে, কত আনন্দ লাগবে; এই হল আপনজনকে পাওয়ার আনন্দ।

ঠাকুর কলকাতায় আছেন, ইংরেজদের মাধ্যমে ভারতে যে নূতন সংস্কৃতি আসছে, তার রাজধানী কলকাতা। কলকাতা যে শুধু ভারতের রাজধানী ছিল তাই না, কলকাতা তখন ছিল cultural capital, একটা নূতন যুগ শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর যে কারু সাথে কথা বলবেন তার কোন উপায় ছিল না, সে-রকম আধারের লোক তখন কলকাতায় নেই। এমনকি সেই সময় ব্রাহ্মসমাজ ধর্মের একটা নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছিল, তাঁদের মধ্যেও কদাচিৎ কেউ আছেন, যাঁদের সাথে ঠাকুর কথা বলতে পারছেন। কথামৃতের যে জায়গাতে আমরা এখানে আছি, দেখবেন, এখানে আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক কিছুর আলোচনা রয়েছে। এই আলোচনা প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই চলছে। ঠাকুর সেখানে বদ্ধজীবের কথা বলছেন। এর ঠিক আগে আমরা ঠাকুরের এই কথা অনুধাবন করলাম – হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যায়।

আমরা যাঁকে মনে করি একজন বড় মাপের সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি, সেখানে যদি কোন অসংস্কৃতি সম্পন্ন লোক চলে আসে; যেমন কোথাও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চলছে, উচ্চাঙ্গ নৃত্য হচ্ছে; সেখানে অসংস্কৃতি ভাবের কাউকে নিয়ে গিয়ে যদি বসিয়ে দেওয়া হয়, তার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে। এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে। বিষয়ী লোকের সামনে যদি ধর্মের কথা বলা হয়, সে নিতে পারবে না, কষ্ট পায়, হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যাবে। সেইজন্যই বলা হয়, ভূতের সামনে যদি রামনাম করা হয় ভূত পালিয়ে যায়। ভূতেরা ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। ঠাকুর এখন কামিনী-কাঞ্চন, জীব, সেখান থেকে ব্রহ্ম, এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করবেন।

ঠাকুর প্রথমে কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে শুরু করবেন। ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে এতবার বলেছেন যে, সেগুলো পড়ে আমাদের ভক্তরা খুব বেশি মাত্রায় ছটফট করেন। আমাদের পরিচিত অনেকে বলেন যে, আমরা গৃহস্থ, আমাদের সংসার আছে, আমরা এর মধ্যেই লিপ্ত হয়ে আছি, আমাদের কি করে হবে? আমরা এর উপর অনেক আলোচনা করেছি, পরেও করব। তবে এখানে দু-চারটে কথা বলে বুঝিয়ে

দিতে চাই। কথামৃত হল বেদ; আধ্যাত্মিক জগতের সিদ্ধান্তগুলো সামনে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ সিদ্ধান্ত কথা নিতে পারে না। সিদ্ধান্ত বাক্য নেওয়ার জন্য কথাগুলোকে বিস্তারে বুঝিয়ে বলতে হয়। কামিনী-কাঞ্চনের কামিনীকে নিয়ে প্রথমে ঠাকুর আলোচনা করবেন।

কামিনী দুটি রূপে আসে। ঠিক তেমনি পুরুষদের ক্ষেত্রেও দুই প্রকারে আসে। প্রথম যে জিনিসটা আসে সেটা হল শরীরের আকর্ষণ। শরীরের আকর্ষণ কিছু দিন পরে কেটে যায়, অনেকের কাটে না, এই বিষয়টাকে নিয়ে আমরা আলোচনায় যাচ্ছি না। শরীরের আকর্ষণটা তত বড় সমস্যা না। ঠাকুরও যেমন কয়েক জায়গায় একজনকে বলছেন –স্বদারা গমনে দোষ নেই। আবার বলছেন, ভালই হল ভাদ্র মাসের জল অনেকটা বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে না গেলে মাথা খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু এখানে যে আলোচনাটা চলবে, সেটা হল এর পরেরটা, সেটা হল sense of responsibility। একজন বিবাহ করল, পুরুষ হোক বা মেয়ে হোক, একটু যদি তাদের ভিতর চেতনা থাকে, তখন তাদের এক অপরের প্রতি দায়ীত্ব এসে যায়। দায়ীত্বটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, দায়ীত্ব যদি না থাকে তাহলে বিয়ে করা কেন। ইদানিং সবাই চেঁচিয়ে যাচ্ছে, আমার স্পেস চাই। স্পেসই যদি চাই তাহলে বিয়ে করলে কেন, বাইরে তো ভাল স্পেস নিয়ে আছ।

আমি দেওঘরে ছিলাম। ছেলেরা ওখানে পড়াশোনা করে। একদিন একটা বাচ্চার দাদু কোন এক মহারাজের নাম করে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে যাচ্ছেন –সাধুবাবা! বিয়ে করলেন না, ঘরসংসার করলেন না, আপনারা কি বুঝবেন সংসারের মায়া। দাদুকে একটু তিরস্কার করা হয়েছিল, স্কুলে নাতির পিছন পিছন ঘুরছিলেন বলে। ঠিকই বলছেন ভদ্রলোক, আমরা সন্ন্যাসীরা এত কথা বুঝি না, সেইজন্য আমাদের এত বলারও অধিকার নেই। সন্ন্যাসী হওয়ার আগে অল্প একটু যা সংসারের চিত্র দেখেছি, আর এখন লোকেরা যাঁরা আমাদের কাছে আসেন অল্প একটু তাঁদের কাছে শুনি। ঠাকুর সমাজে ছিলেন, ঠাকুর এগুলো অনেক ভাল জানতেন, তিনি তাই বলতে পেরেছেন।

কিন্তু ঠাকুরের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া। শুধু ভোগের জন্য বিবাহ না, বিবাহ একটা ধর্ম, একটা way of life। সন্ন্যাসী যেমন, এটা একটা way of life। একা একা থাকা, এটাও একটা way of life। যিনি একা থাকবেন তাঁর জীবনধারা এক রকম, সন্ন্যাসীর জীবনধারা আর-এক রকম , বিবাহ যিনি করবেন তাঁর জীবনধার আর-এক রকম। আপনি এর একটাকে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু যদি ওর পুরোটা না নেওয়া হয়, তাহলে ঐকতান, এক সুরে যে জীবনটা বাঁধা হবে, সেটা আর হবে না। ঠাকুর অনেক জায়গায় এই ঐকতানের কথা বলছেন –সুরে সুর যদি বাঁধা না হয় অশান্তি লেগে যায়। তবে ইদানিং এগুলো থেকে বাঁচার জন্য সমাজে অনেক ব্যবস্থা আছে।

কামিনীর ব্যাপারে দায়ীত্ব নেওয়ার পর প্রথমটায় আসে ভোগ; দ্বিতীয় আসে একটা দায়ীত্ববোধ আর তৃতীয় নিরাপত্তা; যদিও নিরাপত্তা দায়ীত্বেরই অঙ্গ। এই যে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বা পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ বা একজনকে একজনের যে দরকার, এটা এত তীব্র হয়ে যায় যে, তাকে অন্য সব কিছু থেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য করে। সিনেমার গানে, প্রেমের কবিতায় আমরা কত শুনে থাকি –কিভাবে এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারছে না। যেখানে শরীরের আকর্ষণ, মনের আকর্ষণ, অধিকার বোধ, দায়ীত্ব বোধ, এতগুলো শক্তি মিলে এমন হয়ে যায় যে, ওটাকে আর কাটানো যায় না। এখন এনারা কিভাবে ধর্ম পালন করবেন? ঠাকুর এটাও বলছেন, সংসারে কিভাবে থাকতে হবে, গৃহস্থরা কিভাবে থাকবে।

যে জায়গাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, ঠাকুর এখানে একেবারে উচ্চতম আদর্শ, যেখানে একজন গৃহস্থ সংসারে থেকেও কিভাবে পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে যাবে, সেই জায়গার আলোচনা হচ্ছে। আমাদের কাজ হল জিনিসটাকে বুঝিয়ে দেওয়া। গীতাতে তো পরিষ্কার করে সব বলে দেওয়া হয়েছে, সংস্কৃতের বাংলা অনুবাদও আছে, বোঝার কোন অসুবিধা নেই। তা সত্ত্বেও আচার্য শঙ্কর কেন

গীতার ভাষ্য লিখলেন? রামানুজ গীতার উপর ভাষ্য লিখলেন কেন? এখনও বড় বড় পণ্ডিতরা গীতার উপর ভাষ্য দিয়ে যাচ্ছেন কেন? তার অন্যতম একটা কারণ হল –শাস্ত্রে কথাগুলো যেন অগোছাল ভাবে রাখা থাকে, ওটাকে গুছিয়ে না বললে; বিশেষ করে যেখানে একই শাস্ত্রের এক জায়গায় এক রকম কথা লেখা আছে, অন্য জায়গায় তার বিপরীত কথা আছে, এর হয়ত ব্যাখ্যা করা নেই; ভাষ্যকাররা এই জিনিসগুলোকে যুক্তি দিয়ে পরিষ্কার করে শাস্ত্রের বক্তব্যটা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন এবং আমরাও তখন বুঝতে পারি আসলে এখানে কোন বিপরীত কথা বলা হচ্ছে না।

কথামৃতে এটা বেশি দরকার। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই বস্তু, বাকি সব অবস্তু; এই বস্তুটা কি করে অবস্তু রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়? কামিনী-কাঞ্চনে। লোকেরা ঈশ্বরই বস্তু ভুলে গেছে, মনে রেখেছে শুধু কামিনী-কাঞ্চনকে। এখন সবাইর আলোচনা, সাবধনতা সব কিছু কামিনী-কাঞ্চনকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আমরা এই যে পাঠ, আলোচনা করছি, এর একটাই উদ্দেশ্য, এই ভুলভ্রান্তি, নানা রকমের সংশয়গুলিকে পরিষ্কার করে দেওয়া। হিন্দু ধর্মের ঋষিরা, আচার্যরা প্রাণপন চেষ্টা করে গেছেন, যে যেখানে আছে, সেখান থেকেই কি করে তাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। বেশির ভাগ মানুষ, শতকরা আটানব্বই বা নিরানব্বই ভাগ মানুষ কামিনী ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু এদেরকেও তো ধর্মের পথে নিয়ে যেতে হবে, তাকে তো ধর্মের বাইরে ছেড়ে রেখে দেওয়া যাবে না।

কম্প্যুটারে যেমন জিরো আর ওয়ান হয়, হয় 'ইয়েস' আর নয় তো 'নো'। ধর্মজীবন কম্প্যুটারের মত চলে না। তুমি ঘোর সংসারী হও, নয় তুমি সব ছেড়ে ঘোর সংসারী হও; ধর্মজীবন এভাবে হয় না। জীবন একটা continuous process। অনেক জন্ম ধরে ধর্মজীবন পালন করে যাচ্ছে, করতে করে একটা স্তরে গিয়ে ওই অবস্থা থেকে সন্ন্যাসী হয়। গীতায় ভগবান বলছেন, *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*, এক জন্মেই মানুষের মধ্যে ত্যাগের ভাব আসতে পারে না। ভগবান বুদ্ধ নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, খ্রীশ্চান ধর্মে এটাকে বলে sudden conversion, হঠাৎ পাল্টে গেল। Sudden conversion খ্রীশ্চানদের কাছে আছে, আমাদের কাছে নেই, আমরা এটা মানি না। হঠাৎ সে ঈশ্বরের দিকে চলে গেল, এটা হয় না। কিভাবে হয়? ধীরে ধীরে হয়, প্রসেসটা অত্যন্ত ধীরে গতির। সেইজন্য বলা হয়, হয় ঘোর সংসারী নয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, এভাবে হয় না। যে ঘোর সংসারী সে ধীরে ধীরে তার মন পরিবর্তিত হয়ে হয়ে কাঁচা সন্ন্যাসী, সেখান থেকে একটু ভাল সন্ন্যাসী, ভাল সন্ন্যাসী থেকে ভাল সাধু, সেখান থেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়, একদিনে এটা হয় না। হিন্দুরা এই জিনিসটাকে খুব ভাল করে বোঝে, একটা জাতি পুরোপুরি নিজেকে এতেই দিয়ে রেখেছে।

এখন ঋষিরা যাঁরা ছিলেন, ব্রাহ্মণরা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের পক্ষে এটা খুব সহজ ছিল। সারাদিন শাস্ত্র নিয়েই আছেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও নির্জনে বসে ধ্যান করছেন, জপ করছেন। কিন্তু মায়েদের জন্য, যাঁরা ঘর সামলাচ্ছেন, তাঁদের পক্ষে এটা সম্ভব না। মাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, রান্নাবান্না করতে হবে, সন্তান হয়ে থাকলে তার দেখাশোনা করতে হবে, তাদের পক্ষে এভাবে বেরিয়ে গিয়ে সাধনভজন করা কখনই সম্ভব না। মহাভারত এই ধারণাটা নিয়ে এলেন –পতি পরমেশ্বর। সেখানে বলছেন, এই যে তুমি সারাদিন কাজ করছ, এটাকে বোঝা রূপে না নিয়ে, ঝামেলা রূপে না নিয়ে তুমি দেখ তোমার স্বামী ঈশ্বর, এখান থেকেই তুমি স্বাভাবিকভাবে এক উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন পেয়ে যাবে। এটাকে নিয়ে অনেকে আপত্তি করবেন। সেটা আমাদের বিষয় না, এখানে এর পক্ষেও বলছি না, বিপক্ষেও বলছি না, কিছুই করছি না, শুধু আমি একটা ফ্যাক্ট বলছি।

যাঁরা সত্যিকারের ভাল বংশের, যাঁদের বাড়িতে এই সংস্কৃতিগুলো ছিল, তাঁরা দেখে থাকবেন, আপনাদের বাড়ির ঠাকুরমা বা বয়স্ক যাঁরা ছিলেন, এনারা আধ্যাত্মিকতাতে অনেক এগিয়ে ছিলেন। কারণ ওনারা ঘরবাড়িকে ওই ভাবেই দেখতেন। ভিতরে একটা ত্যাগের ভাব, তার সাথে রামায়ণ মহাভারত পড়ছেন, তাঁর সঙ্গে জপধ্যান করছেন, আবার সকাল-সন্ধ্যা তুলসীতলায় গিয়ে জল দিচ্ছেন,

প্রদীপ দিচ্ছেন; এই করে করে আধ্যাত্মিকতাতে সমৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর এসে একটা নূতন জিনিস দিলেন, যেটা আগে কোথাও আমরা পাই না।

ভাগবতে, মহাভারতে নারী আর পুরুষের যে সম্পর্ক, এর মধ্যে সব রকমের সম্পর্ক আছে। যেমন ভাগবতেই আমরা দেখছি শ্রীকৃষ্ণের মা যশোদার সাথে মাতা-পুত্রের একটা সম্পর্ক; গোপীদের সঙ্গে কখন বন্ধুর সম্পর্ক, কখন প্রেমিকার সম্পর্ক। আবার পূতনা আদি নারীদের সাথে বৈর ভাবের সম্পর্ক। ঠাকুর একেবারে নূতন জিনিস দিলেন, যেখানে তিনি নিজের স্ত্রীকে মাতৃরূপে পূজা করলেন; জগতে ঠাকুরের এটা একটা বিরাট অবদান। আগে কেউ কেউ হয়ত করে থাকতে পারেন, তন্ত্র সাধনাদিতে আছে। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে মাতৃরূপে পূজা করা, এই জিনিসটা অন্য ধর্মে ছেড়ে দিন, হিন্দুরাও এই জিনিসটাকে নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি বা এগিয়ে নিয়ে যাননি। অনেকে প্রশ্ন করেন, পতি পরমেশ্বর হতে পারে, স্বামীর জন্য কি কিছু হবে না? অবশ্যই হবে, স্বামী যদি নিজের স্ত্রীকে জগজ্জননী রূপে দেখে, সেও সিদ্ধিলাভ করবে। আপনি যেখানেই থাকুন, সেখানে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীটা যদি পাল্টে দেওয়া হয়, আপনার চিন্তা-ভাবনাকে যদি পাল্টে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু আপনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি করবেন। আপনি কি কাজ করছেন, সেটার গুরুত্ব নেই, ওর পিছনে আপনার ভাব কি, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কথামৃত থেকে যাঁদের কথাগুলো আসছে, স্মৃতিকথা থেকে যাঁদের কথা উঠে আসে, তাঁরা কিন্তু কেউ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উন্নত ছিলেন না। কথামৃতে আমরা বৃন্দে ঝির কথা পাই, ভগবতী দাসীর কথাও পাই, সেখানে ঠাকুর খুব সাধারণ কথাগুলোই বলছেন।

আদর্শ যেটা আছে, সেটাতে জল মেশাতে নেই। কোন পরিস্থিতিতে আদর্শকে ভেজাল হতে দিতে নেই। এখানে ঠাকুর আদর্শকে ভেজাল হতে দিচ্ছেন না। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, কথাগুলো আদর্শ রূপে বলা হচ্ছে আর শ্রোতা বিশেষকে বলা হচ্ছে। মাস্টারমশাই ছিলেন, মাস্টারমশাইকে দেখেই তিনি এই কথাগুলো বলছেন –তুমি বিয়ে করেছ! সন্তানও হয়েছে! কারণ ঠাকুর দেখেই বুঝতে পেরেছেন শ্রীম এক উচ্চ আধ্যাত্মিক আধার। যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, কথামৃত পড়ছেন, তাঁরাও আধ্যাত্মিক আধার। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, মাস্টারমশাই, এনাদের যে আধার, সেই আধারের অবস্থায় এখনও আসেননি। সময় লাগবে ঠিকই, কিন্তু শুনতে হয় এবং শুনে যেতে হয়। শুনতে শুনতে ভিতরে একটা ছাপ পড়ে, মনে একটা সংস্কার তৈরী হয়। সেই ছাপ পড়লে মনটা তখন ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে যায়। তারপর কিছুটা নিজের প্রচেষ্টা আর কিছুটা তাঁর কৃপায় এগিয়ে যায়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রশ্ন করছেন।

বিজয় – বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হলে মুক্তি হতে পারে?

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা এই কথাগুলো সবাই জানি। হিন্দি এলাকায় রামচরিতমানসের একটা চোপাঈ পড়ে নিয়ে সবাই জন্ম থেকে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যায়। ইউটিউবের দৌলতে এখন সবাই সব কিছু জানে। সবাই জানে বদ্ধজীবকে কি করতে হয়; ঈশ্বরে মন দাও। তাহলে কেন এই প্রশ্ন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী করছেন? তিনি নিজে একজন আচার্য, তিনি এই জিনিসগুলো জানেন। প্রথম কথা, ঠাকুরের মত একজন অবতারের সামনে যখন কথা বলছেন, তিনিও ওই স্তরের কথা বলছেন। দ্বিতীয় মনের যে ভাব, ওটা একটু ওপরে হয়ে যায়। স্বামী ভূতেশানন্দজী যখন অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন আমাদের বয়স কম ছিল। প্রণাম করতে যেতাম, বিশেষ করে যখন একা যেতাম, ওখানে গেলেই মনটা কেমন শান্ত হয়ে যেত, মন একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গিয়ে স্থির হয়ে যেত। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য হতে পারেন, কিন্তু ঠাকুরের কাছে তাঁর মনটা একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গেছে, তাই জিজ্ঞেস করছেন।

ঠাকুর এবার বলছেন –**ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে**। তীব্র বৈরাগ্য যদি না হয়, ঈশ্বরের মন যাবে না, আপনি মুখে যতই ঠাকুরের ইচ্ছা,

মায়ের ইচ্ছা বলুন, ওতে হবে না; তীব্র বৈরাগ্য হতে হবে। কামিনী-কাঞ্চন থেকে নিস্তার তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না।

তীব্র বৈরাগ্য কি জিনিসটাকে ঠাকুর এবার ব্যাখ্যা করছেন। **হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যায় –এ-সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল**। এর আগে যেখানে বর্ণনা আছে ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাজমোহনের বাড়িতে গেছেন। সেখানে একটি ছেলে প্রার্থনা করছিল, 'ঠাকুর যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই'; এই কথা শুনে ঠাকুর ফিস্‌ফিস্ করে বলছিলেন –তা আর হয়েছে। এই দুটো কথা শুনে আমাদের মনে হবে, আমরা পারব না। ঠাকুর আদর্শটাকে দিচ্ছেন, এ-ভাবে জিনিসটা হয়। ইউনিভার্সিটিগুলি যদি বলে, আমরা শুধু আইনস্টাইন তৈরী করব, সরকারের অনেক টাকা তাহলে বেঁচে যাবে। কারণ সব ইউনিভার্সিটিই বন্ধ হয়ে যাবে, ইউনিভার্সিটিগুলির পিছনে সরকারকে আর টাকা খরচ করতে হবে না। যাঁরা মন দিয়ে, নিষ্ঠা সহকারে আমাদের কথামৃত শুনছেন, তাঁদের বাড়ির লোকেদের ধর্মকথা, ধর্ম আলোচনা যদি পছন্দের না হয়, তখন দেখবেন, এগুলোকে নিয়ে আপনাকে ব্যঙ্গ করবে। যদি তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়, বাংলা এমএ যাঁরা পাশ করেন, তাঁরা কি সবাই রবীন্দ্রনাথ হয়ে যায়? বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা এমএসসি করেছেন, তাঁরা কি সবাই আইনস্টাইন হয়ে যান? যদি না হয়, তাহলে কি কলেজগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে? না। ইউনিভার্সিটি, কলেজ সবই রাখা হয় একদিন কখন যাতে একজন আইনস্টাইন তৈরী হয়। এই ধর্মভাব যখন সমাজে থাকে, তখন কখন কখন একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষ তৈরী হন। ঠাকুর এখানে সেই আদর্শগুলো দিচ্ছেন, যে অবস্থায় এই-ধরণের মানুষ তৈরী হয়।

বলছেন, কেমন ব্যাকুলতা হবে? মায়ের গর্ভে সন্তান থাকলে, মা সব সময় কেমন তার গর্ভস্থিত সন্তানকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। **যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকুয়া দেখেঃ তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। বাড়িত বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বরচিন্তা করব –এ কথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোখ**। সংসার পাতকুয়া আর আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে –এটা খুব নামকরা কথা। ইদানিং বিয়ে করে তাই দেখে, কিন্তু সেখানে উদ্দেশ্য কিছু না, শুধু বলবে –আমার স্পেস চাই, আমার ফ্রীডম চাই। কিসের জন্য তুমি স্পেস চাইছ, স্পেস নিয়ে তুমি কি করবে? ফ্রীডম নিয়ে আপনি কি করবেন?

অনেক সময় আমাদের এখানে কোন মহারাজ হয়ত রেগে গেলেন, মনে কোন কারণে অশান্তি হল; বললেন, রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে চলে যাব। আমি প্রায়ই ওনাদের জিজ্ঞেস করি, বাইরে গিয়ে আপনারা করবেনটা কি? যদি বলেন রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে দিয়ে আপনি কোন আশ্রম করবেন, কি করে করবেন? যেটা রামকৃষ্ণ মিশন আপনাকে কখনই করতে দেবে না। সাধন-ভজন করবেন? রামকৃষ্ণ মিশনের মত সাধন-ভজনের জায়গা কোথায় পাবেন? পড়াশোন, বিদ্যাচর্চা করবেন? রামকৃষ্ণ মিশনে যে ধরণের উচ্চমানের পণ্ডিত সাধুরা আছেন, বাইরে কোথাও পাবেন না। আমিও বাইরে ঘুরেছি, আমি জানি; হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী আমার ভাল করে জানা। বেলুড় মঠে আমরা যে মহারাজদের দেখেছি তাঁদের যে পাণ্ডিত্য, তাঁদের যে গাম্ভীর্য, যে জ্ঞান, তার থেকেও বেশি তাঁরা যেভাবে জ্ঞান ও বিদ্যাকে জীবনে আত্মসাৎ করেছেন; বাইরে টর্চ নিয়ে, প্রদীপ নিয়ে, লণ্ঠন নিয়ে, হ্যাজাক নিয়ে, সার্চ লাইট নিয়ে যতই খুঁজে যান, কোথাও এ-রকমটি খুঁজেও পাবেন না। রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে আপনি কিসের খোঁজে যাচ্ছেন? পরের স্বামী রসরাজ, নিজের স্বামী যেমন তেমন। বেলুড় মঠে বড় বড় মহারাজদের সস্তায় পেয়ে যাচ্ছি কিনা, তাই মনে করছি এনারা কিছুই না, বাইরে আরও ভাল পাব। বাইরে কিছুদিন থাকার পর বুঝতে পারে, আরে কত শ্রেষ্ঠ জিনিস ছেড়ে এলাম।

সংসারীরাও নিজের সংসার ভেঙে দিয়ে, ডিভোর্স দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। বলে আমার একটা জীবন আছে। আপনার জীবনে কি আছে, কি উপলব্ধি আছে? ঘরসংসার ভেঙে, ডিভোর্স করে কি

পাবেন? কিছুই পাবেন না। 'না, এই যন্ত্রণা সহ্য হয় না'। 'আরে অপরের পক্ষে আপনাকে সহ্য করা কি যন্ত্রণা; এটা কি কখন ভেবে দেখেছেন'? মানুষ এত হাভাতে হয়ে গেছে কিনা, কিছুই নেই। আধ্যাত্মিক জীবন দূরের কথা, না আছে সাহিত্য চর্চা, না আছে বিজ্ঞান চর্চা, না আছে একটা জিনিস বোঝার ক্ষমতা। খবরের কাগজ পড়া, নিম্নমানের ম্যাগাজিনগুলো পড়া, টিভিতে নিম্নমানের সিরিয়াল দেখা, এগুলো ছাড়া উচ্চমানের জিনিসকে আপনার মস্তিষ্কের নেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই, উচ্চ কিছু নিতে গেলে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যাবে। এখানে ঠাকুর যে জিনিসগুলো বলছেন, এগুলো পড়ার পর অনেকে মনে করেন, আমাকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। আমরা বেলুড় মঠেও দেখেছি, যখন মহারাজদের আধ্যাত্মিক জীবন এগোতে শুরু হয়ে যায়, কাজকর্ম থেকে, কথাবার্তা থেকে ওনার নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নেন।

এরপর ঠাকুর তীব্র বৈরাগ্যের উদাহরণ দেওয়ার জন্য একটা গল্প বলছেন, খুব নামকরা গল্প। একটা দেশে অনাবৃষ্টি চলছিল। ভারতবর্ষে এটা বিরাট বড় সমস্যা –অনাবৃষ্টি আর খরা। মহাভারত আদিতেও এই সমস্যার কথা আছে। উইল ডুরাণ্ট খুব বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন, বিশ্বের ইতিহাসের উপর উনি বারোটা মোটা মোটা বই লিখেছেন। তাঁর স্ত্রী এরিয়াল ডুরাণ্ট, উনিও খুব বিদুষিণী মহিলা ছিলেন। ওনারা দুজনে বিশ্ব ইতিহাসের উপর বই লিখলেন। মোটা মোটা বারোটা বই লেখার পরে ওনাদের মনে হল, ভারতবর্ষ ও চীনের উপর কিছু লেখা হয়নি। বিশ্ব-ইতিহাস যদি লিখতে হয় তাহলে ভারতবর্শ আর চীনকে বাদ দিয়ে ইতিহাস হবে না। তখন তাঁর বয়স হয়ে গেছে। ওই বয়সে তিনি ছোট্ট একটা খণ্ডে ভারত ও চীনকে নিয়ে লিখলেন। লেখার আগে তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে ক্ষমা চেয়ে বলছেন –আমি খুব অন্যায় করছি, ভারতের ইতিহাস এত কমে লেখা যায় না। কিন্তু তখন তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছিল, আর সম্ভবও ছিল না যে বড় আকারে লিখবেন। ভারতের ইতিহাস যখন লিখছেন, প্রথমে ভারতের গরমের বর্ণনা করছে, এই দেশে কি রকম গরম পড়ে। আর বলছেন, India prays for rain, and when the rain fails, it dreams of Nirvan, ভারতে বৃষ্টি যদি না হয় ভারত মরে যাবে। ভারত পুরো দাঁড়িয়ে আছে এই বৃষ্টির উপর, বৃষ্টি যদি না হয় ভারত শেষ। সব দেশে এ-রকম হয় না, আমাদের এখানে বৃষ্টির উপর নির্ভরতা খুব বেশি। ফলে এখানে ভগবানকে ভক্তি ছাড়া কোন গতি নেই। সেইজন্য এই অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, আকাল এই জিনিসগুলো আমাদের শাস্ত্রে বারবার ঘুরেফিরে আসতে থাকে।

ঠাকুর এখানে দুই চাষীর কথা বলছেন। একজন চাষীর খুব রোখ। সে মাঠে জল আনতে হবে বলে কাজ করেই যাচ্ছে। তার স্ত্রী যখন এসে বলছে, 'তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি, এখন স্নান করে খেয়ে নাও, না হয় কাল করবে'। সে স্ত্রীর উপর খুব রেগে গেছে, ঠাকুর বলছেন, **গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া করলে, আর বললে, 'তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষবাস কিছুই হল না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি**'। অন্য দিকে আরেকজন চাষা, সে খুব ভাল মানুষ, সেও মাঠে জল আনছিল। তার স্ত্রীও যখন এসে বলল, সে কোন উচ্চবাচ্চ না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বলছে, তুই যখন বলছিস তো চল। ঠাকুর বলছেন, **সে চাষার আর মাঠে জল আনা হল না**।

আবার আমি আপনাদের সাবধান করছি, এই কথা তাঁদেরই জন্য যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক। সংসারীরা যদি দুম্ করে হঠাৎ কেউ এ-রকম করতে নেমে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে তার মাথা খারাপ, না হলে কদিন পরে মাথাটা তার খারাপ হয়ে যাবে। এগুলো সিদ্ধান্তবাক্য, এগুলো শেষ কথা, এগুলো উপনিষদের কথা। এই কথাগুলো শুনতে হয়, শুনতে শুনতে মনে একটা ছাপ পড়ে, তারপর সাধুসঙ্গ হচ্ছে, শাস্ত্রসঙ্গ করা হচ্ছে, হতে হতে তখন শাস্ত্রের কৃপা হয়। শাস্ত্রের কৃপা হলে তখন সেইদিকে মন যায়। আমাদের একজন খুব সিনিয়র মহারাজ মজা করে বলতেন, ওনার সময় একজন মহারাজ ছিলেন তিনি প্রচুর কাজকর্ম করতেন। একদিন তাঁর হঠাৎ মনে হল, আমি এগুলো কি করছি, যত সব ফালতু, আমি তপস্যায় চললাম। এত বৈরাগ্য এসেছে যে হাওড়া ব্রীজ হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। হাওড়া ব্রীজের

উপর দিয়ে যেতে যেতে তিনি চশমাটা খুলে গঙ্গায় ফেলে দিলেন। আমার আর চশমার দরকার হবে না, আমি পুরোপুরি ঈশ্বরে মন দেব। তিনি কিভাবে কিভাবে হৃষিকেশে পৌঁছে গেলেন। দু মাস তিন মাস পর তিনি চিঠি দিলেন – নাঃ কাজই অনেক ভাল। কাজে কি হয়, অনেক অঙ্কটবঙ্কট কেটে যায়। কাজ করলে বোঝা আমার শত্রুরা কারা। যখন জপধ্যানে থাকে, ভাবে থাকে, তখন মনের শত্রু হয়ে যায় কিনা, তখন বুঝতেও পারে না আমার কোন কোন শত্রু আছে। ফলে এদিকেও এগোতে পারে না, ওদিকেও এগোতে পারে না।

ঠাকুর বলছেন, খুব রোখ না হলে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না। খুব রোখ আনতে হয়। তবে যাঁরা সাধনার শেষ অবস্থায় আছেন, তাঁদেরকে নিয়ে এখানে বলছেন। এই আলোচনা চলতে চলতে চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঢুকে যাচ্ছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কামিনী-কাঞ্চন জন্য দাসত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) – আগে অত আসতে; এখন আস না কেন?

বিজয় – এখানে আসবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু আমি স্বাধীন নই। ব্রাহ্মসমাজের কাজ স্বীকার করেছি। তিনি ব্রাহ্মসমাজে আচার্য পদে ছিলেন। ঠাকুর আবার কামিনী-কাঞ্চনে ঢুকে যাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। 'বদ্ধ করে' এই কথাতে আমরা মনে করি মোহ মায়াতে বদ্ধ হয়, কিন্তু তা না, আসলে বদ্ধ করে দায়ীত্ববোধে। মোহ-মায়া হল শরীরের প্রতি আকর্ষণ, কিংবা সঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, ওর সঙ্গ আমার ভাল লাগে –এটা শুধু তাই না; একটা দায়ীত্ববোধ তাকে বেঁধে ফেলে। একজন যেমন বিয়ে করেছে, তার অনেক দায়ীত্ব এসে গেল, ঠাকুর এখানে ওই অর্থে বলছেন। **জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার**। যার আছে ঘর-সংসার, তার আছে টাকার দরকার। যার ঘর-সংসার নেই, সে টাকা-পয়সা রেখে কি করবে! তা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় সে টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে, টাকা জমিয়েই যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে সে মানসিক ভাবে অসুস্থ, তার চিকিৎসার দরকার। যেখানে দায়ীত্ব আছে সেখানেই টাকা-পয়সার দরকার। যারা বিয়ে-থা করেনি, তারা ন্যুনতম কিছু টাকা রেখে দিল, যেটা দিয়ে তার জীবনধারণ চলে যেতে পারে। বয়স হয়ে গেলে উপার্জন করতে পারবে না, ভবিষ্যতে নিজের খাওয়া-পরা, ওষুধপত্রের জন্য একটু সঞ্চয় তাকে করতে হবে। এটুকু করে নেওয়া যেতে পারে, এর উপর বেশি চেষ্টা করতে নেই। সংসারে যারা আছে তাদের উপায় থাকে না। ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে দিলেন, আপনার দায়ীত্ব শেষ। কিন্তু এরপরেও আপনি ওদের জন্য করে যাচ্ছেন, সংসার হল সমুদ্র, এর মধ্যে আপনি ঢেলে যান কোন দিন ভরবে না।

ঠাকুর আবার একটা নামকরা গল্প নিয়ে আসছেন। কোথায় ঠাকুর এই গল্পগুলো পেতেন, ভাবলে অবাক লাগে। অন্যান্য জায়গায় এই গল্পগুলি পাওয়া যায় না। ঠাকুরের কাছে অনেকেই আসতেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা আসা-যাওয়া করতেন, তাঁদের কাছে হয়ত ঠাকুর গল্পগুলি শুনেছিলেন।

জয়পুরে গোবিন্দজীর মন্দির খুব বিখ্যাত। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গোবিন্দজীর বিগ্রহ প্রথমে বৃন্দাবনে ছিল, পরে কোন কারণে বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে নিয়ে আসা হয়। ঠাকুর সেই জয়পুর মন্দিরের পূজারীদের নিয়ে বলছেন, **জয়পুরে গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল, 'রাজাকে আসতে বল'। তারপর রাজা ও পাঁচজনে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখার করবার জন্য,**

আর কাহারও ডাকতে হল না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ, আশীর্বাদ করতে এসেছি, এই নির্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন'। কাজে কাজেই আসতে হয়; আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতেখড়ি –এই সব।

আমার নিজের জীবনের একটা মজার ঘটনা আছে। অল্প বয়সে আমার অনেক তেজ ছিল, এখন নরম হয়ে গেছি। একবার আমাকে দায়ীত্ব দিয়ে এক জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা নূতন সেন্টার দাঁড় করাতে হবে। বেলুড় মঠ থেকে আমি অনেক চারাগাছ নিয়ে যাচ্ছিলাম। সব মিলিয়ে আমার প্রায় পঁচিশটার উপর বড় বড় লাগেজ হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেনে একজনকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। বর্তমানে যিনি অধ্যক্ষ, স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ তখন জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। দেখা হতে আমি বললাম, 'মহারাজ আজকে যাচ্ছি'। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি অমুক ট্রেনে যাচ্ছ'? আমি বললাম, 'না মহারাজ, ওই ট্রেনে গেলে চেঞ্জ করতে হবে, সঙ্গে প্রচুর জিনিস আছে, অন্য ট্রেনে যাব'। আমার কথা শুনে উনি খুব হাসতে শুরু করলেন। মিশন অফিসে আরও যাঁরা মহারাজরা ছিলেন, তাঁদেরকে হাসতে হাসতে বলছেন –'এই দেখ সমর্পণানন্দ এখন সংসারী হয়েছে। এত জিনিসপত্র তাকে নিয়ে যেতে হবে বলে একটা সাধারণ ট্রেনে যাচ্ছে'। আমারও খুব হাসি পেয়ে গেল।

আমাকে একটা দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, নূতন একটা সেন্টার দাঁড় করাতে হবে। এখন মাথায় ঘুরছে, কোন ভক্ত কটা টাকা দেবে, আদৌ দেবে কিনা জানা নেই, এই এই জিনিস দরকার, কোথায় পাওয়া যেতে পারে, কাকে কাকে কি কি দায়ীত্ব দিলে ভাল, মাথায় হাজারটা জিনিস ঘুরছে। তখন কম বয়সের তেজ, এতে তেজ একটু হাল্কা হয়ে গেছে। আমি সন্ন্যাসী, তাতেই তেজ ডাউন মারছে, তাহলে সংসারীদের তেজ কি করে থাকবে! আমরা তাও বলে দিতে পারি, আমি দায়ীত্ব নিতে পারব না, বলে বেরিয়ে গেলাম। সংসারীরা এটা কখনই করতে পারবে না। ইদানিং কালে তাও এদিক সেদিক হয়ে যায়, আগেকার দিনে হত না। ঠাকুর আবার বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ীর কথা বলছেন।

নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হয়ে গেল, বীরভদ্রের খুব চিন্তা হল এই ভেবে যে, এই শিষ্যরা যেদিকে দিয়ে যাবে লোকেরা না জেনে যদি অপরাধ করে ফেলে লোকেদের অনিষ্ঠ হয়ে যাবে। একদিন তিনি শিষ্যদের বললেন, 'যাও তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে এসো'। আসলে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। একশ জন শিষ্য টের পেয়ে গেছেন, কি ব্যাপার হতে চলেছে। ওরা গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ওখান থেকে পগারপার হয়ে গেল, কারণ গুরু যখন বলবেন, এই মেয়েগুলিকে নাও, তখন বাধ্য হয়ে আমাদের নিতেই হবে, গুরুর আজ্ঞা তো লঙ্ঘন করা যাবে না। ভেবে দেখুন গুরুর প্রতি এত শ্রদ্ধা যে তপস্বীকে বলছেন স্ত্রী নিয়ে থাকতে, তাঁরা সেটাকে মেনে নিচ্ছেন। বলছেন, বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাকতে লাগল। তাঁদের আর সেই তেজ থাকল না। কারণ তাঁদের স্বাধীনতাটা লোপ পেয়ে গেল। বর্তমান যুগে সবাই স্পেস চাইছে, সবাই স্পেস নিয়ে অনেক কথা বলছে। স্পেস সবচেয়ে বেশি থাকে সন্ন্যাসীদের।

(বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখছ, পরের কর্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছে। আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরি স্বীকার করে তাদের বুট জুতার গোঁজা খায়। এর কারণ কেবল 'কামিনী'। ঠাকুরের সময়ে চাকরি করার ব্যাপারটা তখন ভারতবর্ষে ছিল না। ব্রাহ্মণরা নিজের মত পূজা, পাঠ, অধ্যয়ন করেই কাটাতেন। ক্ষত্রিয়দের জমি-জায়গা ছিলে, তাতে চাষবাস করে ভালমত চলে যেত। বৈশ্যরা নিজদের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনা করত। তাদের ব্যবসাতে যারা কাজ করে, তারা নিজেদের বাড়ির লোক। আর অপরের জমিতে চাষবাস করা, লোকের বাড়িতে কাজ করা এগুলোকে আমরা চাকরি করা অর্থে নিতে পারি না, একদিন দু-দিনের জন্য কাজ করে আবার অন্য কাজে চলে যেত। সেবাকার্যে যাদের চাকরি করতে হত, তাদের অবস্থা সত্যিকারে খারাপ

ছিল। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলছেন –মালিক বার করে দিলে আমকাঠের যে সিন্দুক সেটাও নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে না। ইংরেজরা আসার পর ভারতের এই সোশিও-ইকনমিক সিস্টেমটা পাল্টাতে শুরু করল। ইউরোপে যখন শিল্প বিপ্লব এলো, যার প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল, সেখান থেকে তারা ধীরে ধীরে মানুষগুলোকে চাকরি দিতে শুরু করল। চাকরি মানে সেখানে বেশি পয়সা পাওয়া যায়, পয়সা বেশি পেলেই মানুষ সেখানে যাবে।

কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল, এই মানুষগুলো মেশিনের মত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে যে ইলেক্ট্রনিক ওয়েভ, যেটাকে থার্ড ওয়েভ বলে, এখন এদের নামই হয়ে টেক-কুলিস, কর্মচারীরা কুলি। যারাই বলে আইটি সেক্টরে কাজ করছি, সবাই কুলি। সারাদিন সারারাত কর্তৃপক্ষের সাথে কন্টাক্ট রেখে চলতে হবে। আগে যে ফ্যাক্টরি, অফিসগুলি ছিল, সেখানে আপনার ডিউটি যখন শেষ, আপনার ডিউটি শেষ, আপনি এখন আপনি। বর্তমান কালে অফিস, কোম্পানী তাদের কর্মচারীদের বাড়িতে ফোন দিয়ে রেখেছে, যাতে চব্বিশ ঘন্টা তাকে ফোনে পাওয়া যায়। এখন আর চাকরি চাকরিতে নেই, এটা একেবারে দাসত্বে চলে গেছে। আমরা শুনেছিলাম, কিছু কিছু আইএএস, আইপিএস অফিসার আছেন, তাঁরা সব সময় ডিউটেতে আছে, চাইলে যে কোন সময় আপনাকে ডেকে আনতে পারে। আর এখন সেল ফোন দিয়ে রেখেছে, আপনি কক্ষণ ফোন সুইচ অফ করে রাখতে পারবেন না, তার মানে তোমার চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি। এখন এই জিনিসগুলিকে নিয়ে অনেক দেশে অশান্তি লেগেছে।

ঠাকুরের সময় যারা ইংরাজী পড়েছে, তাদের জন্য ভাল চাকরির রাস্তা খোলা ছিল। ঠাকুর বলছেন, এত পড়াশোনা করেছ, পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু দুটো টাকার জন্য সাহেবের বুটের গোঁজা খেতে হয়। এখন এই যুগে এই জিনিস কল্পনা করা খুব মুশকিল যে, মানুষ স্বাধীন ভাবে কিছু করবে। মানসিকতাও আবার সেই রকমই হয়ে যায়। খুব মজার ব্যাপার হল, ম্যাকডোনাল্ড, খুব নামকরা কোম্পানী, যারা ফাস্ট ফুড দেয়, দুই ভাই মিলে এই কোম্পানীকে চালু করেছে। ওদের মা ছিলেন আইরিশ। আমেরিকায় আইরিশ মানে সে চাকরি করতে চায়, শুধু চাকরি খোঁজে। তা যে কোন চাকরি হলেই হল, পুলিশের চাকরি হোক, ফায়ার ব্রিগেডের চাকরি হোক, চাকরি একটা তাদের দরকার। ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানীকে দুই ভাই মিলে খেটেখুটে দাঁড় করাল। ধীরে ধীরে ম্যাকডোনাল্ড সব জায়গায় ছড়িয়ে গেল, রাস্তায় রাস্তায় ওদের হোর্ডিং।

এক ভদ্রমহিলা ওদের মাকে বলছেন, 'আজ তোমার নিশ্চয় খুব গর্ব হচ্ছে, তোমার ছেলের নাম আজ রাস্তায় রাস্তায়'। ম্যাকডোনাল্ড আজ এত পাওয়ারফুল যে, বলা হয়, যে দুটো দেশে ম্যাকডোনাল্ড আছে, সেই দুটো দেশ কখন যুদ্ধে যাবে না। কারণ, জানে যুদ্ধে গেলে ম্যাকডোনাল্ডের ব্যবসা মার খেয়ে যাবে। আজকাল যুদ্ধ সাধারণ ভাবে বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানীগুলিই করায়, প্রাইম মিনিস্টাররা করায় না। ম্যাকডোনাল্ড দেখবে যুদ্ধ যাতে না হয়। আবার অস্ত্র তৈরীর সংস্থাগুলি চাইবে, টুকটাক একটু যুদ্ধ যেন লেগে থাকে, তা নাহলে ওদের অস্ত্র বিক্রি হবে কি করে!

তখন ওদের মা বলছে, 'হ্যাঁ ভাল, তবে এদের একটা রেগুলার চাকরি হলে ভাল হত'। এই দুই ভাই হাজার হাজার লোককে চাকরি দিচ্ছে, ওদের নাম রাস্তায় রাস্তায়, কিন্তু তাতেও তাদের মায়ের মনে শান্তি নেই। কেন নেই? ছেলে দুটো কোন চাকরি করে না। এটা একটা মানসসিকতা, এরা শিল্প বিপ্লবে বড় হয়েছে কিনা। তাদের কাছে চাকরিটা হল খুব দরকারী। বর্তমান কালে আমরা কল্পনাই করতে পারি না যে, সবাই নিজের মত স্বাধীন ভাবে কিছু করবে। ঠাকুর বলছেন, এর কারণ হল কামিনী। সত্যিই তো কামিনী না হলে কেন মানুষ কাজ করতে যাবে।

একজন বড় ফিলজফার ছিলেন, বিয়ে থা করেননি, বসে বসে ফিলজফি লিখতেন। যখনই দেখতেন বই লেখার মত কিছু নেই, কিন্তু কিছু টাকার দরকার, তখন উনি একটা প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতা করতেন। উনি এত বড় ফিলজফার ছিলেন যে, ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেলও ওনার কাজগুলো বুঝতে

পারতেন না, তিনি একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের কাজ করতেন। ওখান থেকে দুটো টাকা হলেই তার কাজ চলে যেত। সব কিছুর পিছনে কামিনী, দায়ীত্ব চেপে যায় কিনা।

বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার জো নাই। আনন্দের বাজার কি করে তুলবে! ঠাকুর আগে গুটিপোকার কথা বলেছিলেন। **তাই এত অপমানবোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা**। এতে যে সে শুধু ঈশ্বরের দিকে যেতে পারছে না, তা না, কত যন্ত্রণা। বস্‌দের অপমান সহ্য করতে হয়, সকাল বিকাল গুডমর্নিং স্যার, গুড ইভিনিং স্যার করতে হয়। আপনি জানেন লোকটা অত্যন্ত বাজে, কিন্তু উপায় নেই। এইসব কথা শুনে কেউ যদি মনে করে কি হবে চাকরি করে। চাকরি না করলে খাবেনটা কি? সেই অবস্থাও নেই আর সুযোগ কজনেরই বা হয় নিজে নিজে প্রাইভেটে কিছু একটা করে অর্থের সংস্থান করে নেবে।

যদি একবার এইরূপ তীব্র বৈরাগ্য হয়ে ঈশ্বরলাভ হয়, তাহলে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাকলেও, মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না, তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয়, আর-একটা সামান্য হয়, তাহলে লোহাটাকে কোন্‌টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লবে। পাওয়াফুল চুম্বক আর স্মলার চুম্বক হয়। স্মলার চুম্বক হল সংসার, সংসারও টানে। আর ওইদিকে ভগবান, তিনিও টানেন। একবার ঈশ্বরের দিকে মন চলে গেলে আর সংসারের দিকে মন কোন দিন যাবে না। এই কথাই ঠাকুর বলছেন –**ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর। কামিনী কি করবে?** তখন আবার একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন।

একজন ভক্ত – মহাশয়! মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা করব?

এইসব প্রশ্ন শুনে মাঝে মাঝে অবাক লাগে, যাঁরা ঠাকুরের কাছে বসে কথা শোনার এমন মহা সুযোগ পাচ্ছেন, তাঁদের কাছ থেকে এত কাঁচা প্রশ্ন!

শ্রীরামকৃষ্ণ – যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে ভয় হবে। এখানে ঈশ্বরলাভ মানে আত্মজ্ঞান না, এমন কি যাঁদের একটা বোধ হয়ে গিয়ে প্রত্যয় হয়ে গেছে, বা জপধ্যান করে করে যাঁরা অনেক এগিয়ে গেছেন, তাঁদেরকেও এখানে ধরা হচ্ছে। **তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে, মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা বলে তাই সকলে পূজা করেন**। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, There is no free lunch, এমন কোন রেঁস্তোরা হয় না, যেখানে গেলে আপনাকে বিনা পয়সায় খাওয়াবে, খেলে আপনাকে একটা মূল্য দিতে হবে। জগতে ভোগ যদি করেন আপনাকে দাম দিতে হবে। জগতের রেস্টুরেন্টে কামিনী ভোগ করতে গেলে, দায়ীত্ব রূপ মূল্যটা চোকাতে হবে। কামিনীর পিছনে গেলে সারা জীবনের মত দাসত্ব গ্রহণ করতে হবে, কারণ দায়ীত্ব চেপে যায়। কিন্তু একটা কথা বারবার বলতে হচ্ছে, মনে রাখবেন এগুলো সিদ্ধান্ত বাক্য। সিদ্ধান্ত বাক্য শুনে রাখতে হয়। বিচার করতে হয় কি কি জিনিস বাদ দিতে হয়।

যেমন ধরুন, এই যে কিছু দিন আগে করোনার জন্য আমাদের সবাইকে কত ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে, আবার অন্য দিকটা দেখুন, করোনার জন্য আমাদের অনেক বাজে খরচ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। করোনার আগে কত কিছু করার ছিল, বিউটি পার্লারে যেতে হবে, মলএ যেতে হবে, এখানে যেতে হবে, সেখানে যেতে হবে। করোন এসে দেখিয়ে দিল, আপনি এগুলো ছাড়াও থাকতে পারেন। ঈশ্বরে যখন মন যায়, যখন শাস্ত্র শুনতে শুরু করে, তখন এই বোধ আসে –এগুলো ছাড়াও আমি চলতে পারি। এগুলো ছাড়াও আমি চলতে পারি, যখন এই বোধটা চলে আসে, তখন টাকা-পয়সার পিছনে দৌড়ানটা বন্ধ হয়ে যায়। তখন দৃষ্টিভঙ্গীটাই পাল্টে যায়, মেয়েমানুষ তখন ভোগের বস্তু বলে মনে হয় না। তখন তাকে খুশী করে, কায়দা-কানুন করে নিজের কাছে ধরে রাখার এই ইচ্ছাগুলো আস্তে আস্তে

চলে যায়। এরপর ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলছেন – **তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে**। চতুর্থ পরিচ্ছেদ এখানে শেষ হচ্ছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হলে তবে ঠিক আচার্য

এতক্ষণ ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চনের আলোচনা করলেন, বিশেষ করে সাধকদের জন্য কামিনী বিষয়কে নিয়ে বলছেন। সাধিকাদের জন্য উলটো হয়ে যাবে; বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বা ইদানিং কালে অনেক শব্দ এসে গেছে; জৈব ভাব, sex desire, যে রূপেই হোক, মন যদি সেখানে পড়ে থাকে ধর্ম পথে এগোন যায় না –ঠাকুর এটাকে নিয়ে আলোচনা করলেন। আমরা এখনও ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে আছি। (পৃঃ ১১৮) শেষে ঠাকুর বিজয়কে বলেছিলেন –তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। আমাদের মানসিকতা ঠিক ঠিক যেখানে, আমাদের মন যেমন, আমরা ওই ধরণের লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কামী পুরুষ কামের পিছনে দৌড়ায়, জ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানীর পিছনে দৌড়ায়। বিজয় তখন বলছেন –

বিজয় –ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতে হয়, তাই সদা-সর্বদা আসতে পারি না, সুবিধা হলে আসব। এটা তখনকার মত কাটিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা, তবে তিনি যে আসতে চাইতেন না, তা তো না। এখান থেকে ঠাকুর আচার্য, আচার্যগিরিকে নিয়ে বেশ কয়েকটি কথা বলছেন। এখানে যে ঠাকুর শুধু আচার্যকে নিয়ে বলছেন তা না, আমাদের জীবনের সমস্ত উপলব্ধিকে নিয়ে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) –দেখ, আচার্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। এখানে এই যে দুটি কথা, সাধারণ লোকেদের এমনকি আপনাদেরও মনে হবে –মহারাজ! এই যে আপনি এত শাস্ত্রের কথা বলে যাচ্ছেন, আপনি কি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন? আমি অকপটে বলতে পারি যে, আমি ঈশ্বরের আদেশ পাইনি। তবে আমাদের কাছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন হল ঠাকুরের স্থূল শরীর। আদেশের কথা যদি বলা হয়, তাহলে আমি বলতে পারি, আমি এখান থেকেই আদেশ পেয়েছি –তুমি রামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করবে। সেইজন্য একদিক থেকে বলা যায়, এটা ঠাকুরেরই আদেশ।

হিন্দুদের এত শাস্ত্র, সব কিছু গুছিয়ে রাখা নেই। আমি আমার তরফ থেকে সামান্য চেষ্টা করে শাস্ত্রের কথাগুলোকে knowledge bank রূপে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু যদি এই ভাব থাকে যে, আমি উপদেশ দিচ্ছি, তুমি শোন, তোমার মঙ্গল হবে; তবে জানবেন, কোনদিন এগুলো কারুর কোন কাজে আসবে না। বাবা-মা সন্তানদের এত করে বলেন, তোমার ভালর জন্যই বলছি; ছেলেমেয়েরা ভাল করে জানে তার আসল মঙ্গল কোথায়। ছেলেমেয়েরা কথা শুনতে চায় না, কেন? সারাদিন আমরা যাকে ভালবাসি, যাকে ভালবাসি না, সবাইকে উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু কেউ শুনছে না কেন? তার থেকে আরও কঠিন জিনিস, জীবনে আমরা নিজেদের কত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি? এটা সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়, আমাদের যখন কম বয়স ছিল, যখন জানুয়ারীর এক তারিখ আসত, আমরা কত রকম সঙ্কল্প করতাম, বলতাম – New year resolve, এই বছরে আমি এই এই করব। কিংবা আপনার দেখে থাকবেন, বেলুড় মঠে এলে মনটা এমনিতেই একটু শান্ত হয়ে যায়, তখন ইচ্ছে করে, বাড়ি গিয়ে এবার থেকে নিয়মিত খুব ভোরে উঠব, উঠে জপধ্যান করব, এই করব, সেই করব। একদিন দুদিন হয়ত হল, কিন্তু তারপর দেখা যায় কিছুই হচ্ছে না, যে কে সেই। কেন এ-রকম হয়? আসলে এই উপদেশ তো অপর কেউ আপনাকে দেয়নি, আপনি তো নিজেই নিজেকে উপদেশ দিয়েছেন। তাও কাজ হয় না কেন? কারণ পিছনে শক্তি নেই। আপনি কাউকে যখন উপদেশ দিচ্ছেন, বা কিছু বলছেন, সেখানেও আপনার যে ব্যক্তিত্ব, ওই ব্যক্তিত্বের মধ্যে শক্তি নেই। নিজেকেও যখন বলছেন, মনের সেই জোর নেই, ঠাকুর

বারবার বলছেন সেই আঁট নেই। এই জোর বা আঁট ঈশ্বর থেকে আসে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এটা ঈশ্বর থেকে আসে। কিভাবে আসে, সেটাই আমরা আলোচনা করব।

ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন –**যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুনবে না। সে উপদেশের কোন শক্তি নাই**। আসলে কোন শক্তি নেই কিনা, এটাই হল বক্তব্য। আপনারা প্রায়ই ইউটিউবে আমাদের প্রশ্ন করেন –কিভাবে উপরে উঠব, আমার মঙ্গল কিসে হবে? আর আমরা বারবার একটা কথাই বলে যাই –শক্তি অর্জন করুন, শক্তি সঞ্চয় করুন, এটাই জীবনের মূল। ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, এগুলো অনেক পরে হবে। আমাকে একজন বললেন –'আমাদের মত সাধারণ মানুষের কি করে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হবে'? আমি বললাম, 'ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, দেবত্ব যাই বলুন, সাধারণ মানুষের এগুলো কোন দিন হয় না। সাধারণ মানুষ হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে মরে যাবে, তবুও হবে না। এগুলো অসাধারণ মানুষেরই হয়। যদি আপনি আত্মজ্ঞান পেতে চান, ব্রহ্মজ্ঞান পেতে চান, তাহলে আগে আপনাকে অসাধারণ হতে হবে'।

যেমনি আপনি বলছেন, আমি একজন গৃহবধূ, আমার কি করে হবে? একটাই উত্তর – কোন দিন হবে না। কথাগুলো শুনলে খারাপ লাগবে ঠিকই। ঠাকুর অনেক জায়গায় বলছেন, বাচ্চারা কোঁদল করে বলে, 'তোর ঈশ্বরের দিব্যি'; জ্যেঠি, খুড়িদের কাছে শুনেছে। এভাবে হয় না, হওয়ার জন্য নিজেকে অসাধারণতায় নিয়ে যেতে হবে। তাহলে কি কোন গৃহবধূর হবে না? কেন হবে না। আমাদের রামায়ণেই মা সীতা আছেন; মহাভারতে পর পর কত উদাহরণ দিয়ে চলে যাচ্ছেন, কত পতিব্রতা নারীর কথা রয়েছে। সমস্যা কোথায়? সমস্যা হল, শক্তি নেই। শক্তিই নেই তাই শক্তি সঞ্চয় করবেন কোত্থেকে? সঞ্চয় তো পরে, তারও আগে দরকার শক্তি অর্জন করা, সেটাই আমরা করছি না। হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও বলে না যে, তোমাকে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে। কিছু করতে বলে না, কয়েকটি খুব সহজ জিনিসকে মানুষের জন্য ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সময় হলে শেষের দিকে হিন্দু ধর্মের মূল জিনিসগুলোকে নিয়ে বলব, যে জিনিসগুলো প্রত্যেক হিন্দুর করা দরকার। ওগুলো করতে থাকলে ধীরে ধীরে নিজে থেকেই শক্তি সঞ্চয় হয়ে যায়।

ঠাকুর ওটাই বলছেন, উপদেশের কোন শক্তি নাই। তারপর বলছেন – **আগে সাধন করে, বা যে কোনরূপে হোক ঈশ্বরলাভ করতে হয়**। এখানে ঈশ্বরলাভ শেষ কথা না, ঈশ্বরে যদি ঠিক ঠিক ভক্তিলাভ হয় তাতেও হবে। **তাঁর আদেশ পেয়ে লেকচার দিতে হয়**।

এরপর ঠাকুর নিজের দেশ কামারপুকুরের হালদার পুকুরের গল্পটা বলছেন। পুকুরের গ্রামের অনেকে বাহ্যে করে রাখত। লোকেরা ঘাটে এসে তাদের খুব গালাগাল দিত, কিন্তু কোন কাজ হয় না। এরপর শেষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাপরাসী এসে একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিল – 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ করতে পারবে না। যদি করে, শাস্তি হবে'। চাপরাসী মানে যাকে চাপরাস দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অফিসার বা মিলিটারি অফিসাদের যে ব্যাচগুলো থাকে, ওই ব্যাচ দেখে বোঝা যায় উনি কোন র‍্যাঙ্কের, উনি আইজি, ডিএসপি, নাকি এসপি, এগুলো বোঝা যায়। তেমনি মিলিটারিতেও উনি ক্যাপ্টেন না মেজর ব্যাচ দেখে বোঝা যায়। কিন্তু আইএএস অফিসার, বিচারক এদের বোঝার উপায় নেই যে এনারা কোন র‍্যাঙ্কে আছেন। ওনাদের সাথে চাপরাসী থাকে, যেখানে যাবেন সঙ্গে চাপরাসী থাকবে। চাপরাসীর ওখানে লেখা থাকে, সে কার চাপরাসী। কারণ সেই লোকটার কাছে স্ট্যাম্প আছে, তিনি যখন লিখবেন, তখন লিখবেন By order of the Ld. Judge of Calcutta High Court, লিখে জাজের স্ট্যাম্প মেরে দিলেন। এটাকে বলে চাপরাস।

ঠাকুর এই চাপরাস শব্দটা বারবার বলতেন, এটা যে শুধু লেকচার দেওয়ার ক্ষেত্রেই বলছেন তা না, জীবনে সব কিছুতে চাপরাস লাগে। আপনার ভিতরে এত অশান্তি কেন, এত জ্বালা-যন্ত্রণা কেন?

আপনাকে দেখে লোকেরা সরে যায় কেন? আপনি এত নিন্দুক কেন? সব কিছুতে আপনি দোষ দেখেন কেন? কারণ ভিতরে আপনার শক্তি নেই। ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে বললেন, আমি তো দাঁড়িয়ে গেছি, তুমি কবে দাঁড়াবে? অঙ্গুলিমাল দাঁড়িয়ে গেল। ভগবান বুদ্ধের কথায় শক্তি ছিল।

তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য হওয়া যায় ও লেকচার দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। ঠাকুর এই ঘটনা অনেকবার বলেছেন –আগেকার দিনে গ্রামেগঞ্জে যখন কোন নিমন্ত্রণ খাওয়ানো হত, তখন সেখানে জমিদার অনেক সময় নিজে না যেতে পারলে তাঁর কোন বাচ্চাকে পাঠিয়ে দেওয়া হত, বাচ্চাকেও সেই জমিদারের সম্মানই দেওয়া হত। পাকিস্থান বা চীন সীমান্তে ভারতের যে সৈনিকরা দিনরাত পাহারা দিয়ে যাচ্ছে, তাঁদের যে ইউনিফর্ম, সেটা দেখেই সবাই বুঝে যায়, তাঁদের পিছনে পুরো ভারত সরকার দাঁড়িয়ে আছে। সরকারের আদেশ রয়েছে, তাই সে কাজ করছে, ফলে কি হয়, সে পুরো শক্তি পেয়ে যায়। **তখন এই কঠিন আচার্যের কর্ম করতে পারে**। আচার্যের কাজ খুব কঠিন কাজ, কারণ আপনি মানুষের ভাল করতে চাইছেন। আর এমনি খোস গপ্প করতে চান, সময় কাটাতে চান; কাজ নেই বসে আছি, সময় কাটানোর জন্য গল্প করে যাচ্ছি। আমার একটা খুব প্রিয় গল্প আছে, আগেও অন্যান্য ক্লাশে বলেছি।

কলকাতা থেকে ট্রেনে দুই সর্দারজী যাচ্ছে। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে, 'কোথায় যাবেন'? অন্যজন বলছে, 'চণ্ডীগড়'। 'আরে আমিও চণ্ডীগড় যাচ্ছি। চণ্ডীগড় বেড়াতে যাচ্ছেন, না থাকতে'? 'না, আমি ওখানেই থাকি'। 'তাই, আমিও থাকি। কোথায় থাকেন'? 'অমুক জায়গায় থাকি'। এরপর রাস্থার কি নাম, বাড়ির কত নম্বর সব হয়ে হয়ে শেষ বলছে, আরে আমিও তো ওখানেই থাকি। প্যাসেঞ্জাররা বিরক্ত হয়ে বলছে, আপনারা কি বকবক করছেন? তখন বলছে, আমরা দুজন বাপ-ব্যাটা। লম্বা রাস্থা, সময় কাটানোর জন্য গল্প করছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন সব খোস গপ্প। শাস্ত্র প্রবচন যখন হয়, কথামৃতের ব্যাখ্যাও যখন হয় সব জায়গায় এটা সেটা বলে খোস গপ্পই হয়। শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি নেই।

ঠাকুর আবার একটা উপমা নিয়ে আসছেন। ঠাকুরের উপমাগুলো অতি সাধারণ, বিশেষ করে গ্রামদেশের উপমাগুলোই বেশি, কিন্তু একেবারে খাপে খাপে বসে যায়।

এক বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা করেছিল। তখন লোকে বুঝেছিল যে, ওই প্রজার পেছনে একজন বলবান লোক আছে। হয়তো আর-একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্যের এমন কঠিন কাজ করতে পারে না। এই ধরণের জিনিস আমরা চারিদিকে দেখতে পাই। এখন জানা যাচ্ছে যে, চীনের সৈন্যরা যেখানে ভারতীয় সৈন্যদের সাথে মারামারি করেছিল, প্রথমে মনে হচ্ছিল সৈন্যরা নিজেরা মারামারি করেছে। এখন আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স বলছে, চায়নার যে বড় কমাণ্ডার, সে বলে রেখেছিল ভারতীয়দের মারার জন্য। পেছন থেকে শক্তি আছে বলে ভারতীয়দের উপর হামলা করার দুঃসাহস হয়েছে, না হলে করতে পারত না।

শক্তি বাড়ানো, এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য আরও কিছু ঘটনার কথা বলছি। ঠিক এই ধরণের ঘটনা ঘটেছিল মহাভারত যুদ্ধের সময়। ভীষ্ম আর অর্জুনের যুদ্ধ হচ্ছে, অর্জুন ভীষ্মকে হারাতে পারছেন না। সন্ধ্যেবেলা যুধিষ্ঠির কৌরব শিবিরে গিয়ে ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'পিতামহ! আপনি বলুন কিভাবে আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করা যাবে'। পিতামহ তখন বলছেন, 'তুমি শ্রীকৃষ্ণকে গিয়ে বলবে, আমি স্ত্রী লোকের সাথে লড়াই করি না। উনি বুঝে নেবেন'। শ্রীকৃষ্ণ শুনেই বুঝে নিয়েছেন। পরের দিন শিখণ্ডীকে তিনি অর্জুনের রথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। শিখণ্ডী আগে ছিল নারী, তপস্যা করে পরে পুরুষ হয়েছে, ভীষ্ম তাঁকে মেয়ে রূপেই দেখতেন। শিখণ্ডী নিজেও একজন মহারথী ছিলেন। যোদ্ধারা যে কবচ ধারণ করে যুদ্ধ করে, সেই কবচগুলি বাঁধার একটা বিশেষ নিয়ম থাকত আর তার

একটা বিশেষ শক্তি হত, যার জন্য বাণ কবচ ভেদ করতে পারত না। ইদানিং কালে যে যুদ্ধ হয়, তাতে আর্মার্ড ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে দেখা যায়। আর্মার্ড ট্যাঙ্ক এক বিশেষ রক্ষাকবচযুক্ত ট্যাঙ্ক, এমনি রাইফেলের গুলি লাগলে ট্যাঙ্কের কিছু হয় না। ওই ট্যাঙ্ককে বিশেষ ভাবে মারতে হয়। শিখণ্ডী বাণ মারছে, সেগুলো ভীষ্মের শরীরে গিয়ে বিধে যাচ্ছে। ভীষ্ম ভাবছেন, শিখণ্ডী মহারথী ঠিকই, কিন্তু ওর বাণে অত শক্তি নেই যে আমার কবচকে ভেদ করে আমার শরীরে এসে বিধবে। ভীষ্ম একটু ভাল করে নজর করতেই দেখছেন, পিছন থেকে অর্জুন বাণ চালাচ্ছে। ভীষ্ম আগেই বুঝে গেছেন, শিখণ্ডীর দম নেই, ওর পিছনে বড় কেউ আছে। হিন্দু শাস্ত্রে এই ধরণের প্রচুর গল্প আছে।

মহাভারতে নর-নারায়ণ ঋষির গল্প আছে। একজন দুর্ধর্ষ রাজা সবাইকে যুদ্ধে পরাস্ত করে যাচ্ছে। একজন বিরক্ত হয়ে রাজাকে বলল, হিমালয়ে নর ঋষি আছেন, আমাদের সাথে যুদ্ধ না করে আপনি গিয়ে ওর সাথে যুদ্ধ করুন দেখি। রাজা গেল যুদ্ধ করতে। কিন্তু দেখছেন নর ঋষির শরীরটা একেবারে কঙ্কালসার। শরীর মানে কয়েকটা হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, ও হল নরঋষি। যুদ্ধকর্ম ঋষিদের জন্য নয়, রাজাকে উনি বোঝালেন। কিন্তু রাজা ছাড়বে না, যুদ্ধ করতেই হবে। অনেকক্ষণ ধরে যখন জ্বালাতে থাকলেন, তখন সেই ঋষি একটা খড়ের টুকরো নিয়ে ওর মধ্যে মন্ত্রশক্তি ভরে দিলেন। মন্ত্রশক্তি মানে পুরো ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ওই খড়ের টুকরোতে এসে গেল। ঋষি মন্ত্রসিক্ত খড়ের টুকরোটা রাজার সৈন্যদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। এ্যটমিক বোমাতে যেমন চেইন রিয়্যাকশান হয়, ঠিক সেই ভাবে খড়ের টুকরো এবার এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট, আট থেকে ষোল হয়ে হয়ে ওখানে যত সৈন্য, যত হাতি, যত ঘোড়া আছে আর তাদের শরীরে রোমকুপের যত ছিদ্র আছে, সব ছিদ্রে ঢুকে গেছে। ভাবা যায় যত সৈন্য, যত ঘোড়া, যত হাতি আছে সব্বারই রোমকুপে খড়ের টুকরো ঢুকে গেছে। কারণ ওটা তো এখন আর খড় না, তার মধ্যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এগুলোকে কাহিনী বলে মনে হয় ঠিকই, আর এটাও ঠিক যে এটা একটা কাহিনী। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা এই জিনিস নিয়মিত ব্যবহার করে থাকি। আমেরিকাতে থাকার সময় স্বামীজী ফ্রান্সিস লেগেটের বাড়িত অতিথি হয়ে কয়েকদিন ছিলেন। লেগেট বিরাট ধনীলোক, তাঁর নিজস্ব গলফের মাঠ ছিল। গলফ মাঠ বিশাল এলাকা জুড়ে হয়ে থাকে, যার মধ্যে জলাশয় আছে, বাগান আছে, বড় বড় গাছগাছালি আছে আর ওর মধ্যেই স্টিক দিয়ে একটা বলকে দূরে একটা গর্তের মধ্যে ফেলতে হবে। একদিন সকালে স্বামীজী গলফ মাঠে পায়াচারী করছেন, সঙ্গে লেগেটের ছেলে আছে। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, 'দূরে একটা ঝাণ্ডা রাখা আছে, ওটা কি'? ছেলেটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল যে, এখান থেকে বলকে স্টিক দিয়ে মেরে ওই ঝাণ্ডার কাছে যে গর্ত আছে সেই গর্তে বলটাকে ফেলতে হয়। বলা হয়ে যে, বিশ্বের বড় বড় খেলোয়াড়রাও এক চান্সে বল গর্তে ফেলতে পারে না। স্বামীজী বলছেন, 'আমি যদি একবারে বলকে গর্তে ফেলে দিতে পারি'? লেগেটের ছেলে বলছে, 'যদি পারেন আমার তরফ থেকে এক ডলার বাজি রইল'। ইতিমধ্যে ফ্রান্সিস লেগেটও এসে গেছেন, সব শুনে তিনিও দশ ডলার বাজি রাখলেন। স্বামীজী এগিয়ে গিয়ে স্টিকটাকে দেখলেন, মাপলেন, বলটাকে দেখলেন কেমন। স্টিকটা দু-বার ঘুরিয়ে মারলেন বলটাও সোজা গিয়ে সেই গর্তে ঢুকে গেল। লেগেট তো অবাক! আমেরিকার যারা বেস্ট গলফার তারাও এটা পারবেন না। লেগেট স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করছেন, 'এর সাথে কি আপনার যোগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে'? স্বামীজী হেসে বলছেন, 'না, যোগকে আমরা এই ধরণের সাধারণ জিনিসে লাগাই না। আমি আমার মনকে বললাম, ওনার হাতে দশ ডলার আছে, ওর ওই পকেটে এক ডলার আছে, ওটা আমার পকেটে আসা চাই। তখন আমার মন আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে, আমার পেশীগুলোকে আদেশ করল, বাকি যা করার ওরা তা করে দিল'।

এক সময় আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করার আগ্রহ হয়। গলফ কি করে খেলা হয়, গলফের ভাল ভাল নামকরা যত খেলেয়োড়রা আছেন, তাঁদেরকে নিয়ে পড়াশোনা করলাম। তখন বুঝতে

পারলাম, স্বামীজী যেটা করলেন, ঠিক এই সিদ্ধন্তেই গলফ খেলা হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বলছেন, একটা স্টিক থাকে, হকি স্টিকের মত দেখতে। যখন ওই স্টিকটা চালায় তখন যারা ভাল খেলোয়াড় সেখানে যে শুধু হাতের শক্তি থাকে তা না, পুরো শরীরের শক্তি সেখানে চলে আসে। যারা আরও ভাল খেলোয়াড় তারা এত একাগ্র ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে বলছেন, পুরো পৃথিবীর শক্তিটাকে দুটো পায়ে এনে মাটিকে পা দিয়ে চেপে রাখে, সেখান থেকে তার শরীর, তার নিজের হাতে সেই মাধ্যমে শক্তি সঞ্চার করে, আর সেইভাবে জিনিসটা চলে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল শক্তির সমুদ্র, এই শক্তিকে এমন ভাবে সঞ্চারিত করতে হবে, এলোপাতাড়ি না গিয়ে আপনার শরীর, শরীরের অঙ্গের মাধ্যমে পুরো ইউনিফাইড হয়ে একটা দিকে কাজ করবে। যার জন্য কুং ফু ফাইটারসরা সাংঘাতিক ফাইটার হয়। ওদের শরীর আমাদের শরীরের মত, মাসেলস আমাদের থেকে একটু বেশি হবে, কিন্তু ওরা শক্তিটাকে এমন ভাবে সংঘটিত করে নেয় যে, পুরো শক্তিটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসে। আমরা কুং ফুতে দেখছি ফাইটার তার বিপক্ষকে শুধু হাত দিয়ে মারেন, তখন পুরো শরীরের শক্তি আর পৃথিবীর যে নিজস্ব একটা শক্তি রয়েছে, সেখানে পা একশান্ দিচ্ছে, পা রিয়েকশান দিচ্ছে, সেই রিয়েকশান থেকে শক্তি নিয়ে হাত দিয়ে সামনের লোকের দিকে যায়, একটা মারলেই মানুষ শেষ। শুধু মানুষই শেষ হয়ে যায় না, বড় বড় পাথর পর্যন্ত ভেঙে দিচ্ছে। অণিমা, লঘিমা, গরিমা, এই যে যোগসিদ্ধি গুলি আছে, এগুলোও সেই একই সিদ্ধান্তে চলে।

যদি আমরা শব্দের উপর আসি, বিশেষ করে যাঁরা লেখালেখি করেন, যাঁরা লেকচার দেন, এটা যতক্ষণ ঈশ্বরের আদেশ না আসে, হয় না। ঈশ্বরের আদেশ তো অত সহজে আসবে না বা যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন না তাঁদের কি হবে? বৈজ্ঞানিকরা তো ঈশ্বর মানেন না। স্বামীজী এটাকে খুব সহজ ভাষায় বলেছেন, যে ভাষায় আমরা বুঝতে পারি – From purity and silence come power of word। একটা যে শব্দ, তার যে শক্তি, সেই শক্তিটা আসে কোত্থেকে? নীরবতা আর পবিত্রতা থেকে। পবিত্রতা হল নিঃস্বার্থপরতা, যেখানে আপনার কোন স্বার্থ নেই। আপনার ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বলা হচ্ছে না। আপনি তো বলতে পারেন আমি তো তোমার ভাল চাই, তাই তোমাকে বলছি; তাও না। আপনি যদি সত্যিকারের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ভাল থাকেন, তাহলে এই কথা আপনাকে বলতেও হবে না। যখনই কেউ বলে, তোমার ভালর জন্যই বলছি, আমার সন্দেহ হয়ে যায়। হয়ত ওই কথাটা আমার ভালর জন্যই বলছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যে বলছে সেই লোকটি নিজে গোলমেলে। একটা বুলেটকে এমনি হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারলে কিছুই হবে না, কিন্তু একটা রাইফেলে রেখে মেরে দেখুন কি হয়। এক-একটি শব্দ এক-একটি বুলেট। ওই শব্দকে যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে সেই শব্দকে একটা রাইফেলের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। আপনার যে মন, যেখান থেকে শব্দগুলি বেরোচ্ছে, ওই মনটাকে যদি হাতে ছোঁড়া যন্ত্রের বদলে একটা মেশিনগান বানাতে চান তাহলে চাই পবিত্রতা, চাই মৌন। ধ্যানের নীরবতা যদি না থাকে, শরীর মনের পবিত্রতা যদি না থাকে, শব্দের জোর আসবে না। লেখালেখিতেও তাই। উপন্যাসগুলি একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার আর পড়তে ইচ্ছে করে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, উপন্যাসগুলো পড়ুন, দেখবেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। গীতা পড়ুন, উপনিষদ পড়ুন, দেখবেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

অন্য একটা প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা বলছি। স্বামীজীর একটা কোটেশান, খুব সুন্দর কোটেশান, ওটা কোন কারণে আমার মাথায় ছিল না। আমি তখন অন্য জায়গায় ছিলাম। সেখানে রেডিওতে আমি ওই কোটেশানটা শুনি, শুনে আমি অবাক হয়ে যাই; এত সুন্দর কথা কে বলছেন? বলছেন, 'শ্রেয়োর পথ অত্যন্ত কঠিন, আশ্চর্য এই নয় যে শত শত মানুষ এই পথে পড়ে যায়, আশ্চর্য এটাই যে কয়েকজন সফল হয়'। স্বামীজী পজিটিভিটি কল্পনা করা যায় না। কি পজিটিভ মানুষ, যদি আপনি ভালর পথে চলতে চান, শ্রেয়োর পথে চলতে চান, একশজনের মধ্যে নিরানব্বই জন্য উল্টে পড়বে। আশ্চর্য এই নয় যে নিরানব্বই জন পড়ে গেছে, আশ্চর্য এটাই একজন সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছাতে

পেরেছেন। আমি খুব অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এই ধরণের কথা কার হতে পারে। আমি এমন জায়গায় ছিলাম যে সেখানে কাউকে জিজ্ঞেস করে যে জানব, তার উপায় ছিল না। তারপরে আরেকবার বলতে গিয়ে যখন বলছে, স্বামী বিবেকানন্দ নে কঁহা। তারপর আমি কোটেশানটা খুঁজে বার করলাম।

তার অনেক পরে, তাও আজ থেকে পনের বছর আগেকার কথা; আমি কথায় কথায় ফোনে আমার এক বন্ধুকে একটা কারণে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই কোটেশানটা বললাম। বন্ধুটি অবাক হয়ে আমাকে বলছেন, 'আর যাই হোক, এটা আপনার কথা হতে পারে না'। তিনি এমন কোন ভক্তও নন, কিন্তু পরিষ্কার বলছেন, এটা আপনার কথা হতে পারে না। এই কথায় এমন একটা জোর আছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, এটা আমার হতে পারে না। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এটা স্বামীজীর কথা'। কথা শুনলেই বোঝা এটা অন্য কোথা থেকে এসেছে –এই হল চরিত্রের শক্তি। স্বামী বিবেকানন্দের এই শক্তি কোত্থেকে এলো? পবিত্রতা ও মৌনতা থেকে।

গান্ধীজীর যে চরিত্রের শক্তি, কোত্থেকে এলো? সত্য আর অহিংসা থেকে। যেদিন বলে দিলেন, অহিংসা আর সত্যকে নিয়ে আমি চলব, সেদিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কোন পরিস্থিতিতেই তিনি সত্য আর অহিংসা থেকে সরলেন না। পুলিশ মাথায় লাঠি মারছে তখনও তিনি হাত দিয়ে মাথা বাঁচাচ্ছেন না। গান্ধীজী যখন বলছেন, ভারত ছাড়ো, পুরো দেশ দাঁড়িয়ে বলছে, ভারত ছাড়ো। এখন নেতাতে দেশ ছেয়ে গেছে, তার মধ্যে কজন নেতা আছে যে, সে বলছে আর সবাই তার কথায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে? কেন? কারণ সেই ত্যাগ কোথায়? তোমার পবিত্রতা কোথায়? মৌনতার সাধনা কোথায়? ঠাকুর যে বলছেন, ঈশ্বরের আদেশ, এটা শেষ কথা। এর প্রথমটা এখান থেকে শুরু হয়। এখানে ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের লেকচার নিয়ে যা বলছেন, সেটাকে নিয়ে বলছি না, আমার আপনার সবারই কথা নিয়ে বলছি।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলছেন –সমাধি থেকে শক্তি আসে। তিনি সেখান থেকে ধাপে ধাপে নামিয়ে বলছে, যারা সমাধি পারে না, তাদের জপধ্যান করতে হয়; যারা জপধ্যান পারে না, তাদের নিয়মিত বেদপাঠ করতে হয়। সেখান থেকে নামতে নামতে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন –যদি কেউ নিয়মিত ভাবে সাধনা রূপে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত করে, তাতেও তাদের শক্তি আসে। এইসব বলার পর শেষে বলছেন –এরা মুক্তি যদি নাও পায়, শিবলোকে অবশ্যই যাবে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে এত সুন্দর করে সহজ ভাবে বলছেন, আমার খুব ভাল লেগেছিল। বলছেন, একটা কোন শুদ্ধি চাই। আপনি ভেবে দেখুন, কোন জিনিসটা আপনি ভাল করতে পারেন; যেটা ভাল পারেন সেটাতে মনকে একাগ্র করে লেগে থাকুন।

একজনের কাছে একটা খুব সুন্দর গল্প শুনেছিলাম, গল্পটা একজন ইংলিশ সাহিত্যিকের রচনা। একটা বাচ্চা ছেলে ছিল, সে জাগলিং খুব ভাল পারত। কিভাবে কিভাবে তাকে একটা চার্চের সাথে যুক্ত হতে হয়েছে। তারপর দেখা গেল, রোজ দুপুরবেলা তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। ফাদার ওকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করলেন, ছেলেটি রোজ কোথায় যায়? ফাদার দেখছেন, দুপুরবেলা চার্চের পাশের গেট দিয়ে চার্চের ভিতরে চলে যায়। যেখানে যীশুখ্রীষ্টের প্রতিমা আছে, ভিতরে কেউ নেই, পুরো চার্চ ফাঁকা, সেখানে বল নিয়ে যীশুকে বলের খেলা দেখাচ্ছে। এই হল ভক্তি, এটাই সাধনা। মায়েরা যাঁরা ভাল রান্না জানেন, রোজ একটা ভাল রান্না রাঁধুন, সেটা ঠাকুরকে অর্পণ করুন। ওই রান্না নিজেও খাবেন না, বাড়ির কাউকে খেতে দেবে না, গরীবলোক যারা আছে, তাদের একজনকে রোজ খাওয়ান। কিন্তু সেটা আপনার শ্রেষ্ঠ একটা রান্নার পদ হতে হবে।

আমি এক সময় কানপুরে ছিলাম, সেখানকার একটা গ্রামে কোন কাজে গিয়েছিলাম। সেখানে চা দিয়েছে। একজনকে বললাম, চা খান। সে বলল, আমি চা খাই না, শিবকে অর্পণ করে দিয়েছি। শিবকে অর্পণ করে দিয়েছেন মানে? একবার কেদারের ওদিকে কোথায় গিয়েছিল। ভদ্রলোকের কি একটা সমস্যা ছিল, তা শুনে আরেকজন ওকে বলল, 'তোমার যেটা প্রিয় সেটা তুমি শিবকে অর্পণ করে দাও, দেখবে তোমার সমস্যা চলে গেছে'। আরও বলল যে, 'আমাদের এখানে অনেকে আছে যার যেটা

ভাল লাগে, কেউ কলা, কেউ পেয়ারা; আবার অনেক সময় যার মনে হয় যেটা আমি সহজে ছাড়তে পারব, দেবতাকে অর্পণ করে আর সেই জিনিসটা ছোঁবে না'। যাঁরা খুব কড়া সাধক, যাঁর যেটা অত্যন্ত প্রিয়, সেটা ঈশ্বরের নামে অর্পণ করে দেয় –হে প্রভু আমি এটা তোমাকে অর্পণ করে দিলাম, আর আমি এটা ছোঁব না। স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ আমাদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মহারাজের গর্ভধারিণী ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের দীক্ষিতা। মা একদিন রাজা মহারাজকে বলছিলেন, 'ঠাকুরের জন্য কিছু করতে চাই'। রাজা মহারাজ বললেন, 'তোমার যেটা প্রিয় সেটা ঠাকুরকে দিয়ে দাও'। তখন মা বলছেন, 'আমার সবচেয়ে প্রিয় তো আমার এই ছেলে'। উনি তখন রাজা মহারাজের কাছে ছেলেকে রেখে বললেন, 'আমার এই ছেলে ঠাকুরকে দিলাম'। সেই ছেলে পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিরাট পণ্ডিত সাধু হয়ে গেলেন, কত তাঁর লেখা বই, কত শাস্ত্র ইংলিশে অনুবাদ করেছেন।

এই পবিত্রতা ও মৌনতা যদি হয় তখন ধীরে ধীরে শক্তি বাড়ে। শক্তি যখন পেয়ে যাবেন, তখন দেখবেন, আপনার কাজেকর্মে, আচার আচরণে, কথাবার্তায় একটা আলাদা শক্তির স্ফুরণ হতে শুরু হয়ে যাবে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আবার প্রশ্ন করছেন।

বিজয় – মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না? আসলে এই প্রশ্ন করে জানতে চাইছেন, ব্রাহ্মসমাজে আচার্য রূপে আমি যে উপদেশাদি দিচ্ছি, এগুলো কোন কাজে লাগছে কিনা? ঠাকুর তখন বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ – মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। এখানে দুটো জিনিস দেখার আছে। এই যে আপনারা অনেক সময় আমার কথাগুলির আপত্তি করছেন, উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করছেন, আসলে আপনি কি করতে চাইছেন? আমরা যদি সহজ ভাষায় এর অর্থের অনুসন্ধান করি তখন এর অর্থ দাঁড়ায় –আপনি আমাকে শিক্ষা দিতে চাইছেন। আপনি নিজেকে উদ্ধার করুন। নিজে শুতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। আমি কেন এই ক্লাশগুলো করছি? আমি নিজে উদ্ধার হতে চাইছি। আমি কাউকে উদ্ধার করতে চাইছি না, আমার ক্ষমতাই নেই। আমি যে কথামৃতের ক্লাশ নেব, তিন দিন ধরে আমার মনের মধ্যে এই ক্লাশের কথা ঘুরছে, কি কি আলোচনা করব, সেগুলোকে কিভাবে গুছিয়ে নেব, সব সময় আমার মনে এই আলোচনা চলতে থাকছে। যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে শোনেন, দেখবেন আপনাদের মনেও সকাল থেকে ঘুরতে থাকে – আজ কথামৃতের ক্লাশ আছে, আমি শুনব, আজকে এই অংশটা আলোচনা হবে, কথামৃতটা একটু খুলে দেখি। তার মানে আপনার মনটা ধীরে ধীরে ওই ভাবে চলে যাচ্ছে। এটাতে নিজের উত্থান হয়। করতে করতে সেখান থেকে যখন পবিত্রতা, মৌনতা এগুলো যখন এসে যায় তখন আসে শক্তি। শক্তি যখন আসে, তিনি তখন সাক্ষাৎ আদেশ করেন। যীশুর শিষ্যরা যাঁরা ছিলেন, তিনি তাঁদের সাক্ষাৎ আদেশ দিলেন –আমি আদেশ করছি, যাও, লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের কথা প্রচার কর। তাঁরা জেনে গেছেন যীশু ঈশ্বরের সন্তান।

এই যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রশ্ন করছেন, ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না, এগুলোই হল কাঁচা কথা। যদি পরিত্রাণ হত, আপনি নিজেই জানতে পারতেন পরিত্রাণ হয় কি হয় না, আপনাকে আর এই প্রশ্ন করতে হত না। আমার পরিচিতদের অনেকে আমাকে অনেক সময় বলে, 'এই যে আপনি এত কথা বলে যাচ্ছেন, এতে কি লোকেদের ভাল হয়'? আমি কি করে জানব লোকের ভাল হয় কিনা। লোকের ভাল করা আমার কাজ না। তার থেকে বেশি, আমার কি ক্ষমতা আছে যে লোকের ভাল করিয়ে দেব? কথামৃতের যদি ভাল করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে আপনিও কথামৃত পড়ে লোকেদের ভাল করে দিতে পারেন। আমার একটা শাস্ত্রসঙ্গে হচ্ছে, আপনি একটা শাস্ত্রসঙ্গ করছেন। সেখান থেকে আমি আরেকটা নলেজ ব্যাঙ্ক থেকে সিস্টেমেটিক ওয়েতে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি; এটা একটা সাইড কাজ।

মূল কাজ হল যে কাজই করছি দেখতে হবে তাতে নিজের উত্থান হচ্ছে কিনা। ত্যাগ যখন করা হয়, তখন নিজের উত্থান, সেবা যখন করছেন; নিজের উত্থান; পবিত্রতা যখন পালন করছেন, নিজের উত্থান। গান্ধীজী বারবার বলছেন, এই যে সত্য, অহিংস পালন করছি, এগুলো আমি অপরের জন্য করছি না, আমার জন্য করছি, দেখছি এর মাধ্যমে ঈশ্বরদর্শন হয় কিনা। ওনার কাছে দেশ, রাজনীতি সব গৌণ, মুখ্য হল আমার নিজের আধ্যাত্মিক উত্থান। যেটাই আমরা করি না কেন, সমাজসেবা করছি, মাথায় রাখতে হবে, এর মাধ্যমে যেন আপনার নিজের উত্থান হয়। উদ্দেশ্য সব সময় থাকবে, আমার নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে কিনা।

অপরের নামে যে আপনি নিন্দা করছেন, এতে কি আপনার উন্নতি হচ্ছে? অপরের প্রশংসা যদি করেন, এতে কি আপনার উন্নতি হবে? হ্যাঁ হবে, সব সময়ই হবে। অপরের প্রশংসা করা মানেই আপনার উন্নতি। কেন? কারণ, আপনি তখন inclusive হয়ে যাচ্ছেন। আধ্যাত্মিকতায় inclusive ছাড়া আর কিছু নেই। Sprituality means inclusiveness। কারুর প্রশংসা করা মানেই আপনি তার সাথে জুড়ে গেলেন। কারুর নিন্দা করা মানেই, সেখান থেকে আপনি সঙ্কুচিত হয়ে ফেরত চলে এলেন। সেইজন্য জীবনে কক্ষণ কারুর নিন্দা করতে নেই, এমনকি আপনার যে শত্রু, তারও নিন্দা করতে নেই। কারুর নিন্দা বা প্রশংসা করার ব্যাপারে যদি সচেতন থাকেন, তাহলে জানবেন আপনার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। ওনার প্রচুর স্মৃতিকথা আছে, শত শত, হাজার হাজার লোকের স্মৃতির মণিকোঠায় তাঁর অনেক স্মৃতিকথা সংগ্রহিত হয়ে আছে। মহারাজের কাছে অনেক বই আসত, প্রচুর বই পড়তেনও। শেষ বয়েসে অত পড়তে পারতেন না। একটা নূতন বই এসেছে, বইটা তিনি একজন মহারাজকে দিয়ে বলেছেন, 'বইটাতে কি আছে বলতো'। সেই মহারাজ পড়ে বলছেন, 'এর মধ্যে কিছু নেই'। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তা কি কখন হয়? কিছুই থাকবে না, এটা কি কখন হয়'? ওই মহারাজ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন –এই হল পজিটিভ আউটলুক, আমি জানি বইতে এমন কিছু নেই, কিন্তু স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী সেখানেও দেখছেন একটু কিছু আছে কিনা।

আরেকটি ঘটনা, এটা আমি বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট, স্বামী সুহিতানন্দজীর কাছে শুনেছিলাম। মহারাজ স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের অনেক দিন সেবক ছিলেন। প্রেমেশানন্দজী মহারাজের শরীর যাওয়ার পর উনি বেলুড় মঠে এসেছেন। প্রেমেশানন্দজী একজন মহারাজের নাম করতেন, ঠাকুরের যে মন্দির সেখানে উনি ঠাকুরের সেবা করতেন, ফলটল কাটতেন। স্বামী সুহিতানন্দজী ওই মহারাজের কাছে যেতেন। একদিন মহারাজ দেখছেন, কোন ভক্ত ফল দিয়েছে, পেপে বা আম কিছু ছিল, দেখছেন পুরোটাই পচা। সুহিতানন্দজী ওই মহারাজকে বলছেন, 'এই ফলটা পুরোটাই পচা, এটা ফেলে দিচ্ছি'। মহারাজ চমকে উঠে বলছেন, 'আরে না না ফেলে দিও না; অনেক আশা করে ভক্ত ঠাকুরকে দিয়েছে, দেখি কিছু অংশ ভাল পাওয়া যায় কিনা'। উনি ফলটাকে নিয়ে ছুড়ি দিয়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে তার থেকে একটা ছোট্ট টুকরো কেটে বার করলেন, তারপর সেটাকে ঠাকুরের নৈবদ্য যেখানে অর্পণ করা হয় সেখানে রাখলেন।

স্বামীজী বিদেশে যাবেন, যাওয়ার আগে স্বামী তুরিয়ানন্দজীকে বলছেন, ভাই আমি তোমাদের ধর্মটর্ম বুঝি না, তবে একটা কথা বলতে পারি, আমার হৃদয় বিরাট হয়ে গেছে। হৃদয় বিরাট হয় গেছে মানে, আপনি সবাইকে নিয়ে চলতে পারছেন। যাকে আপনি পছন্দ করেন না, তারও তো কিছু গুণ আছে; ওই গুণটুকু নিতে হয়। মাছি ভালতেও বসে, মন্দতেও বসে; ফুলেও বসে, বিষ্টাতেও বসে। মৌমাছি শুধু ভালতে বসে, মন্দে কক্ষণ বসে না। মক্ষিকাবৃত্তি ত্যাগ করতে হয়, মধুকরবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। আপনি একটা কাগজে, দুই, তিন, চার, পাঁচ করে পাঁচজনের নাম লিখুন। এরপর প্রত্যেক নামের

পাশে লিখতে থাকুন ওর মধ্যে কি কি গুণ আছে, কি কি সম্ভাবনা আছে, কিছু না কিছু থাকবেই। এবার আপনি ওই লোকটি আর তার ওই গুণ, এইভাবে চিন্তা করতে থাকুন, দেখবেন আপনার মনটা শান্ত হয়ে গেছে। যেটাই আপনার বিরক্তি উৎপাদন করে, তা সে কোন মানুষ, যে কোন সিদ্ধান্ত, যে কোন পরিস্থিতি; দেখবেন ওর কিছু একটা অবশ্যই ভাল থাকতে হবে। থাকতেই হবে, ভগবান এমন কোন জিনিস করবেন না, যার পুরোটাই বাজে হবে, যেটা স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর ঘটনায় বললাম। ভালতে ফোকাস করতে হয়, এতে শক্তি বাড়ে।

ঠাকুর বলছেন –**যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সে মায়া থেকে মুক্ত করতে পারবেন**। যিনি বেঁধেছেন তিনি বা তাঁর উপর যিনি আছেন; ঈশ্বরের উপরে তো আর কেউ নেই, সেইজন্য ঈশ্বরই পারেন এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। **সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বরলাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে**। আমরা যে সাধু-মহাত্মাদের ভালবাসি, আমরা মনে করি তাঁকে কষ্টের কথা বলব, তিনি বলবেন আর আমার কষ্টের মোচনও হয়ে যাবে। জিনিসটা এভাবে হয় না।

পুরাণে একটা প্রচলিত কথা আছে, দেবতাদের যখন প্রার্থনা করা হয়, এখানে দেবতা বলতে ইন্দ্রাদি দেবতাদের বলছেন; আমরা এই প্রার্থনা ভগবানের উপরেও নিয়ে যেতে পারি, তখন দেবতারা হাতে লাঠি নিয়ে আপনাকে রক্ষা করতে আসেন না। কিভাবে আসেন? সদ্‌বুদ্ধি দিয়ে দেন। আপনি ঠাকুরের কাছে প্রচুর প্রার্থনা করছেন, হে ঠাকুর, আমার দিনকাল খুব খারাপ চলছে, হে প্রভু কিছু করে দাও। গল্পেটল্পে পাবেন, প্রভু তখন এই করে দিলেন, সেটা করে দিলেন; এগুলো গল্পেই হয়। তাহলে আসলে কি হয়, সত্যিকারের প্রার্থনা যদি করা হয়? প্রভু তখন আপনাকে সদ্‌বুদ্ধি দিয়ে দেন। ঠাকুর নরেনকে বললেন, যা, কালী মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে টাকা-পয়সা চেয়ে নে। নরেন গিয়ে টাকা-পয়সা চাওয়ার বদলে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য চাইলেন। নরেন সদ্‌বুদ্ধিই চাইছেন। ঠাকুর যখন এগুলো বলছেন –কল্পতরু বৃক্ষের নিচে গিয়ে কেউ লাউ-কুমড়ো চায় না, এর অর্থটা হল –আপনার জন্য যেটা শ্রেষ্ঠ সেটাই আপনি চাইবেন।

আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ কি? বুদ্ধি। গতকাল আমার এক পরিচিতের কাছ থেকে হোয়টস্যাপে একটা মেসেজ এলো, ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আমার কাছে জানতে চাইলেন, হিন্দুদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র, শক্তিশালী মন্ত্র কি? আমি বললাম, গায়ত্রী মন্ত্র। তিনি জানতে চাইলেন, কেন? আমি মজা করে লিখলাম, প্রথম কথা গায়ত্রী মন্ত্র বেদের খুব প্রাচীন মন্ত্র, নৈর্ব্যক্তিক মন্ত্র, বেদের কোন দেবী-দেবতার নামে নয়; কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রের সবচেয়ে বড় যেটা, তা হল যখন বলছেন, *ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*, আমার বুদ্ধিকে প্রচোদিত কর, আমার বুদ্ধিকে জাগিয়ে দাও। ভগবান অন্য কিছু করেন না, ভগবান আপনার জন্য লাঠি নিয়ে লড়াই করতে নামবেন না। কাহিনীতে আমরা দেখছি শিব ত্রিশূল নিয়ে নেমে পড়েছেন, ঠিকই বলছেন; এগুলো কাহিনীতেই হবে, দৈনন্দিন জীবনে এভাবে হয় না। আপনি যদি শিবভক্ত হন, শিবের সাধনা যদি করেন, আর তিনি আপনার সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে যদি কৃপা করেন, তিনি কি কৃপা করবেন? আপনার বুদ্ধিকে প্রচোদিত করে দেবেন, বুদ্ধিকে খুলে দেবেন। বুদ্ধি খুলে গেলে তখন কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল আপনি বুঝতে পারবেন।

অন্য দিকে বুদ্ধি যখন খুলে যায়, শক্তি তখন বেড়ে যায়। শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্র প্রবচন, শাস্ত্র শ্রবণ, এগুলো সাধনা, এই সাধনা দিয়ে বুদ্ধি খোলে। শাস্ত্রের যদি কৃপা হয়, ঈশ্বরের কৃপা যদি হয়, আপনার বুদ্ধি খুলে যাবে। যেমনি বুদ্ধি খুলে গেল, বাকি সব কিছু নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমার কোন শক্তি নেই, কোন আদেশ পাওনি, আর তুমি বলছ আমি উদ্ধার করব, তা কি কখন হয়। এটাকে বোঝানর জন্য ঠাকুর একটা খুব সুন্দর ঘটনা বলছেন।

একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখছেন একটা ঢোঁড়া সাপ একটা বড় ব্যাঙ-কে ধরেছে। এখন সাপ ব্যাঙটা গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না; সাপেরও যন্ত্রণা, ব্যাঙেরও যন্ত্রণা। ঈশপের ফেবেলস্ গুলো খুব সুন্দর। সেখানে একটা গল্পে, একজন মহা কৃপণ মহিলা, তার একটা ভেড়া ছিল। ভেড়ার লোমগুলো কাটবে, কেটে বিক্রি করবে। লোমগুলো কাটছে, আর কাঁচি দিয়ে এমন চামড়া ঘেঁষে কাটছে যে, চামড়া কেটে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভেড়া বলছে, 'দেখ যদি তুমি আমার উম্ চাও তাহলে উম্ ঘরে আমাকে নিয়ে চল, যেখানে উম্ কাটা হয়। আর যদি আমার মাংস চাও, তাহলে আমাকে কষাইখানায় নিয়ে চলো, দুটোর মধ্যে কোনটাতেই আমার কষ্ট হবে না। কিন্তু তুমি তোমার আনাড়ি হাত দিয়ে আমাকে এই যন্ত্রণা দিও না'। আমরা এই রকম আনাড়ির হাতে পড়ে যাই। তার থেকেও বাজে, আমরা নিজেরা আনাড়ি, কিন্তু অপরকে উদ্ধার করতে নেমে যাই। একবারও ভাবি না যে এতে উভয়েরই কষ্ট হবে। এই ধরণের আনাড়ি লোক থেকে কারুর জীবনে শক্তি আসে না, জীবনে শান্তি আসে না, উপরন্তু উভয় পক্ষের অশান্তি।

যদি সদ্গুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা! শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসারবন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না। এই কথাগুলো ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলছেন, যিনি কোথাও মনে করছেন, তিনি লোকেদের মঙ্গল করছেন। এই যে কয়েকটি কথা বলা হল, আমার ভিতরে যে একটা গুণ, সেটাকে অবলম্বন করে একটা শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে নিয়ে চলে যাওয়া। এর জন্য লাগে পবিত্রতা, লাগে মৌনতা, সেখান থেকে শক্তি দাঁড় করাতে হয়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে মন শুদ্ধ হয়, ভগবান শুদ্ধ মনকে কৃপা করেন, সেখানে তিনি সদ্বুদ্ধি দেন, সেই সদ্বুদ্ধি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদ এখানে এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই আলোচনার শেষে আপনাদের আমি মনে করাতে চাইছি, আপনারা হিন্দু। আমাদের প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, হিন্দু হলে আমাকে কি করতে হবে? আমি হিন্দু, এই ভাবটা কিভাবে দৃঢ় হবে? এই সংশয় নিরসনের জন্য আমি 'The Hindu Way' বই লিখেছিলাম। বাংলাতেও এর অনুবাদ করা হয়েছে, যার নাম 'হিন্দু জীবনধর্ম'। পঞ্চ মহাযজ্ঞের উপর আমরা অনেকবার বিভিন্ন ক্লাশে আলোচনা করেছি। আমাদের প্রায়ই শুনতে পাই যে লোকেরা বলে, আমার মনে শান্তি নেই; কেউ বলে, পড়াশোনাতে আমার মন লাগে না; কেউ বলে আমি এত ধ্যান করছি কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাদের সবার জন্য আমাকে বলতে হচ্ছে যে, জীবনে কোথাও কোন ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার জন্য শর্টকাট কাজ দিয়ে কিছু হয় না। আপনার জীবনে একটা দৈনন্দিন নিয়ম তৈরী করুন, যার প্রথমটা হল ব্রহ্মযজ্ঞ, খুব কম হলে আধঘন্টা জপধ্যান করতে হবে। কি জপ করবেন? গুরুর কাছে যে ইষ্টমন্ত্র পেয়েছেন, সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করুন। ইষ্টমন্ত্র যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করুন। আমাদের 'অমৃতসেতু' নামে একটা চ্যানেল আছে, তাতে গায়ত্রী মন্ত্র ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন। গায়ত্রী মন্ত্র সবাই জপ করতে পারে। ভারত যবে থেকে স্বাধীন হয়েছে তবে থেকে ভারতের সবাই ব্রাহ্মণ –আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। মন্ত্র জপ এবং মন্ত্রের অর্থের উপর ধ্যান, খুব কম হলে আধঘন্টা করুন। শ্রীশ্রীমা বলছেন, দিনে দশ হাজার করে জপ করুক তো, দেখি কি করে অশান্তি হয়। দশ হাজার না করুন, আধঘন্টা করে রোজ করুন আর নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ। কি শাস্ত্র পাঠ করবেন সেটা আপনি নিজে ঠিক করে নিন। গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, যাঁরা হিন্দি জানেন তাঁদের জন্য রামচরিতমানস আছে, চৈতন্য চরিতামৃত, উপনিষদ, যে কোন একটা শাস্ত্র নিয়মিত কম করে পনের মিনিট পারায়ণ করে পাঠ করতে থাকুন। যেমন চণ্ডী, প্রথম দিন প্রথম অধ্যায়, পরের দিন দ্বিতীয় অধ্যায়। লোকেরা আবার জানতে চায় কবচাদি এগুলো পাঠ আগে না পরে করব। আপনি ভক্তির জন্য করছেন, যেমন ভাবে পারা যায় করুন। আজকে পঞ্চম, কাল তৃতীয় অধ্যায় করছেন, তাই করুন, কিছু একটা করতে শুরু করুন। আর বাড়িতে নিত্যপূজা তার সঙ্গে পাড়ায় যদি কোন মন্দির থাকে তাহলে সেখানে রোজ, পারলে দিনে দু-বার অবশ্যই যাবেন। সেই মন্দিরের

যদি বিধি থাকে স্নান না করে মন্দিরে আসা যাবে না, তাহলে স্নান না করে যাবেন না। যেখান এই ধরণের কোন বিধি নেই সেখানে এমনিই চলে যাবেন। তৃতীয় হল পিতৃযজ্ঞ, খাওয়ার সময় অল্প খাওয়া আলাদা করে রেখে পরে সেটা পশুপাখিদের খাইয়ে দিতে হয়। চতুর্থ হল মনুষ্য যজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ; কিছু গরীব লোক, ভিখারীকে অবশ্যই রোজ কিছু দান করতে হয়। আর শেষ যজ্ঞ হল ভূতযজ্ঞ, নিয়মিত পশুপাখিকে কিছু খাওয়া-দাওয়া দিতে হয়। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞই বলে দেয় যে সে একজন হিন্দু। প্রত্যেক ধর্মেই কিছু কিছু সামাজিক অনুশীলন আছে, ধর্মীয় অনুশীলন আছে; হিন্দুদের হল এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ, প্রত্যেক হিন্দুকে যা প্রতিদিন নিয়মিত করতে হয়। এক মাস টানা করুন, দেখবেন আপনার জীবনে যে অশান্তিগুলি আছে, অনেক কমতে শুরু হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মায়া বা অহং-আবরণ গেলেই মুক্তি বা ঈশ্বরলাভ

কথামৃতের ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, এই তারিখে আমরা দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আছি। সেখানে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মভক্তরা আছেন। বিজয়ের সঙ্গে ঠাকুরের কথা চলছে। এর আগে অনেক ধরণের আলোচনা হয়েছে। আগের পরিচ্ছেদে ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না। সেখান থেকে কিছু আলোচনা এগোবার পর মাস্টারমশাই পঞ্চম পরিচ্ছেদ শেষ করে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচনাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আগের আলোচনায় ঠাকুর বলেছিলেন, গুরু কাঁচা হলে শিষ্যের অহঙ্কার যায় না। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শুরুতে বিজয় ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন।

বিজয় – মহাশয়! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না?

ঈশ্বরকে দেখতে না পাওয়াটাই একমাত্র সমস্যা না। জীবনে আমাদের যত সমস্যা আছে, দুঃখ-কষ্ট, শক্তির অভাব, শান্তির অভাব, সব কিছুর মূলে একটিই সমস্যা। ঠাকুর এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন। ঠাকুরের ব্যাখ্যার উপর আলোচনা শুরু করার আগে দু-চারটে মূল কথা আলোচনা করে নিলে, এই অধ্যায়টা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

বাচ্চা বয়সে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন উঠত, এটা কেন, সেটা কেন, ওটা কেন নয় ইত্যাদি। বড়রা এসব প্রশ্নের কিছু একটা উত্তর দিয়ে দিতেন, উত্তরগুলো কিছুটা তাঁদের কল্পনা থেকে আর কিছু তাঁরা যেটা তাঁদের বড়দের কাছ থেকে যেটা শুনে এসেছেন। তার মধ্যে একটা সুন্দর প্রশ্ন থাকত, পৃথিবী কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দু মাইথলজিতে বলে, মাটির তলায় কয়েকটা হাতি আছে, তারা এই পৃথিবীটাকে ধরে আছে, সেই হাতিদের বলা হয় দিগগজ, আমরা বলি না দিগগজ পণ্ডিত, দিগ্ হল দিশা। মাঝে মাঝে হাতিগুলো কাঁধ পাল্টাপাল্টি করে, তখন ভূমিকম্প হয়। বাল্য বয়সে এই কাহিনী শোনার পর আমার মনে প্রশ্ন হয়েছিল, এই হাতিগুলো আবার কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? কারণ হাতিকেও দাঁড়ানোর জন্য একটা জায়গা চাই কিনা। এগুলো পৌরাণিক কথা। অনেক পরে ঠিক এই ধরণের একটা ঘটনা পড়লাম।

ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল খুব নামকরা ফিলজফার ছিলেন। তিনি একবার ফিলজফির কথা বলতে গিয়ে মাধ্যাকর্ষণের কথা বললেন; তখন তিনি খুব ইয়ং। সভাতে একজন খুব গোঁড়া খ্রীশ্চান বয়স্কা মহিলা বসেছিলেন। খ্রীশ্চানদের যে কাহিনী, তাতে বলা হয় যে পৃথিবীটা কচ্ছপের উপর স্থির হয়ে আছে। ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল নিজের ভাষণে নিজের বক্তব্য বলে বেরিয়ে গেলেন। লেকচার শেষে সেই বয়স্কা মহিলা উঠে রাসেলকে বলছেন, 'ইয়ংম্যান তুমি খুব ভাল বল, তবে শোন তুমি যা কিছু বলছ সবটাই প্লেইন বকওয়াস, মাধ্যাকর্ষণ না, এই পৃথিবী কচ্ছপের উপর স্থির হয়ে আছে'। ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল মজা করে জিজ্ঞেস করছেন, 'ওই কচ্ছপটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে'? মহিলা একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বলছেন,

'বুঝতে পারছি তুমি খুব বুদ্ধিমান যুবক, তোমার বুদ্ধি আছে। ওই কচ্ছপ আরেকটি কচ্ছপের উপরে দাঁড়িয়ে আছে'। 'আর ওই কচ্ছপ'? 'আরেকটি কচ্ছপের উপর'। 'সেই কচ্ছপটা'? 'সেটা আরেকটি কচ্ছপের উপর, পুরোটা কচ্ছপ কচ্ছপ কচ্ছপের উপরেই আছে'। ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেলের জীবনের এটা একটা মজার ঘটন। It is toirtoise all the ways down –খুব নামকরা কথা।

এগুলোকে বলে simplistic explanation। ফিজিক্সের, গণিতের, বায়োলজির একটা কোন সমস্যা এলে আমরা সহজ ভাবে বলে দিই। কিন্তু দেখা যায় সেটা থেকে আবার অন্য সমস্যা চলে আসে। ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে যখন কথা হয় বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যখন কথা হয়; তখন ঈশ্বর, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, যাঁর মনে কোন কামনা-বাসনা নেই, তিনি কেন এই সৃষ্টি রচনা করলেন? এই স্থূল জগৎ সেই শুদ্ধ চৈতন্য থেকে কিভাবে এলো, কেনই বা এলো? এগুলোর কোন উত্তর নেই। যতই এগুলোর উত্তর খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তখন, এ্যক্সপ্লোরার যেমন বেরিয়ে যান উত্তর দিকে কি আছে, দক্ষিণ দিকে কি আছে দেখতে। বিশ্ব ইতিহাসে আমরা অনেক নামকরা এক্সপ্লোরারদের কথা পাই। আবার অনেকে আছেন যাদের মনে ওই প্রশ্নগুলো ওঠে, এটা কেন, সেটা কেন। এই করে অর্কিমিডিস বা তারও আগে আরও অনেক বৈজ্ঞানিকরা এসেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও মানুষ নেমে পড়ে দেখতে, আমি কোথা থেকে এলাম।

এটাকে বলে রিভার্স টেকনলজি। রিভার্স টেকনলজি হল –একটা জিনিস আছে, ধরুন মিসাইল; এখন আমি আপনি যদি চান দুম্ করে মিসাইল বানাবেন, বানাতে পারব না। কারণ মিসাইল এমন প্রচণ্ড এ্যডভান্স টেকনলজি যে, কোন দেশ যদি নূতন করে করতে চায় প্রথমে তাকে কোথাও থেকে একটা মিসাইলকে নিয়ে আসতে হবে, তারপর ওটাকে খুলে দেখতে হবে। এটাকে বলে রিভার্স টেকনলজি। আগে পুরো জিনিসটাকে খুলে দেখবে, দিয়ে পুরো জিনিসটাকে আবার জুড়ে দেয়। বেশির ভাগই জিনিস এই রিভার্স টেকনলজি দিয়ে চলে। ঠিক তেমনি, আপনি যদি জানতে চান, ঈশ্বর সৃষ্টি কিভাবে করলেন, আপনাকেও তখন রিভার্স টেকনলজি দিয়ে যেতে হবে। মানে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে নীচে নামা যাবে না, নীচে থেকে আপনাকে আগে উপর পর্যন্ত যেতে হবে। যিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করেছেন, একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, ঈশ্বর সৃষ্টি কেন করলেন, কিভাবে করলেন। আর যতক্ষণ আপনি একটু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত না এগোন, এর উত্তরগুলোও বুঝতে পারবেন না।

আপনাকে যদি একটা মিসাইল দিয়ে দেওয়া হয়, আপনি রিভার্স টেকনলজি দিয়েও কিছু করতে পারবেন না। ওটা করার জন্য ভাল একজন ইঞ্জিনিয়ার দরকার, যিনি এটা বুঝতে পারবেন, জিনিসটা কিভাবে হয়। যাঁরা যোগী, যাঁরা এই শরীরবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাকে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁরা যখন এই ধরাতলে নেমে আসেন, তখন তাঁরা একটা ব্যাখ্যা করে দেন, যে ব্যাখ্যাটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। ওটাই শাস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তিনি এই ব্যাখ্যা করছেন, কারণ তিনি জানেন; আর আধার দেখে তিনি বুঝতে পারেন কে এই কথাগুলো বুঝতে পারবে, কে কেমনটি বুঝতে পারবে, সেই অনুসারে বলেন।

ঠাকুর এই জায়গাতে শুরু করছেন এই কথা বলে – জীবের অহংকারই মায়া। এর আলোচনা শুরু করার আগে, খুব সাধারণ দুটো কথা বলে দিই। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, বিশেষ করে হিন্দুদের যে তত্ত্ব, তাতে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আসে –পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য, প্রকৃতি যেন মন, আমাদের সহজ ভাষায় God and mind। ভগবান গীতায় বলছেন, তিনিই এই দুই হয়েছেন, চৈতন্যটাও তিনি, জড়টাও তিনি। চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ বুদ্ধিতে। প্রথম প্রথম যাঁরা শুনবেন তাঁদের কাছে এই জিনিসগুলো কঠিন মনে হবে। খুব সহজে –সেই যে সচ্চিদানন্দ, সেই যে ভগবান, তিনি নিজেকে দু-ভাগে বিভক্ত করে নেন, বা মনে হন যেন তিনি নিজেকে বিভক্ত করে নিয়েছেন। একটা হল শুদ্ধ চৈতন্য, আরেকটা হল জড় বা প্রকৃতি। আমাদের কাছে চিজ্জড়গ্রন্থি –চৈতন্য আর জড়ের মিলন।

আমাদের মন আছে, আমাদের শুদ্ধ আত্মা রয়েছে। আপনি যখন নিজেকে মনে করেন, আপনি সেই শুদ্ধ আত্মা, আপনি তখন ঈশ্বরের সঙ্গে এক। মুখে বলা না, আপনি নিজেই জেনে যাবেন। জেনে যখন বলবেন, আমিই সেই আত্মা, আপনি মুক্ত। অন্য সময় আপনি জানেন আপনি মন, আপনি তখন বন্ধনে। মুক্তি আর বন্ধন কি? খুব সহজ, আমি আত্মা, এটাই মুক্তি; আমি মন, এটাই বন্ধন।

দেহটা মনের খুব স্থূল সম্প্রসারণ, যেমন জামা, কাপড়গুলো আমাদের শরীরের সম্প্রসারণ। যদি আপনাকে বারবার মনে রাখতে হয়, বন্ধন কি, মুক্তি কি; খুব সহজেই মনে রাখা যায়। মানুষ যখন দেখে আমিই সেই আত্মা, এটাই মুক্তি। মানুষ যখন মনে করে আমি মন, এটাই বন্ধন।

মনকে ঠাকুর এখানে উপাধি বলে বোঝাচ্ছেন। উপাধি শব্দটা আমরা সবাই বুঝি, একটা জিনিস চাপিয়ে দেওয়া। একটা বস্তু রয়েছে, তাকে একটা মুকুট পরিয়ে দেওয়া হল। একজন সাহিত্যিককে আপনি একটা পুরস্কার দিলেন, ডিলিট বা জ্ঞানপীঠ দেওয়া হল, আসলে একটা উপাধি দিয়ে দেওয়া হল; তেমনি নোবেল প্রাইজ, এটাও উপাধি। মুক্ত পুরুষ আর বদ্ধ পুরুষ, এই যে এখানে বলা হল, আমি আত্মা, আমি মন; এই যে তফাৎ, তার মানে সেই যে শুদ্ধ আত্মা, সেই শুদ্ধ আত্মার উপর একটার পর একটা উপাধি চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেটাই এখন মন রূপে দেখায়, জগৎ রূপে দেখায়। আমরা এভাবে মনে করতে পারি, আগেকার দিনে যে লণ্ঠন থাকত, সেই লণ্ঠনের উপর আপনি কাঁচ লাগিয়ে দিলেন, আলো এক রকম দেখাচ্ছে। সেই কাঁচের উপর সিলোফিন দিয়ে দিলেন, আলো আর-এক রকম দেখাতে লাগল, আরেকটা সিলোফিন দিয়ে দিলেন, আর-এক রকম দেখাচ্ছে। উপাধি যেমন যেমন চাপানো হবে, অর্থাৎ সেই আলোর উপর যেমন যেমন আবরণ পালটানো হবে, আলোটাই পাল্টাতে থাকবে। যে ঘোর তম, তার উপরে প্রচুর উপাধি চাপানো আছে, আলোর উপর সিলোফিনগুলো অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে। সেইজন্য আত্মার যে আলো, তাকে জানতে পারে না, আত্মার আলোকে জানতে পারে না, আত্মার যে শক্তি সেটাকে জাগাতে পারে না, তাই জীবনে এত কষ্ট পায়।

আমি একবার নিজের সামনে একটা ঘটনা দেখেছিলাম। একজন এসে সাধুকে বলছে, ওই লোকটি আমার জীবনের সর্বনাশ করে দিল। সাধু হেসে লোকটিকে বলছেন, কেউ কারুর সর্বনাশ করতে পারে না; মানুষ নিজের সর্বনাশ নিজেই ঘটায়। স্বামীজীও এই জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন। ভাইরাস, ব্যক্টেরিয়া কার মধ্যে সংক্রমিত হয়? যার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। যার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী, তার সংক্রমিত হবে না। এই যে করোনার প্রকোপ চলছিল, যারা প্রোটেকশান নিয়ে চলত, তাদের করোনা আক্রমণ করতে পারেনি। যে প্রোটেকশান নিয়ে চলত না, যার শারীরিক প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল ছিল তাকে আক্রমণ করেছে। সর্বনাশ তো করোনা করেনি, সর্বনাশ আমরা নিজেরাই নিজেদের করেছি। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এগুলো নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই।

আমাদের জীবনে অহরহ যে অঘটনগুলি ঘটে চলেছে, চাকরি নেই, পয়সা নেই, রোগভোগ লেগে আছে, এরজন্য অন্য কেউ দায়ী না, আমরা নিজেরাই দায়ী। কারণ, উপাধিগুলো এমন চাপানো আছে, সেখান থেকে বেরোন যায় না। এখন আমরা যত দূর জানি, একজন লোক আছে, তাকে আপনি উপাধিগুলো দিয়ে দিলেন; মহামহোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর, এই উপাধিগুলো ইংরেজরা দিত, এখন সরকার বাহাদুর থেকে দেওয়া হয় পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ; যাঁরা পদ্মশ্রী পান তাঁরা নিজের নামের আগে লাগিয়ে দেন পদ্মশ্রী। উপাধি তো ভাল জিনিস, তাহলে বন্ধন কেন বলা হচ্ছে? এটাকে বন্ধন বলা হয়, কারণ যখনই উপাধি আসে তার একটা ভাড়া চায়। মলে গিয়ে আপনি যদি কোন জিনিস কিনতে চান, তার জন্য আপনাকে একটা মূল্য দিতে হবে। আর কোন জিনিস যদি আপনি ভাড়াতে নিয়ে আসেন, অনেক সময় ভাড়াতেও জিনিস আনতে হয়; অস্থায়ী ভাবে কোথাও আছে, সেখানে ভাড়াতে গ্যাস, রান্নার সরঞ্জাম বা ফার্নিশড ফ্ল্যাট পাওয়া যায়। তার জন্য আপনাকে প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে একটা মূল্য দিয়ে যেতে হবে। কিংবা আপনি একটা বাড়ি ভাড়াতে নিলে আপনাকে মাসে মাসে ভাড়া দিতে হবে। একটা একটা

করে আমরা যত উপাধি নিই, তার মূল্য আমাদের দিতে হয়, এই মূল্যটা হল অশান্তি। যত উপাধি তত অশান্তি। কারণ ওগুলোকে আমরা বাইরে থেকে নিজেরা নিয়ে এসেছি। আমরা নিয়ে এসেছি, তাই আমরা এটাকে ফেলেও দিতে পারি, ফেলে দেওয়াটা আমাদের হাতে। যেমন যেমন ফেলব তেমন তেমন শান্তি। কিন্তু নিজে এনেছি কিনা, ওটাকে তাই ছাড়া যায় না। সাধক যিনি, ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী যিনি, যিনি সাধনা করছেন, তিনি ধীরে ধীরে এই উপাধিগুলিকে উড়িয়ে দেন।

আমাদের আলোচনায় অনেক সময় প্রশ্ন আসে, আমি গৃহবধূ, আমি কি করে করব? আপনি যেমনি বললেন, আমি গৃহবধূ, আপনি একটা উপাধি নিয়ে নিলেন, আপনার তো সমস্যা থাকবেই। আপনি কেন নিজেকে গৃহবধূ রূপে দেখেছেন? মানুষ রূপে দেখুন, নিজেকে আত্মা রূপে দেখুন, তারপর সেখান থেকে ভাবতে শুরু করুন। আসলে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করতে চায় না। পড়াশোনা করা, অপরের সঙ্গে আলোচনা করা, চিন্তন করা; এই জিনিসগুলো আমরা করতে পারি না, চাইও না।

এটাই আমাদের সমস্যা। যদি আপনি ঈশ্বরীয় কথা শুনতে চান, ভিতরে যদি শক্তি আনতে চান, আপনাকে জিনিসটাকে জানতে হবে, জানা মানেই আপনাকে একটু পড়াশোন করতে হবে, পরস্পর আলোচনা করতে হবে। সবাই চায়, একটা সহজ কোন উপায় বলে দিন। সহজ উপায় কি হয়? আপনি যাঁকে প্রশ্ন করছেন, যাঁকেই করুন, আপনার দীক্ষাগুরুকে যদি এই প্রশ্ন করেন, এবার ভেবে দেখুন, উনি কি সহজ ভাবে ওই জায়গায় পৌঁছে গেলেন, যেখানে তিনি উত্তর দিতে পারবেন? না, সবাইকেই এই কঠিন পথ দিয়েই যেতে হয়। তার মানে উপাধিগুলিকে উড়িয়ে ফেলতে হয়। উপাধি যদি না উড়িয়ে দিতে পারেন, জীবনে শান্তি আসবে না, শক্তি আসবে না, সুখ আসবে না; ঈশ্বরজ্ঞান তো দূরের কথা।

ঈশ্বর আর জীবের কোথায় তফাৎ? বিশাল সমুদ্র, চারিদিকে জল আর জল আর তার মধ্যে অনেক বরফের চাঁই ভাসছে। বরফের যে চাঁই, আসলে সেও জল, কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে বরফের আকার পেয়ে গেছে। বরফ কোনটা গোল, কোনটা চৌকো, কোনটা ত্রিকোণা। ওরা যদি মনে করে, আমি দেখতে এই রকম, আমি কেমন বেশ ভেসে যাচ্ছি, আমি কেমন জলের উপরে আছি, সবাই বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ভাবছে, আসলে সবাই তো জল। যখন বরফ গলে গিয়ে জলের সাথে এক হয়ে যাবে, তখন ভাববে, আরে আমি কত বোকা ছিলাম। কিন্তু তখনও তার কিছুই পাল্টায়নি, শুধু উপাধিগুলো পাল্টেছে; কারণ স্বরূপ কখন পাল্টায় না। মানুষ, পশুপাখি যেই হোক, এদের রূপ পাল্টায় স্বরূপ পাল্টায় না। তার স্বরূপ সব সময় সেই শুদ্ধ চৈতন্য, সেই শুদ্ধ আত্মা, সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক। শুধু তার রূপ পাল্টাতে থাকে, এই রূপ পাল্টায় উপাধি থেকে। ঠাকুর এই জিনিসটাকে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছেন। ভূমিকাতে জিনিসটাকে বলে দেওয়াতে এবার বুঝতে সুবিধা হবে।

এই যে বলা হল, আমরা খুব সহজ ভাবে একটা উত্তর দিয়ে দিই। বেদান্তে এটাকে বলেন মায়া। ঠিক ঠিক এর অনুবাদ যদি করেন, তখন এর অর্থ হয়, আমার কাছে কোন উত্তর নেই। আমি জানি না কিভাবে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি অখণ্ড, তিনি কেন খণ্ডিত হয়ে দেখাচ্ছেন। যিনি আনন্দস্বরূপ তাঁর জীবনে এত দুঃখ কেন? যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁর মধ্যে অজ্ঞান কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। সেইজন্য ওনারা একটা শব্দ দিয়ে দিলেন 'মায়া', এটা ঈশ্বরীয় শক্তি। যেখানে যেখানে মায়ার প্রসঙ্গ আসবে, তখনও বিস্তারে আলোচনা করব। একদিনে একটা ক্লাশের লেকচারে তো বোঝা যায় না। হাজার হাজার বছরের যে বিদ্যা, সেই বিদ্যাকে কি একটা লেকচারে বোঝান যায়?

আমার খুব প্রিয় কাহিনী, কয়েকবার ক্লাশে বলেছি। রিচার্ড ফাইনম্যান ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। রেডিওর একটা ইন্টারভিউতে ওনাকে জিজ্ঞেস করেছে, আপনি যেটার উপর নোবেল প্রাইজ পেলেন, দু মিনিটে সেটার ব্যাপারে একটু বলবেন? উনি কিছু একটা উত্তর দিলেন। কিছু দিন পর উনি একটা ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সিওয়ালা ফাইনম্যানকে চিনতে পেরেছে। 'আপনি ফাইনম্যান, তাই না? আমি আপনার ইন্টারভিউটা শুনেছি'। ফাইনম্যান অত বড় একজন পদার্থবিদ, কিন্তু সারাটা জীবনই

উনি খুব মজার লোক ছিলেন। উনি জিজ্ঞেস করছেন, 'কেমন লাগল'? ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'আপনার উত্তর আমার ভাল লাগেনি'। 'কেন'? 'আপনার ঠিক ঠিক উত্তর হওয়া ছিল, আমার বিষয়কে যদি দু মিনিটে বলে দেওয়া যায়, তাহলে ওটা আর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্য বিবেচিত হত না'। একটা জিনিসকে যদি দু মিনিটে বলে দেওয়া যায়, তাহলে সেই জিনিসের জন্য কেন তাকে নোবেল প্রাইজ দেবে। আমার প্রথম বই টিয়া বেরোবার পর একবার খুব নামকরা একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনার টিয়া বইয়ের বিষয়বস্তুটা কি? আমি মজা করে ওনাকে বললাম, বলতে পারেন মহাভারতের বিষয়বস্তুটা কি? মহাভারতের বিষয়বস্তুটা যদি বলতে পারেন, তাহলে টিয়ার বিষয়বস্তুটাও আমি বলে দিতে পারব। যদি আপনি দু মিনিটে বলে দিতে পারেন মহাভারতের বিষয়বস্তু কি, তাহলে বুঝতে হবে মহাভারত আপনি কিছুই বোঝেননি। টিয়ার বিষয়বস্তু যদি কেউ দু মিনিটে বলে দেয়, তাহলে বুঝতে হবে তিনি টিয়া বইয়ের কিছুই বোঝেননি।

যাঁরা ধর্মতত্ত্বগুলিকে দুটো বাক্যে বুঝিয়ে দেন, ধর্মতত্ত্বকে যিনি এক ঘন্টায় বুঝিয়ে দেন, তাহলে বুঝতে হবে হয় তিনি নিজে বোঝেননি, আর তা নাহলে লোকেদের বোকা বানাচ্ছেন। একটা ধর্মতত্ত্ব, যে বিদ্যাকে হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ ধরে আছে, সেটাকে যদি দশ মিনিটে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা কিসের বিদ্যা! কেনই বা লোকেরা হাজার হাজার বছর ধরে এই বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সাধনা করে যাচ্ছে। একটু চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলো বোঝা যায়। এই তত্ত্বগুলো শুনতে যত সহজ মনে হয়, আবার ততটা সহজও না, অন্য দিকে এর মধ্যে কোন ধরণের জটিলতা নেই।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না? এবার ঠাকুর বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। এই আমিত্ব, আমি ভাব, এটাই হল মনের গুণ। মনের সবচেয়ে বড় গুণ আমিত্ব, আমি ভাব। এই আমি ভাবটা যখন আত্মার সাথে হয়ে যায়; সোহহং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, এই জ্ঞান যখন যার হয়ে গেল সে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু 'আমি' যখন শুদ্ধ মনের সঙ্গে এক হয়, তখনও কিন্তু মায়াতে থাকে। উপাধির কথা বলা হল, ঠাকুরও পরে বলবেন। যখন কেউ জেনে গেল এই উপাধির জন্য তাকে ভাড়া দিতে হয়, ট্যাক্স দিতে হয়; তখন আস্তে আস্তে এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। একদিকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, অন্য দিকে তখন একটা জিনিসকে ধরে নেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়, ধরে নেওয়ার পর উপাধিগুলোকে বাদ দেওয়া হয়, যেটা আমরা এক্ষুণি আলোচনা করব।

যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবনমুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। ঠাকুর বলছেন, যদি ঈশ্বরের কৃপায় বোধ হয়, আমি অকর্তা; কথায় কথায় ভক্তরা বলে ঠাকুরের ইচ্ছা, যে বলে ঠাকুরের ইচ্ছা, সে জীবনমুক্ত, সে একজন মহাপুরুষ, তাঁর পায়ে গিয়ে প্রণাম করতে হবে। ঠাকুর ঈশ্বরের কৃপায় বলছেন, আপনি বুঝে গেছেন আমি অকর্তা, তখন ঠিক ঠিক বলতে পারবেন ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য এক টুকরো মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না, অথচ সূর্য পৃথিবী থেকেই হাজার হাজার গুণ বড়। সেই পৃথিবীর আকাশে এক টুকরো মেঘ ভেসে এলো, সূর্যকে আড়াল করে দিল। চোখের সামনে যদি এক টাকার কয়েন রেখে দেওয়া হয়, তাহলে আর হিমালয়কে দেখা যাবে না।

সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না – মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বরলাভ হয়। গুরু বলতে সচ্চিদানন্দ গুরু, ঈশ্বরের কৃপায়

যদি অহংবুদ্ধি নাশ হয়, তাহলে ঈশ্বরলাভ হয়। গুরুকৃপা তো এমনি হয় না, এর জন্য সাধনা করতে হয়। কাহিনী আদিতে এমনি অনেক কিছু থাকে, আমার আপনার জীবনে সেরকম কিছু ঘটেনি ঘটবেও না, আমাদের খেটেই গুরুকৃপা পেতে হবে।

ঠাকুর তুলসীদাসের রামচরিতমানস থেকে একটা দৃশ্য নিয়ে আসছেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসের জন্য বনে যাচ্ছেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানস খুব উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। তিনি একা বিহার থেকে শুরু করে রাজস্থান পর্যন্ত, ওদিকে মধ্যপ্রদেশ, পুরো হিন্দি বেল্ট জুড়ে হিন্দুদের ভাষা, সংস্কৃতির সব কিছুকে একটি গ্রন্থের ছাতার তলায় এনে নিয়ন্ত্রিত করে দিলেন। হিন্দিতে যত প্রবাদ আছে সব রামচরিতমানস থেকে এসেছে। যাই হোক, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে যাচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র সামনে সামনে যাচ্ছেন, সীতা ঠিক তাঁর পিছন, সীতার পিছনে লক্ষ্মণ খুব সাবধানে যাচ্ছে যাতে পিছন থেকে কোন কিছুর আক্রমণ না আসে। রামচরিতমানসে বনের মধ্য দিয়ে তিনজনের হাঁটার এই দৃশ্যের সুন্দর বর্ণনা আছে। বাল্মীকি বর্ণনা করছেন, শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলছেন, দেখ লক্ষ্মণ! সীতা কোন দিন জঙ্গল দেখেনি; সীতার যদি কোন ফুল বা ফল নেওয়ার ইচ্ছা হয়, তুমি ওর সমস্ত ইচ্ছার পূর্ণ করে দিও। তুলসীদাসের রামচরিতমানস আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। তিনি এই জিনিসটাকে একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব সুন্দর বলছেন – *আগে রাম লক্ষ্মণ বনু পাছে। উভয়ে বিচ সিয় সোহতি কইসি। ব্রহ্ম বিচ জীব মায়া জইসি।* আমাদের কবি চাঁদকে দেখলেন যেন ঝলসানো রুটি। আর সেই ঝলসানো রুটিতে বিরহে যারা পড়ে থাকে তারা তাদের প্রেয়সীর মুখ দেখে। জীবনে যা কিছু আছে, জগতে যা কিছু আছে সব আমাদের মস্তিষ্কে। ক্ষুধার্ত মানুষ সেই চাঁদকে দেখবে ঝলসানো রুটি। প্রেমার্ত মানুষ দেখবে প্রেয়সীর মুখ। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা জঙ্গলে যাচ্ছেন, তুলসীদাস দেখছেন, রাম ও লক্ষ্মণের মাঝখানে সীতা যাচ্ছেন, যেন ব্রহ্ম ও জীবের মাঝখানে মায়া। ঠাকুর এটাই বলছেন –

আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। এই উপমাটা তুলসীদাসের রামচরিতমানস থেকে আসছে। ঠাকুরের কাছে বিভিন্ন ভাবের সাধুরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে কোন রামাইতি সাধু হয়ত এই গল্প বলে থাকবেন। **এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের দরুন তাঁকে দেখতে পারছ না**। এটাই, গামছা দিয়ে মুখ আড়াল, সেই ঈশ্বর তিনি নিজেকে ঢেকে নেন। কেন ঢাকেন, কিভাবে ঢাকেন আমরা জানি না। ঠাকুরকে অনেকবার দেখা গেছে বলতে, কিছু একটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন আমি তোমাদের সব খুলে বলে দেব, কিন্তু বলতে গিয়ে তিনি দেখছেন কে যেন তার মুখ চেপে ধরেছে, আসলে বলা যায় না, একটু পরেই এই ব্যাপারটা আসবে।

জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে। যে আত্মা মনের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রেখেছে, এটাই জীব। যেখানে মন নেই, সেখানে জীব বলা হয় না। আমার হাতে এই কলম, এই কলমও স্বরূপতঃ সেই আত্মা, কিন্তু এর মধ্যে জীব নেই। কারণ কলমের মন নেই, মন না হলে সেটা জীব হবে না।”।

সাহিত্য জগতে ইংরেজদের অনেক অবদান আছে। ইংরেজদের আরেকটা কৃতিত্ব হল, ওনারা বিশ্বের সমস্ত ভাষাতে যত সাহিত্য, দর্শন আছে, সব অনুবাদ করে গেছেন। বিভিন্ন ভাষার জিনিসগুলিকে নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করা বাংলাতেও খুব জোর প্রচলন আছে। কিন্তু ইংরেজরা অনেক বেশি। ওখানে একটা গল্প পড়েছিলাম, সংক্ষেপে একজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিল, ওদের একজনের খুব মন খারাপ থাকত। যাই হোক শেষে দুজনে বিয়ে করল। বিয়ের পর দেখা গেলে দুজনের কেউ শান্তিতে থাকতে পারছে না। দুজনে মিলে রোজ সকালে ঠিক করে, আজকে আমরা কি চরিত্রের অভিনয় করব। দুজনে জীবনে এত অভিনয় করেছে যে, সব সংলাপগুলো তাদের মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরো সন্ধ্যা,

পুরো রাত ওরা সেই চরিত্রের অভিনয় করত। ওরা নিজেরা আর নিজেদের বাস্তবে আসতে পারছে না, কারণ যেমনি ওরা নিজেদের বাস্তবে চলে আসছে, সেখান আর থাকতে পারছে না। সেইজন্য সিনেমাতে যে চরিত্রগুলিতে তারা অভিনয় করে এসেছে, এক-একদিন এক-একটি চরিত্রকে বেছে নিয়ে তারা অভিনয় চালিয়ে যায়, আর এই করে তারা তাদের বাস্তব জীবনকে চাপা দিয়ে রাখল।

বলছেন, একটা একটা করে উপাধি পড়ে আর নিজের স্বরূপ ভুলে যায়, নিজেকে ভুলে যায় আমি কে। আরও দুঃখের কথা হল, আমরা নিজেরাই নিজেদের স্বরূপ ভুলে যেতে চাই। মানুষ মদ খায় কেন? আসলে মদের নেশায় ডুবে গিয়ে নিজেকে ভুলে থাকতে চায়। একই কারণে মানুষ ড্রাগস নেয়। প্রেমে একে ছেড়ে ওর কাছে গিয়ে থাকতে শুরু করে, বলে, আমি ওকে ভুলে থাকতে চাই। আসলে তুমি ওকে ভুলে থাকতে চাইছ না, তুমি নিজেকে ভুলে থাকতে চাইছ। সাহিত্যে, গল্পে, উপন্যাসে, বাস্তব জীবনে কত কাহিনী আছে, যেখানে মানুষ নিজেকে ভুলে যেতে চাইছে। আর তার সাথে একটার পর একটা উপাধি চাপিয়ে দিচ্ছে এটা না ভেবে যে, এই চাপিয়ে দেওয়াটা তাকে আরও সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর এরপর বলছেন স্বরূপ ভুলে গিয়ে কিভাবে তাদের স্বভাবটাও পাল্টে যায়।

ঠাকুর বলছেন, **এক-একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন –যে কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি এইসব এসে জোটে**। আমাদের সাধুদের নিষেধ আছে কালাপেড়ে কাপড় পরা। **রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মতো লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাসফ্যাস করে টান দিতে থাকবে**। ছোটবেলায় কলম পেলে প্রথমেই নিজের নামটা লিখতাম; এখন নূতন পেন পেলে প্রথমে ঠাকুরের নাম বা ওঁ দিয়ে লেখা শুরু করি। এগুলো সব উপাধি, একটা একটা করে জুটছে।

টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর-একরকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না। এমনিতে বলে মানুষের স্বভাব পাল্টায় না, এবং ঠিকই যে স্বভাব পাল্টায় না; কিন্তু টাকা এমন জিনিস যে, মানুষকে একেবারে পাল্টে দেবে। ইংরাজীতে একটা নামকরা কথা আছে – A friend in power is a friend lost, বন্ধু যেমনি ক্ষমতা পেয়ে গেলে, জানবেন বন্ধু হারিয়ে গেল। এটাকে নিয়ে একজন মজা করে বানিয়েছিল, A friend married is a friend lost, বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেল, বন্ধুও হারিয়ে গেল।

ঠাকুর একজনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন – **এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল**। মানুষের হাতে যখন ক্ষমতা থাকে না, টাকা থাকে না, তখন একটু বিনয়ী থাকে। **কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল**। ঠাকুর যখন বর্ণনা করেন, আচ্ছা করে তাকে বসিয়ে দেবেন। **আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর! বলি–আছ কেমন'? তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললাম, 'ওরে হৃদু! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এইরকম কথা'। হৃদে হাসতে লাগল**। 'কি ঠাকুর! বলি – আছ কেমন', ঠাকুরের এই যে বর্ণনা, আমার যে কি মিষ্টি লাগে কি বলব! আবার আরেক জায়গায় বলবেন, 'কি ভট্টচাজ্জি মশাই–বলি আছ কেমন?'! ঠাকুর আবার একটা গল্প বলছেন।

একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতি সেই গর্ত ডিঙিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতিকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বললে, তোর এত বড় সাধ্য যে, আমায় ডিঙিয়ে যাস! টাকার এত অহংকার।

এটাকে নিয়ে ইংলিশ লিটারেচারে, ইংলিশ লিটারেচার যখন বলছি, তখন এটা ঠিক বলতে পারব না যে, ওটা ফ্রেঞ্চ বা স্প্যানিশ থেকে এসেছে কিনা, কারণ আমি ইংলিশেই পড়েছি, সেখানে অনেকগুলো কাহিনী আছে। কেউ একজন একটা প্রাচীন মহলে গেছে, সেখানে একটা তলোয়ার পড়ে আছে, তলোয়ারটাকে হাতে নিচ্ছে, ওর মনটা তখন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের দেখবেন, ওর হাতে যদি একটা খেলনা বন্দুক দিয়ে দেন, চারিদিকে দুম্ দুম্ করে গুলি চালাতে থাকবে। যখন আমরা উপাধি নিই, আমরা তখন মনে করি আমি দুঃখে আছি, এই উপাধিটা নিলে আমি সুখ পাব।

একটা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে বলছি, আপনারা হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন না। ইদানিং নূতন একটা সিস্টেম হয়েছে - EMI, Equal Monthly Instalment, লোকেরা একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকে, একটা ভাল চাকরি পেল। সে মনে করল, আমার তো এই রকম মাইনে আসতেই থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় বাড়িতে শিফট করে গেল, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিল, তারপর EMI দিতে শুরু করল। কিছু বছর আগে পর্যন্ত এটাকে বলা হত, সে কর্জা খেয়েছে, অর্থাৎ তার মাথায় ধার-দেনা আছে। EMI মানেই আপনার মাথায় ধার-দেনা চেপে যাওয়া, ক্রেডিত কার্ড মানেই ধার-দেনা। কেন তারা এটা করছে? এই ভেবে করছে যে, আমার যদি একটা বড় বাড়ি হয়, আমি সুখে থাকব। আমার গাড়ি যদি আরও দামী হয়, আমি সুখে থাকব। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে, ওইটাকে পাওয়ার জন্য তাকে টাকা খরচ করতে হচ্ছে। তাই না, তার সাথে আপনার স্বভাবটাও পাল্টে যাচ্ছে। দিল্লী আদিতে আপনার যদি বড় বাড়ি না থাকে, দামী গাড়ি যদি না থাকে আপনাকে কেউ পাত্তাই দেবে না। কলকাতা এখনও এতটা বাজে অবস্থায় যায়নি। এই যে আমরা মদ খাওয়ার কথা বললাম, লোকে মনে করে আমি দুঃখে আছি, এই দুঃখকে আমি ভুলে যেতে চাই, তাই মদ খাচ্ছে, ড্রাগস নিচ্ছে। কিন্তু জিনিসটা তা নয়, জিনিসটা তার ঠিক উলটো। উপাধি যত আসে, দুঃখ তত বেশি বাড়ে। উপাধি যত কমে সুখ তত বাড়ে।

ইংলিশে একটা খুব সুন্দর expression আছে – Burning the boats। এটা কোথা থেকে এসেছে জানা নেই। অনেকে বলে অরিজিনালি এটা গ্রীকরা শুরু করেছিল। কিন্তু পরে পরে অনেকে যাঁরা যুদ্ধের নায়ক ছিলেন, তার করতেন কি, নৌকা দিয়ে, তখনকার দিনে বড় নৌকাকে জাহাজ বলা হত, ওরা ওই নৌকা নিয়ে আক্রমণ করত। এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আছে, স্প্যানিশে আছে, গ্রীকরা তো আছেই, আর চৌদ্দশ শতাব্দীতে এই রকম একজন ছিল, জাহাজে করে আক্রমণ করতে গেছে। বেশ কিছু দিন ধরে আক্রমণ করে গেল, লড়াই চলছে, এখন লোকজন কমতে শুরু করল। মনে দোনামোনা চলতে লাগল, চল ফেরত চলে যাই, এভাবে হবে না। কমণ্ডোরা তখন সব সময় নৌকাগুলিকে পুড়িয়ে দিত। আবার বলে, burning the bridge এটা নূতন একটা term এসেছে। যেখান দিয়ে তুমি এসেছ, সেই ব্রীজটাকে পুড়িয়ে দাও, তার মানে, আপনার যে পুরনো সম্পর্কগুলো ছিল, সব কটাকে পুড়িয়ে শেষ করে দাও, সব শেষ, এবার এগিয়ে যাও। এই burning the boat, যখন সব পুড়িয়ে দিল, এখন আপনার আর কিছু করার নেই। আপনাকে এখন যুদ্ধ করে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে কেল্লার দখল নিতে হবে, আর তা নাহলে মর, দুটোর মধ্যে একটা – হয় জয়, নয় মৃত্যু; পালানোর পথ আর নেই।

উপাধিগুলির ক্ষেত্রে সেই একই জিনিস হয়, আপনাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যদি পুড়িয়ে না ফেলা হয়, মুক্তি নেই। যাঁরা সাধক, যাঁরা সন্ন্যাসী বা অন্যান্য সাধক যাঁরা, তাঁদের এটাই একটা থাকে, burning the boats, সমস্ত উপাধিকে পুড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু মন থাকা মানেই উপাধি থাকবে; মন মানেই উপাধি, উপাধি মানেই মন। এনারা সেইজন্য, আমি ঠাকুরের ভক্ত, এই উপাধিটুকু রেখে দেন, এরপর যা কিছু করবেন, ওই ভাব নিয়ে করবেন।

এর আগে যে বলা হল, একটা জিনিস নিলে তার জন্য আপনাকে একটা মূল্য চোকাতে হবে। উপাধি যখন নিলেন, সেটার জন্য আপনাকে একটা মূল্য চোকাতে হবে, মূল্যটা হল দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা। কিন্তু এই জগতে যতদিন থাকতে হবে, ততদিন মন থাকবেই, মন থাকা মানে উপাধি থাকবেই।

সেইজন্য কি করতে হয়, সত্ত্বগুণ অবলম্বন করতে হয়। সেখানেও আপনাকে একটা মূল্য দিতে হবে। যেমনি আপনি সত্ত্বগুণী হতে যাবেন, ভাল হতে যাবেন, সমাজে সবাই আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে, সমাজে সবাই আপনাকে টেনে নামাতে চেষ্টা করবে, গালাগাল দেবে, নিন্দা করবে; কিন্তু এগুলো তাও ভাল। নিজের ভিতরে যে অশান্তি, নিজের ভিতরে যে জ্বালা, তার থেকে বাইরের এগুলো অনেক ভাল। আপনি ভাল হচ্ছেন, আপনাকে চারজন নিন্দা করছে, ঠাট্টা করছে, তাও এগুলো অনেক ভাল। কিন্তু ওদের মত যদি হতে যান, তাহলে ভিতরে যে জ্বালা-যন্ত্রণা হবে, সেটা ভয়ঙ্কর, সেটাই সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বাইরে যারা নিন্দা, ঠাট্টা করছে সেটা কক্ষণ সর্বনাশের কারণ হয় না। আবার ঠাকুর কথা বলে যাচ্ছেন।

জ্ঞানলাভ হলে অহংকার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন। এই যে বলা হল, আমি মন এটাই অজ্ঞান, আমি আত্মা, এটা যখন বোধে বোধ হয়, তখন অহংটা চিরদিনের জন্য চলে যায়, সেই অহং আর ফিরে আসে না।

এই কথা বলার পর ঠাকুর সপ্তভূমির কথা আলোচনা করছেন। আমরা আগেও সপ্তভূমির উপর একটা বিরাট আলোচনা করেছি। এখানে ঠাকুর বলছেন, **মনের সচরাচর বাস কোথায়?** মানে, মন কি নিয়ে থাকে। **প্রথম তিনভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি –সেই তিনভূমি, তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে –কামিনী-কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃদর্শন হয়। সে ব্যক্তি জ্যোতিঃদর্শন করে বলে 'একি'! 'একি!'** এই জ্যোতিদর্শন কল্পনায় হয় না, বাস্তবিক জ্যোতিদর্শন হয়, এই জ্যোতিই চৈতন্যজ্যোতি। সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের যে আভা বেরিয়ে আসে, সেই আভাতে চোখ ঝলসে যায় না, স্নিগ্ধ, কিন্তু চৈতন্য। আমরা সচরাচর যত আলো দেখি এগুলো সব জড়।

এখানে একটা কথা বলতে হয়। আমাদের কাছে অনেকে এসে বলতে থাকেন, আমার এই দর্শন হয়েছে, সেই দর্শন হয়েছে, আমার মন এই স্তরে, সেই স্তরে। একটা জিনিস জানবেন, যিনি এই দর্শনগুলি দেন, সেই ঈশ্বর, তিনি চুপ থাকার ক্ষমতাটাও দিয়ে দেন। যখন আপনার দর্শনের কথা, উপলব্ধির কথা অপরকে বলতে ইচ্ছে করছে, তার মানেই আপনার কোন দর্শন হয়নি, কোন উপলব্ধি হয়নি। তাহলে ঠাকুর কেন বলছেন? ঠাকুর অবতার, তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার এখনও দেওয়া হয়নি। ঠাকুরই সাক্ষাৎ আপনাকে বলে দেবেন, তুমি শিক্ষা দাও। আর যাদের শিক্ষা দেবেন, তাদেরকেও ঠাকুর একটু ইশারা দিয়ে দেন, নাহলে সে মানবে না।

তারপর কণ্ঠ। সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছে হয়। কপালে –ভ্রূমধ্যে –মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়। এগুলো যাঁদের হয় তাঁরাই বোঝেন, আমরা থিয়োরেটিক্যালি শুধু বলি। যেমন হৃদয়ে যেমন জ্যোতিদর্শন হয়, হৃদয়ে তেমনি ইষ্টের দর্শনও হয়। বিভিন্ন পথে বিভিন্ন রকম দর্শন হয়, এটা কোন নির্দিষ্ট করা নেই, শুধু এটাই যে হবে, সে-রকম কিছু না।

এরপর কুণ্ডলীনি নিয়ে বলছেন। স্বামী যতিশ্বরানন্দজীর খুব নামকরা বই, 'Meditation and Spiritual Life', তিনি সেখানে এটাকে চেতনভূমি বলছেন, plains of consciousness। ওই অবস্থায় গেলে **সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না**। এতদিন ধরে ইষ্টের জপধ্যান করছেন কিনা, তাঁকে এখন সামনাসামনি দেখছেন, আলিঙ্গন করার ইচ্ছা হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আলিঙ্গন করতে গিয়ে পারেন না। ঠাকুর বলছেন, **লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয়, কিন্তু স্পর্শ হয় না; ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তমভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না –সমাধি হয়**। ঠিক ঠিক ঈশ্বরদর্শন এই জায়গাতে, সপ্তমভূমিতে গিয়ে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানও যা ঈশ্বরদর্শনও তাই।

তার আগে পর্যন্ত যাঁরা ঈশ্বরদর্শন করার কথা বলেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করতে হয়; আপনার কি হৃদয়ে জ্যোতিদর্শন হচ্ছে? অনাহত ধ্বণি 'ওঁ' কি সব সময় শুনতে পাচ্ছেন? তার সাথে জগৎ থেকে আপনার মন কি পুরো সরে গেছে? সংসারে যখন অশান্তি হয়, তখন সংসার থেকে, জগৎ থেকে মন সরে যায়। আমাদেরও হয়, সেন্টারে সাধুদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ হলে আমাদের ভিতর বৈরাগ্য এসে যায়, তখন বলি, 'আমি চললাম হিমালয়'। এই বৈরাগ্যের কোন দাম নেই। এতক্ষণ বিজয় শান্ত হয়ে ঠাকুরের কথা শুনছিলেন, এতক্ষণ পর বলছেন।

বিজয় – সেখানে পৌঁছিবার পর যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ – সপ্তভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না। রাজযোগে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এই দুই প্রকার সমাধির কথা বলছেন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল মনের এলাকাতে সমাধি, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি মনের এলাকার বাইরে চলে যায়। মনের এলাকার বাইরে –এটাই সপ্তমভূমি। এই যে প্রথম থেকে আমরা মন মন বলে যাচ্ছি, যেখানে বলা হয়েছিল আমি মন এই বোধ যতক্ষণ খসে না পড়ে যায়, ততক্ষণ কিন্তু সপ্তভূমিতে যেতে পারে না, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় না। জ্ঞান বলতে আমরা যেটা বুঝি, এটা মন নেয়। কথা যখন বলা হয় তখন মন মুখকে কথা বলতে বলে। সপ্তভূমিতে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে মনই নেই। কোন ঘটনা হলে আমরা বলি, এই ঘটনার কেউ সাক্ষী আছে? অনেক সময় সাক্ষী থাকে না। মন হল সেই সাক্ষী, মন যেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে। মন যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ঠিক ঠিক ঈশ্বরদর্শন হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তার মানে যে সমধির শেষ অবস্থার কথা বলতে পারে সে পৌঁছাতে পারে না; যে শেষ অবস্থায় পৌঁছাতে পারে, সে বলতে পারে না। এগুলো খুব উচ্চস্তরের উচ্চ কথা, পর পর এখন এই কথাই চলবে। এগুলো শুনতে হয়, শুনে যেতে হয়, কিন্তু সবটাই যে ধারণা করে নিতে পারবেন, তা না। কিন্তু শুনতে হবে, শুনতে শুনতে মনে একটা সংস্কার তৈরী হবে, সেখান থেকে ভাব তৈরী হবে। ঠাকুর পুরো ব্যাপারটাকে এবার উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন।

জাহাজ একবার কালাপানিতে গেলে আর ফিরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না। ঠাকুর খবর বলতে না, বলতে 'খপর'। আগেকার দিনে আন্দামানের ওদিকের সমুদ্রকে কালাপানি বলা হত। মানে, এমন দূরে চলে গেল যে, কোন খবর আসবে না। জাহাজেরও খবর নেই, আর জাহাজ যে খবর দেবে সমুদ্রে কি হয়েছিল, সেই সম্ভবনাটাও নেই। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বললেন। আবার আরেকটু সহজ উদাহরণ দিয়ে বলছেন।

নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছিল। কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে। সমুদ্র কত গভীর কে খপর দিবেক? যে দিবে, সে মিশে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। কিছুটা এই রকমের একটা খুব সুন্দর গল্প পড়েছিলাম। একবার ইউরোপের কোথাও কিছু লোক খনির কিছু কাজ করছিল। খনন করতে করতে ওরা একটা মার্বেলের মূর্তি পেল, খুব সুন্দর মার্বেলের মূর্তি। খননকারীরা মনে করল অনেক প্রাচীন কোন সামগ্রী, প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য সাংঘাতিক। ওরা দেখল এটার জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড পেয়ে যেতে পারি। সবাই তখন ট্রাকে মূর্তিটাকে ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পথে বৃষ্টি শুরু হল। বর্ডারে সেই ট্রাককে রক্ষীরা আটকেছে। ওখানে প্রাচীন জিনিস নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু এরা ঠিক করেছে, এটাকে ওরা নিয়ে যাবেই। আর যদি বেশি ঝামেলা করে, গুলি চালিয়ে রক্ষীদের মেরে দেবে। ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। রক্ষীরা এলো, বলল, ট্রাকের পিছনটা খোল। পিছনটা তোলা হল। রক্ষীরা জানিয়ে দিল, ঠিক আছে, এগিয়ে যাও। ওরা অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগল, কি ব্যাপার, কি করে আমাদের ছেড়ে দিল? যাই হোক বর্ডার পেরিয়ে ওরা নেমে ট্রাকের পিছনটা তুলে দেখে কোথাও কিছু নেই। সবাই অবাক, মূর্তিটা গেল কোথায়? যেখানে ঢাকা দিয়ে খুব সামলে রাখা ছিল, দেখে ওর নীচে কি সাদা সাদা জমে আছে। তখন ওরা বুঝতে

পারল, কেউ মজা করে পুরো চক দিয়ে ওই মূর্তিটা তৈরী করেছিল। ওরা ভেবেছিল ওটা মার্বেল স্ট্যাচু, কিন্তু পুরো জিনিসটা ছিল চকের, বৃষ্টিতে চক পুরো গলে গেছে।

আমাদের এই আলোচনার বিষয়গুলি অনেকের কাছে কঠিন মনে হতে পারে। অনেকের মনে হতে পারে যে কি দরকার এত আলোচনার। ব্রহ্মচারী অবস্থায়, এমনকি সন্ন্যাস হওয়ার পরেও প্রথমাবস্থায় আমরা প্রায়ই বড়দের কাছে একটা শব্দ শুনতাম; যাঁরা বেশি শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্যে ছিলেন না, তাঁরাই এই শব্দটা বেশি ব্যবহার করতেন; শব্দটা ছিল –বেদান্তের কচকচানি। এই জায়গাতে বেদান্তের আলোচনা চলছে। কচকচানি মনে হলেও হতে পারে, অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই। আসল কথাটা কি জানেন তো; আমরা যতটুকু জানি ততটুকুই আমরা শুনতে চাই। যার জন্য ছোটবেলায় পড়াশোনা ভাল লাগত না; কারণ নূতন জিনিস শেখার আগ্রহ খুব কম লোকের থাকে। আমরা যে আলোচনাগুলি বুঝতে পারি না, মস্তিষ্ক নিতে পারে না, সেখানে দেখবেন আলোচনা শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। বিদ্যুতের ফিউজ যেমন উড়ে যায়, ব্রেনেরও ফিউজ উড়ে যায় বলে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। মানুষ যতটুকু জানে অতটুকুর মধ্যেই ঘুরঘুর করতে চাইবে, অজানা কিছু এলে ব্রেন নিতে পারে না বলে মন ঘুমিয়ে পড়ে। সেইজন্য দেখবেন, লাইট মিউজিক, লাড়েলাপ্পা সিনেমার গান হলে লোকেরা একেবারে টানটান হয়ে থাকে, ক্ল্যাশিকাল মিউজিক কজন আর বুঝতে পারেন। আমাদের এখনকার আলোচনাগুলো একটু কঠিন ঠিকই, কিন্তু জানতে হয়। কষ্ট করে শুনে গেলে কি হয়, ব্রেনে যে সেলগুলো আছে, ওদের সংযোগগুলি বাড়ে, তাতে ব্রেন আরও সক্রিয় হয়। গীতাতে ভগবান তাই বলছেন – *ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে*, জ্ঞানের মত পবিত্র জিনিস আর নেই, গীতাতে জ্ঞান বলতে আত্মজ্ঞান বলছেন। কিন্তু সব রূপে জ্ঞানের মত পবিত্র জিনিস আর হয় না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণরা এগিয়ে ছিলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে জ্ঞান ছিল। আজকে আমেরিকা, ইউরোপ এগিয়ে যাচ্ছে, কারণ তাদের কাছে জ্ঞান আছে। বসে বসে ব্রাহ্মণদের গালাগাল দিয়ে তো কোন লাভ নেই, এটা বাস্তব।

ঠাকুর অহংকার, অহং, অহং ভাব এগুলোর বর্ণনা করছেন। সব সমস্যা 'আমি'কে নিয়ে। পরে ঠাকুর বলবেন, এই 'আমি' তো যাওয়ার না, কিন্তু 'আমি ভক্ত' এই ভাব যদি নেওয়া হয় তখন 'আমি' ভাবকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। ধ্যানের গভীরে আচার্যরা যখন যান, একটা সীমা যখন পেরিয়ে যান, তখন তাঁরা বোধে বোধ করেন। এই যে বোধে বোধ করেন, বলা হচ্ছে, এটাকে ঠিক জ্ঞান বলা যায় না। জ্ঞান মানে, যেখানে মন বুদ্ধি কাজ করছে। আত্মজ্ঞানে মন বুদ্ধি কাজ করে না। সেইজন্য এই অর্থে আত্মজ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না, তাই বলা হয়, বোধে বোধ করে। এটা ঠিকই যে আমরা কোন একটা জিনিসকে আস্বাদ করার পরে, আস্বাদ জিনিসটাকে অপরকে বলে বোঝান যায় না, কিন্তু আস্বাদের ক্ষেত্রেও ব্রেন কাজ করছে। আত্মজ্ঞান যখন হয়, আমাদের এই মন যেন ওখানে গিয়ে মিশে যায়। সেখানে একটাই যে বোধ হয় তা হল –এটা অনন্ত, এটা আনন্দস্বরূপ, এটাই চৈতন্য। চৈতন্য, তাই ওই অবস্থাটা জড়ের অবস্থা কখনই হতে পারে না। ওখানে কোন প্রকার আনন্দের অভাব হয় না, আর অনন্ত। চৈতন্য, আনন্দ আর অনন্ত – এই তিনটেরই ধারণা কিন্তু আমরা করতে পারব না। যেহেতু আমরা মনের জগতে বাস করি, তাই আনন্দকে আমরা সুখ মনে করি, আমরা জ্ঞান বলতে বস্তুর জ্ঞান মনে করি আর অনন্ত বলতে আমরা সমুদ্র মনে করি। তিনটের মধ্যে কোনটাই এখানে প্রযোজ্য হবে না। আপনাদের হয়ত মনে হবে, এই যে আমি বলছি, আমিই বা কি করে বলছি। কারণ আমার তো বোধ নেই, সত্যিই আমার বোধ নেই। কিন্তু শাস্ত্র পড়ে পড়ে, আচার্যের সঙ্গ করে করে, আর অনেক মহারাজদের কাছে শুনে শুনে একটা ধারণা হয়েছে যে জিনিসটা এই রকম। শাস্ত্রও এই কথা বলেন, শাস্ত্র চর্চা করতে করতে একটা ধারণা হয়, সেই ধারণাটাই পরবর্তি সময়ে অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেইজন্য এই আলোচনাগুলো শোনা খুব দরকার।

সেই অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, শাস্ত্র যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, বা আত্মা বলা হয়, কি শুদ্ধ চৈতন্য বলা হয়; কি শব্দটা নেবেন সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু ভাব সেই একই। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি হলেন

অনন্ত। তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া অন্য কিছু নেই, অনন্ত মানেও তাই –অন্য কিছু থাকতে পারে না। আর অনন্ত মানে তিনি অনন্ত সৃষ্টি করতে পারেন। অনন্ত মানে সেই অনন্ত সৃষ্টি সেই অনন্ত থেকে আলাদা দেখাবেই, আসলে থাকবে না। অনন্ত জিনিসট খুব জটিল। গণিত শাস্ত্রে অনন্তের উপর খুব সুন্দর সুন্দর বই আছে, পড়লে মজা লাগবে। কিন্তু বাস্তবিক অনন্ত যেটা, আধ্যাত্মিক অনন্ত যেটা, পুরো জিনিসটাই আলাদা। এখন যে কোন কারণেই হোক, এই যে অনন্ত, এই অনন্তকে খণ্ডিত হয়ে দেখাচ্ছে। কিন্তু অনন্ত কক্ষণ খণ্ডিত হতে পারে না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও ভগবান ঠিক এই জিনিসটা অর্জুনকে বলছেন – আত্মাকে কে মারতে পারে, কি করে মারতে পারে, কারণ আত্মা অনন্ত, অনন্তকে কখন খণ্ডিত করা যায় না, আগুন তাঁকে পোড়াতে পারবে না, জল তাঁকে সিক্ত করতে পারবে না, ইত্যাদি। অথচ আমি জানি আমি সীমিত, আমি জানি আপনার থেকে আমি আলাদা, আমি জানি আমি জগৎ থেকে আলাদা। কিন্তু শাস্ত্র বলছে, একটি শাস্ত্র না, আমাদের সব শাস্ত্র বলছেন, ঠাকুর বলছেন, স্বামীজী বলছেন, আমাদের যত ঋষীরা ছিলেন তাঁরা বলে গেছেন –আসল সত্তা অনন্ত, আর তুমিই সেই, *তত্ত্বমসি*। তাহলে আমরা কেন এই রকম দেখাচ্ছি?

এটাকেই ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, পুকুর আছে, পুকুরের জলে একটা লাঠি ফেলে দিলেন। আমরাও দেখেছি মাছ ধরার জন্য বা পুকুরের পানা সরাবার জন্য একটা বাঁশ পুকুরের জলের উপর রেখে দেওয়া হয়, তখন জল দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। আসলে কি জল দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে? হয়নি, অথচ দু-ভাগে বিভক্ত দেখাচ্ছে। গীতায় ভগবান বলছেন, *অবিভক্তং বিভক্তেষু*, দেখাচ্ছে বিভাজন হয়ে রয়েছে, অথচ বিভাজন নেই। এই লাঠিটা হল আমি, অর্থাৎ মন। কেন হয়, কোথা থেকে হয়, কারুর কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই। আমাদের হিন্দু দর্শনগুলো নিজেদের মত একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিন্তু সেটাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে এমন ঝগড়া-বিবাদ যে, কোন একটাকে মেনে নেওয়া খুব কঠিন। সেইজন্য বেদান্ত দর্শন যেন সত্যের অনেক কাছে, অন্যান্য দর্শনের তুলনায় বেদান্ত খুব বেশি লজিক্যাল।

কিন্তু বেদান্তেরও যে সমস্যা নেই তা না, তার নিজেরও অনেক সমস্যা আছে। এই যে ঠাকুর লাঠির উপমা দিচ্ছেন, এটা তো বাস্তবিক লাঠি না, এটা আসলে মন। আর মনের সবচেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল যে, মনটাই আমি। আমরা যেমন জানি আত্মা চিরন্তন, আত্মা অনন্ত আর মন হল সীমিত, কিন্তু সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল –মন চিরপরিবর্তনশীল। আমরা যেমন বলি, আমার মন আজ ঠিক নেই, আজ মন ভাল, আজ মন ভাল নেই; মন সব সময় পাল্টাচ্ছে, মন কখন স্থির থাকতে পারে না। মন যদি পরিবর্তনশীল থাকে, ওর যে স্বভাব, সেই স্বভাবকে আমি যদি কাজে লাগিয়ে নিই, এই কাজে লাগানোটাও মন দিয়েই হবে। মন এক আশ্চর্যজনক জিনিস; মন সব সময় সব রকম তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে, তথ্যগুলিকে গুছিয়ে রাখতে পারে, তেমনি এই তথ্যগুলিকে কাজে লাগাতে পারে। এক মন বহু কাজে লাগে। আর মনকে দিয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শাস্ত্রসঙ্গ করা, সাধুসঙ্গ করা, এগুলো যেন ডাঙ্গস। হাতি পরের কলাগাছে শুড় বাড়ালে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাহুত ডাঙ্গস দিয়ে মাথায় মারে। এই মন হাতির মত, এই মনই আবার ডাঙ্গসের মত হয়ে যায়। এই যে মন পরিবর্তনশীল, এটাকেই ঠাকুর কিভাবে কাজে লাগানো যায় শেখাচ্ছেন, মোদ্দা কথা মনটাকে কিভাবে কাজে লাগাবে।

আমি অর্থাৎ আমার মনের এখন ভাব হল –আমি সমর্পণানন্দ, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমি এই সংসারের লোক। মনের এই ভাবটাকে যদি ধীরে ধীরে পালটে এই ভাব নিয়ে আসি –আমি ঠাকুরের সন্তান, ঠাকুর অনন্ত, আমি অনন্তের সন্তান, অনন্তের যে সন্তান সেও অনন্ত; আর এটাকে যদি কাজে লাগিয়ে দিই, কারণ মন পরিবর্তনশীল, এটাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়। পাহাড়ে একটা বড় পাথর নড়বড় করছে, আপনি যদি একটু ওটাকে ঠেলে দেন, পাথরটা ডানদিক বামদিক চলে যাবে। পাথরটা এমনিই নীচে গড়িয়ে যাচ্ছে, এটা এমন না যে উপরে উঠে যাবে, শুধু একটু হাত লাগিয়ে দেওয়া। মনেও ঠিক এইরকম একটু শুধু হাত লাগিয়ে দিতে হয়। ঠাকুর এখানে লাঠির কথা বলছেন, লাঠিটা পরিষ্কার এপার ওপার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আবার জলের উপর রেখা টেনে দেওয়া যেতে পারে।

আমরা গঙ্গার পাড়ে থাকি বলে দেখতে পাই, কোন স্পীড বোট গেলে তখন জলটাকে মাঝখান দিয়ে চিরে চলে যায় আর প্রচুর ফেনা হয়ে যায়, তখন আবার এপার ওপার মনে হয়। ওই রেখাটা কিছু সময়ের জন্য উঠল আবার মিলিয়ে যায়।

আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, এই ভাবটা যদি নিয়ে আসা যায়, তখন ওটা আর ওই লাঠির মত থাকে না। দাগ একটা থাকে ঠিকই, দুটো ভাগ ঠিকই –একটা হল শুদ্ধ ব্রহ্ম, আরেকটা জীব; যেটা অশুদ্ধ, মলিন সত্য। মলিন সত্য মানে, যেটা মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিভাজনটা থাকবে, এই বিভাজন যদি না থাকে তাহলে সংসার থাকবে না। সংসার মানেই বিভাজন, এখানে কারুর কিছু করার নেই। শুধু এটা আমরা করতে পারি, বাঁশ বা লাঠি যেটা আছে, ওটা একটা বরফের করে দেওয়া যেতে পারে। বরফ এই আছে, এই গলে গেল। কিংবা আরও বেশি, ঠাকুর যেটা বলছেন, টেনে যদি রেখা করে দেওয়া হয়, মনে হবে যেন জল দুটো ভাগে বিভক্ত, আসলে তা নয়।

সেখান থেকে ঠাকুর আবার জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের আলোচনা করবেন, সেটা আমরা পরে আলোচনা করব। তার আগে দুটো ছোট্ট গল্প মনে পড়ল। এই দুটো গল্প দিয়ে আমরা পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারব। জীবাত্মা আর শুদ্ধ ব্রহ্ম, মাঝখানে একটা বিভাজন রেখা। এই বিভাজন রেখা কতটা সত্য আর কতটা অস্থায়ী। একজন লোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়াতে তার সব সময় মনে হচ্ছে, সে যেন একটা ইঁদুর হয়ে গেছে। বেড়াল দেখলেই সে ভয় পায়। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তার তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে বলছেন, তুমি তো মানুষ। সেও বুঝে গেছে, আমি ইঁদুর না। ডাক্তারের ভিজিট দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, খুব খুশী। যেমনি সেখান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, দেখছে উল্টোদিক থেকে একটা বিড়াল আসছে। বিড়াল দেখেই লোকটি আবার সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে গেছে। সঙ্গে যে ছিল, সে বলল, 'এই তো তুমি ডাক্তারকে বললে, আমি ইঁদুর না, তাহলে এটা তুমি কি করছ'? 'আরে আমি তো জেনে গেছি আমি ইঁদুর না, কিন্তু বিড়াল তো জানে না যে, আমি ইঁদুর না, সেইজন্য আমি লুকিয়ে গেলাম'। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়। আপনি যত মনে করুন, আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ভক্ত; কিন্তু যেমনি জগতের সামনে আসছি তখন মনে করছি, আমি তো ভক্ত, কিন্তু সে তো জানে না, সেখান থেকে আবার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। এই আমিত্বটা কিছুতেই যেতে চায় না।

অন্য একটা গল্প আছে। এক মাতাল ছিল, সে চারিদিকে সাপ দেখে। সাপের জন্য সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত। একদিন একজন মাতালটাকে বলল, 'এক কাজ কর, তুমি সঙ্গে একটা খাঁচা রাখ আর ওর মধ্যে একটা নেউলকে নিয়ে যাও। নেউল দেখলে সাপ পালিয়ে যাবে'। এটা শোনার পর থেকে সে যেখানেই যায় সঙ্গে একটা ফাঁকা খাঁচা নিয়ে ঘুরতে থাকে। একদিন রাস্তায় ওকে একজন জিজ্ঞেস করছে, 'আরে ভাই, সব সময় এই ফাঁকা খাঁচা সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাও'? লোকটি বলছে, 'খাঁচা তো ফাঁকা না, ওর মধ্যে নেউল আছে, নেউল দেখে সাপগুলো পালিয়ে যায়'। বলছে, 'কোথায় নেউল তো নেই, এটা তো একটা ফাঁকা খাঁচা, তোমার নেউলটা তো কল্পনা'। লোকটি তখন বলছে – 'আমার সাপগুলোও তো কল্পনা। সেইজন্য আমার কোন সমস্যা নেই'। কাল্পনিক সর্পের জন্য কাল্পনিক নেউল এনে সেই সর্পকে ভয় দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে দুটো এ্যপ্রোচ, যেখানে একটাতে আপনি ফেঁসে যাচ্ছেন, আমিত্ব যেখানে সত্য রূপে থেকে যাচ্ছে। আরেকটাতে আমিত্বটা কৃত্রিম, অস্থায়ী। এই দুটি গল্প, খুব সাধারণ গল্প। ঠাকুরের কথাগুলো এমনিতে অত্যন্ত সহজ সরল, তবে যাঁরা প্রথম শুনবেন, তাঁদের জন্য একটু কঠিন হবে। যদি এই দুটো গল্পকে মনে রাখেন, তাহলে এই জিনিসটা বোঝা তত কঠিন হবে না।

ঠাকুর 'ভক্তের আমি', 'ঈশ্বরের দাস', এই কথাগুলিকে যে বারবার বলছেন, কারণ ঠাকুর জানতেন মানুষ আমি দেহ নই, আমি মন নই এই ভাব নিয়ে এগোতে পারবে না। এর মধ্যে সমস্যা কি

হয়, আগেকার দিনে খুব বেশি বলা হত না আর এখনকার দিনে তো কথায় কথায় বেদান্তের কথা বলা হয়। তার মধ্যে বিখ্যাত হল –এই যে ‘আমি’র কথা বলছি, এই ‘আমি’ কে? এখানে যদি আপনি বলেন, আমি দেহ না, আমি মন না; মুখে তো বলে দিলেন, কিন্তু ব্যবহারকালে আপনি কি সেই রকম ব্যবহার করতে পারছেন? ঠাকুরই বলছেন, হাত কেটে গেছে, দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে, বলছে, কই আমার তো হাত কাটে নাই। ঠিক আছে মানলাম, কিন্তু যে ব্যাথা হবে, যে ব্যাথা আপনাকে পাগল করে দেবে, সেটাকে কি আপনি সহ্য করতে পারবেন?

আমাদের হরিদ্বার আশ্রমে একটা সত্যিকারের ঘটনা আছে। ও-দিকে সবাই বড় বড় বেদান্তী, কথায় কথায় সবাই বেদান্তবাক্যের খই ফোটাতে থাকেন। একবার ওখানকার একজন সাধুবাবার অপারেশন করতে হবে। অপারেশানর আগে ক্লোরোফরম্ দিয়ে এ্যনাস্থেসিয়া করা হবে। সাধুবাবাটি বলছেন, ‘ওসব ছোড়িয়ে, ম্যায় শরীর নহি হুঁ, ম্যায় আত্মা হুঁ’। ‘ঠিকা আছে তাই হবে’, বলে ডাক্তারবাবু ছুরি চালিয়ে দিয়েছেন। সাধুবাবা ব্যাথা সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠেছেন, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছেন, ‘আরে ওতো গীতা মে হ্যায়’। হয়ে গেল, তাঁর বেদান্ত বেরিয়ে গেছে।

ঠাকুর এখানে ‘আমি ঈশ্বরের সন্তান’, ‘আমি তাঁর দাস’ ইত্যাদি যে ভাবকে নিয়ে বলছেন, এই ভাব আমার আপনার জন্য। এটা সেই ভাব, যে ভাব আপনি নিতে পারবেন, যেটা আপনি চব্বিশ ঘন্টা পালন করতে পারবেন। আমরা প্রথমে যেখানে শুরু করেছিলাম; মন চিরপরিবর্তনশীল, যেমনটি আপনি চান, তেমনটি আপনি একে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। একটা লোহার রডের মত যদি করে দেন, তাও হবে; আর একটা বরফের চাঁই করে দেন, তাও হবে। আমি শুদ্ধ আত্মা, এই ভাব নিয়েও এগোতে পারেন। আর আমি ভক্ত এই ভাব নিয়েও এগোতে পারেন। বর্তমান কালে বেদান্তের উপর অনেক পপুলার কথা, পপুলার অনুশীলনের কথা বলা হয়ে থাকে। প্রথম কথা হল, এই কথাগুলো কোন ঋষিদের না। একটু ওখান থেকে নিয়ে, একটু সেখান থেকে নিয়ে একটা নূতন দর্শন বানিয়ে দিচ্ছে; এভাবে হয় না।

কিছু বছর আগে একটা খুব পপুলার মত নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি আবার লোকদের সেটা শেখান। বেলুড় মঠের কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি কথা বলতে চাইছিলেন, বেলুড় মঠ আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যেমনি আমি তাঁর সাথে যুক্তি-তর্ক করতে যাচ্ছি, বোঝানর চেষ্টা করছি যে, ‘আপনি যে কথাগুলো বলছেন, আপনার কথার আধারটা কি’? বললেন, ‘আমাদের এই মত ভগবান বুদ্ধের মত থেকে এসেছে’। আমি বললাম ‘আমাদের মতও ভগবান বুদ্ধের আগের ঋষিদের কাছ থেকে আসছে। এবার আসুন মারামারি করে ফয়সালা করে নিই, কে বেশি ঠিক’। উনি বুঝতেও পারলেন না, আমি কি বলতে চাইছি। কথা যদি বলতে চান, তাহলে কমন প্ল্যাটফরমে নামুন; এরা কমন প্ল্যাটফরমে নামবে না। ‘আমার মত ঠিক’। আমার মত ঠিক কেন? কারণ আমি যাঁকে মানি, তিনি এটা বলেছেন। এভাবে যুক্তি হয় না।

এখানে ঠাকুর খুব সাধারণ কথা বলছেন, মন চিরপরিবর্তনশীল, এটা আমরা সবাই জানি। এ্যপ্রোচ এখানে দুটো –জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গ বলে আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি মন নই, আমি দেহ নই, আমি ইন্দ্রিয় নই। খুব ভাল কথা। ‘আচ্ছা, খিদে পেলে আপনি কি খাওয়া-দাওয়া করেন? আপনার কি খিদে পায়? যদি খিদে পায়, খিদে পেলে যদি আপন খান, তাহলে কি করে আপনি বলছেন, আমি শুদ্ধ আত্মা। এদিকে অদ্বৈত জ্ঞান শিখিয়ে যাচ্ছেন, বড় বড় কথা বলছেন’। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলবেন, একদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা। সংসারে আসক্ত হয়ে পড়ে আছে, সংসারে সমস্ত সমস্যা, ঝামেলাতে জর্জরিত হয়ে আছে, অন্য দিকে বেদান্তের বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে। এটা যে ভাবের ঘরে চুরি, তাও না, কিছুই না, ফাক্কা আওয়াজ। এরপর ঠাকুর খুব সুন্দর কথা বলছেন।

যে ‘আমি’তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই ‘আমি’ খারাপ। মন মানেই আমি, আমিত্ব যদি না থাকে তাহলে মন আসবে না। রাজযোগে সৃষ্টির যে প্রকরণ, তাতে প্রথমেই আসে

প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ আর মহৎ থেকে অহঙ্কার। প্রকৃতি হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির যে শক্তি। মহৎ হল কসমিক মাইণ্ড, বিশ্বমন। মহতের প্রথম যে জিনিসটা হয় –অহং অস্মি। এই অহং অস্মি, এটাই অহংকার, এখান থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়। আমিত্ব বোধ যদি না থাকে সংসার চলবে না। শিশুর জন্ম থেকেই আমরা তাকে এই আইডিয়াটা দিতে থাকি, তুমি, তুমি, তুমি; তবেই এই সংসার চলে। এই বোধ যদি না থাকে, তবে এই আহার, নিদ্রা, মৈথুন এই তিনটের মধ্যে ঘুরে সময় কাটিয়ে চলে যাবে। তাতেও সংসার চলবে, কারণ আমার খিদে পেয়েছে, এই বোধটা তো তার থাকবে।

ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন শব্দটা বলতেন সংসারের অর্থে। এই দুটোই প্রাইমারি ফোর্স, একদিকে আছেন সিগম্যান ফ্রয়েড, আরেকদিকে আছেন কার্ল মার্ক্স। ফ্রয়েডের কাছে সবটাই হল সেক্স, মার্ক্সের কাছে সবটাই হল ধন-সম্পদ। ওই দুটোর মধ্যে ঘুরঘুর করছে।

জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই 'আমি' মাঝখানে আছে বলে। জীবকে বলা হয় জীবাত্মা, যে আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত তাকে জীবাত্মা বলা হয়। যে আত্মা কারুর সাথে যুক্ত হয়ে নেই, সেটাই শুদ্ধ আত্মা। শুদ্ধ আত্মা অশুদ্ধ আত্মা হয় না, শুদ্ধ আত্মা আর মনের সঙ্গে আসক্ত আত্মা। বলছেন, জীবাত্মাটাই তো আত্মা, *জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ*, জীব আর ব্রহ্মের কোন তফাৎ নেই, তফাৎ হল শুধু 'আমি'টুকু এসে যায় বলে।

জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে দুটো ভাগ দেখায়। বস্তুত, এক জল; লাঠিটার দরুণ দুটো দেখাচ্ছে। যেটা আগে বলা হল। আমি কেন ঠাকুরের দর্শন পাইনা? আমি কেন জীবনে এগোতে পারছি না? কারণ ওই 'আমি' রূপ লাঠি আমাকে বিভাজন করে রেখেছে আমার পূর্ণ শক্তি থেকে, আমার পূর্ণ চৈতন্য থেকে। সমস্ত শক্তি, সমস্ত চৈতন্য আমার ভিতরেই আছে। কিন্তু আমিত্বের লাঠিটা বাঁধের মত আলাদা করে রেখেছে, বাঁধের জন্য এইদিককার জল ওইদিকে যেতে পারছে না। ঠাকুর লাঠির উপমা দিচ্ছেন এই জন্য, আসলে তো কোন তফাৎ নেই। এই আমিটা কিন্তু তা নয়। ঠিক ঠিক বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, এই আমিটা হল, একটা লাঠির মত উপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আসলে কোন বিভাজন নেই।

অহংই এই লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে। মন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম থাকে, বিভিন্ন রকম ব্যবহার করে। আপনার প্রিয়জন কেউ যদি কিছু দুষ্টুমি করে, তখন বলবেন, 'ও কিছু না, ও-রকম হয়ে থাকে'। যাকে পছন্দ করেন না, যদি একই রকম দুষ্টুমি করে, তখন বলবেন, 'ওকে আমার জানা আছে, ও এই রকমই'। আমাদের প্রতিক্রিয়া পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। এই প্রতিক্রিয়া ছাড়াকে নিয়ে ঋষিরা তিনটে গুণের কথা বললেন – সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ। তমোগুণে মানুষ হিংসাতে ভরে যায়, অন্যের ক্ষতি করব, এই ভাব আসে। রজোগুণে ক্রোধ বেড়ে যায়। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে বলে রজোগুণের পায়ে যদি আপনি পড়ে যান, রজোগুণ ক্ষমা করে দেবে। তমোগুণী কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করবে না –আমার কাছে কোন ক্ষমা-টমা নেই। সত্ত্বগুণী বলবে, 'ঠিক আছে, মানুষ এ-রকমই করে থাকে'। আপনি যদি তাঁকে 'সরি' বলেন, বলবে, ও কোন ব্যাপার না, ঠিক আছে। ঠাকুর এবার এটাকে নিয়েই বলছেন।

বজ্জাৎ 'আমি' কে? যে 'আমি' বলে, 'আমায়' জানে না? আমার এত টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরি করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিসে দেয় ও ম্যাদ খাটায়, 'বজ্জাৎ আমি' বলে, জানে না–আমার দশ টাকা নিয়েছে! এত বড় আস্পর্ধা! এই সমস্যা আমাদের সবারই মধ্যে কম বেশি থাকে। আমাদের দেশে এত তমোগুণী, দেশে তাই এত হিংসাবৃত্তি। এক-একটা মামলা হয়, লোকেরা চেঁচাতে শুরু করে বিচার চাই বলে। কি বিচার? অমুককে মেরে ফেলতে হবে। এর বিরুদ্ধে ভয়ে আমরা কিছু

লেখালেখি করতে পারি না, বলতে পারি না। এগুলো তমোগুণের লক্ষণ, প্রতিহিংসার ভাব। এবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ওই কথাটা বলবেন, যেটা আগে আমরা জ্ঞানের কথা প্রসঙ্গে বললাম।

বিজয় – যদি অহং না গেলে সংসারে আসক্তি যাবে না, সমাধি হবে না, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল, যাতে সমাধি হয়। আর ভক্তিযোগে যদি অহং থাকে তবে জ্ঞানযোগই ভাল। জ্ঞানযোগে বিচার করে। কি বিচার? আমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, এর বাইরে আমি কোন ভাবকে থাকতে দেব না। আপনি যখন ভাবছেন, 'আমি সেই আত্মা', তখনও কিন্তু আপনি ভক্ত। একজন ভক্ত যে ভাবে বলে 'আমি ভক্ত', জ্ঞানপথেও ভাবটা কিন্তু সেটাই থেকে যাচ্ছে। ওখানেও সেই আমির পরিবর্তন। ঠিক ঠিক যদি কেউ জ্ঞানপথ অবলম্বন করে, বিজয়কৃষ্ণ এখানে যেটা সাজেস্ট করছেন, ওটাতে কিন্তু আপনি নিজেকে যেটা ভাবছেন, আমি আত্মা, সেটাকে কিন্তু আপনাকে কার্যেও নামাতে হবে, যা কিনা প্রায় অসম্ভব। সব ঠিকঠাক চলছে, তখন মাঝে মাঝে ভাবছেন, আমি সেই আত্মা, কিন্তু সব সময় ধরে রাখা যায় না। সেইজন্য ঠাকুর এখানে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – দুই-একটি লোকের সমাধি হয়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। এই যে দুটো গল্প বললাম, লোকটি ডাক্তারের অনেক করে বোঝানর পর মনে করছে আমি ইঁদুর না, কিন্তু ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে যেমনি বিড়াল দেখেছে সঙ্গে সঙ্গে আমি ইঁদুর এই ভাবটা চলে এসেছে। আমাদের 'আমি' ভাব কিছুতেই যায় না, আমিত্ব থাকবেই। কারণ 'আমি' যদি না থাকে, তাহলে তো সে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গেল, সে তো মুক্ত। সেটাই ঠাকুর এখানে বলছেন –**হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখ ফেঁকড়ি বেরিয়েছে। একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে**। ঠাকুর গ্রামদেশে ছিলেন, 'শালা' শব্দটা মিষ্টি ভাব নিয়ে বলতেন, এতে যে কোন গালাগাল দিচ্ছেন, তা না। **'হে ঈশ্বর তুমি প্রভু, আমি দাস' এইভাবে থাক। 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত', এরূপ 'আমিতে' দোষ নাই; মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়**।

যাঁরা ভাবছেন এই পাঠগুলিতে আমার জন্য কিছু শেখার আছে কিনা, তাঁদেরকে বলি, ঠিক এই পয়েন্টে শেখার মত আছে। ভাব অবলম্বন যেটা করতে হয়, সেটা হল –আমি প্রভুর ভক্ত। পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ভক্ত সম্মেলনে একটা ভাষণে বলেছিলেন –তোমরা ঠাকুরের ভক্ত, তোমাদের দেখে ঠাকুরের নূতন ভক্তরা আসবে। সমাজে তোমার যে আচরণ হবে, ব্যবহার হবে, এই ব্যাপারে তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে। লোকে তোমাকে দেখে জানবে, ঠাকুরের ভক্ত এই রকম হয়। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সমস্যাটা কোথায়? আমি নিজের জীবনে যেটা দেখছি, আশেপাশে যা দেখেছি, এর মধ্যে দুটো জিনিস আমার নজর কেড়েছে।

একটা হয় আমাদের আলস্যবোধ, আমাদের মধ্যে আলস্যে ভর্তি, এটা একটা বড় সমস্যা। ঈশ্বরের নাম করার সময় আমাদের যত আলস্য। কিন্তু সেই সময় যদি পরনিন্দা পরচর্চা চলে, তখন সব আলস্য চলে গিয়ে সবাই আমরা তেতে উঠি। মৃত্যুপথযাত্রীও মৃত্যুর সময় পরনিন্দা শুনে একবার সোজা হয়ে বসে যাবে। দ্বিতীয় হল lack of consistency, ঠাকুর বলছেন একটা ভাব অবলম্বন কর আর ওই ভাবকে সর্বদা ধরে রাখ। তার মানে আপনার সারাদিনের যা কাজকর্ম, চিন্তা-ভাবনা ওই ভাবকে কেন্দ্র করেই ঘুরঘুর করবে। এমন কিছু কঠিন না। বিফলতা আসবে, এটা কখন মনে করবেন না যে, যেমন ভাব অবলম্বন করলেন এটা একশ ভাগ ঠিক ঠিক চলবে, তা হবে না। কিন্তু দিনে দুবারও যদি সফল হন, তার মানে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, আর যুদ্ধে আপনার জয় পাওয়া শুরু হয়ে গেছে। আজ হক কিংবা কাল হক, পুরো যুদ্ধে আপনি জয়ী হবেন। যখন শেষের দিকে চলে আসবেন, তখন একটা দুটো ক্ষেত্রে বিফল হবেন, তবে ওই বিফলতার কোন দাম নেই।

আধ্যাত্মিক জীবনে achievementএর কিছু নেই। এই যে লোকেরা মনে করে, ঈশ্বরদর্শন হবে; হবে না। কি করে হবে; আপনি তো ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে আছেন। বলে, আত্মজ্ঞান হবে, জ্ঞান হবে মানে? আপনি শুদ্ধ আত্মা, আপনার আর কি জ্ঞান হওয়ার আছে! ফালতু যে জিনিসগুলো ধরে রেখেছেন, সেগুলো ফেলে দিন। একটা পুকুর, পুকুরে অনেকগুলো বাঁশ ফেলে রেখেছে বলে অনেকগুলো বিভাজন হয়ে গেছে। বাঁশগুলো তুলে ফেলে দিন, পুকুরের কোন বিভাজন নেই, পুরো পুকুর এক। আমাদের মনের মধ্যে হাজারটা অঙ্কটবঙ্কট দিয়ে টুকরো করে রেখেছি, এটাকে যদি integrate করতে হয়, একটাই পথ –মনের একটা ভাব অবলম্বন করতে হবে।

দুটি ভাব থাকে – একটা হল আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু এই ভাব কদাচিৎ কখন কারুর হয়, এটাও ঠাকুর বলবেন। আমি ভক্ত –এই ভাব সহজে হয়। ওই যে লোকটি খাঁচায় করে নেউল নিয়ে যাচ্ছে, খাঁচায় নেউল নেই। কারণ কাল্পনিক সর্পগুলিকে তাড়ানোর জন্য কাল্পনিক নেউল আনা হয়েছে। আমাদের 'আমি' যেটা, ওটা কাল্পনিক। এই বজ্জাৎ আমিকে সরাতে হবে। কারণ মন কোন না কোন অবস্থায় থাকবে। মন যদি শুভতে না থাকে অশুভ হয়ে যাবে। সেইজন্য আপনাকে জেনেশুনে, সচেতন ভাবে শুভ ভাব রাখতে হবে, যাতে মন অশুভে না চলে যায়। 'আমি ভক্ত' এই ভাব যদি আপনি সব সময় না রাখেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মন ভাবতে থাকবে –আমি অমুক, আমি তমুক, আমি সেই ইত্যাদি, এইসব ভাব আসবেই আসবে।

জ্ঞানযোগ ভারী কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ –দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। অন্নগতপ্রাণ মানে, মন সব সময় দেহের উপর পড়ে থাকে। **তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নামগুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই**। এই যে ঠাকুর প্রার্থনা করতে বলছেন, প্রার্থনা করলে কি হয়, personalityটা খুব সহজে integrated হয়ে যায়। সেই কোন ছোটবেলা থেকে আমরা আবেদনপত্র জমা দিয়েই যাচ্ছি; নার্সারিতে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদনপত্র, ডাক্তারখানায় যান সেখানে আবেদনপত্র জমা দিন, রেলওয়েতে যান সেখানেও ফর্ম ফিলাপ করে আবেদন করুন, রেশনকার্ড করাবেন সেখানেও ফর্ম ফিলাপ করে আবেদন করুন, আধারকার্ড লাগবে এ্যাপ্লিকেশান, যেখানেই যাবেন সব জায়গাতে এ্যাপ্লিকেশান আর এ্যাপ্লিকেশান। এখন বিয়ে করতে হলে ম্যাট্রিমনিয়ালেও আপনাকে এ্যাপ্লিকেশান দিতে হচ্ছে, আর যখন ডিভোর্স দেবেন তার জন্যও এ্যাপ্লিকেশান দিতে হবে। জীবনে আমরা এতগুলো এ্যাপ্লিকেশান দিচ্ছি, একবার ঈশ্বরের নামেও এ্যাপ্লিকেশান দিতে শুরু করে দেখুন না। সেও আবার কাগজে-কলমে লিখতেও হবে না, মনে মনে জমা দিলেই হবে। প্রার্থনা মানেই তাই, ঈশ্বরকে এ্যাপ্লিকেশান দেওয়া।

এ্যাপ্লিকেশান আমরা তখনই দিই যখন আমরা একটা কোন জিনিস চাই। একটা জিনিস না চাওয়ার থাকলে মানুশ তো এ্যাপ্লিকেশান দেবে না। তখন তার জন্য চেষ্টাও করতে হবে। যেমন ধরুন, আগেকার দিনে যখন রেলওয়ে কম্প্যুটার রিজার্ভেশান ছিল না, রিজার্ভেশান ম্যানুয়াল ছিল। সেই সময়েও ফর্ম ভরতে হত, তারপর বুকিং ক্লার্কের পিছন পিছন ঘুরতে হত, দাদা দেখুন না, একটা টিকিট যদি হয়। যদি সিট দিতে রাজী হতেন, তাহলে আবার অনুরোধ করত, জানলার ধারের সীটটা দেবেন। আপনি যদি সত্যিই ঠাকুরকে এ্যাপ্লিকেশান দেন, প্রার্থনা যদি সত্যিই করেন, আপনাকে বাকি চেষ্টাগুলোও তো করতে হবে। কি সেই চেষ্টা? সব সময় ওই ভাব ধরে রাখা –হে প্রভু! আমি তোমার দাস।

যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটি রেখা কাটা হয়েছে। যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি', কি 'ভক্তের আমি', কি 'বালকের আমি' – এরা যেন 'আমির রেখা মাত্র'।

যতক্ষণ মুক্তি না হয়ে যায়, মন থাকবেই, কিচ্ছু করার নেই। এখান আপনি ওটা বাঁশ ফেলে রেখা করে দিচ্ছেন, নাকি হাত দিয়ে একটা রেখে টেনে দিলেন, যাই করুন, রেখাটা থাকবেই। কিন্তু এগোতে এগোতে এমন জায়গায় চলে যায়, যখন ওই রেখাই রেখামাত্র হয়ে যায়। এখানে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে সপ্তম পরিচ্ছেদ শুরু হয়। একই আলোচনা চলছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভক্তিযোগ যুগধর্ম – জ্ঞানযোগ বড় কঠিন – 'দাস আমি' – 'ভক্তের আমি' – 'বালকের আমি'

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রীতিমত একজন advanced soul। পড়াশোনা আছে, জপধ্যান আছে, সাধন-ভজন আছে; ফলে তাঁর প্রশ্ন করার একটা পাত্রতা আছে। আমাদের বেশির ভাগ শ্রোতাদের পাত্রতা নেই। বিজয় কিন্তু তা নন, তাঁর পাত্রতা আছে। তিনি এখন প্রশ্ন করছেন।

বিজয় – মহাশয়! আপনি 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ করতে বলছেন। 'দাস আমি'তে দোষ নাই? ঠাকুর বিজয়ের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ–হাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত–এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বরলাভ হয়।

অনেক আগে আমি একটা সেন্টারে ছিলাম। ওখানে এক মহারাজ ছিলেন, ওনার বেশি পড়াশোনা করা ছিল না, কিন্তু খুব তেজী ছিলেন; বয়স হয়ে গিয়েছিল। একবার একটা জায়গায় চা খাওয়া হচ্ছিল, ওখানে অডিটররা ছিলেন। এমনি যা হয়, অনেক সময় আমরা অজান্তে অনেক বেফাঁস কথা বলে ফেলি। একজন অডিটর বলে বসলেন –'আরে ভাই, সাধুদের সততার কি ঠিক আছে'। ভদ্রলোক যেমনি এই কথা বলেছেন, ওই মহারাজ রেগে আগুন হয়ে ওনাকে চেপে ধরে বলছেন –'কি বললে? আরেকবার বলো, তোমার জিভ টেনে বার করে দেব'। প্রচণ্ড রেগে গেছেন, তুমি সাধুর নামে এই কথা বলছ? এই যে মহারাজের অহংকার, আমি সাধু, আমি কোন অসৎ বা ভুল কাজ করব না। আর সাধুত্বের উপর যদি কোন প্রশ্ন চিহ্ন লাগে, সেটাকে আমি সহ্য করব না। আমরা যখন এই ঘটনাটা শুনেছিলাম, তখন বয়স কম ছিল, মজা করে ঘটনাটাকে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে যখন পিছনের দিকে তাকাই, তখন দেখছি ওই তেজ–আমি সন্ন্যাসী, প্রশ্নই নেই যে আমি এই রকম কিছু করব। আমি ঠাকুরের ভক্ত, প্রশ্নই উঠছে না যে, আমি এই রকম কিছু করব। আর যদি কেউ এটাকে নিয়ে আপত্তি করে, ঠাকুর যেমন বলছেন, আমার নিন্দা করল, তুই কিছু বললি না? এই তেজ ভিতরে আনতে হয়– আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ভক্ত। বিজয় আবার প্রশ্ন করছেন।

বিজয় – আচ্ছা, যার 'দাস আমি' তার কাম-ক্রোধাদি কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ – ঠিক ভাব যদি হয়, তাহলে কাম-ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। এমনি পড়লে মনে হয় সবই জানা আছে। একজন মহারাজ আমাদের বলতেন, আমার খুব প্রিয় কথা –কোন ভক্তকে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'কথামৃত পড়েছেন'? 'হ্যাঁ মহারাজ, পড়ে ফেলেছি মহারাজ, আপনি বলেছিলেন'। শুধু পড়ে ফেলেছি না, পড়ে ফেলে দিয়েছি। এখানে ঠাকুরের কথাগুলো এক-একটি বাক্য, অর্দ্ধ বাক্য, এগুলোকে ধারণা করার জন্য মনের একটা প্রস্তুতি লাগে। এখানে মূল হল – 'ঠিক ভাব যদি হয়'। আমাদের সমস্যাটা ঠিক এই জায়গাতে হয়, আমাদের ভাব ঠিক থাকে না। একটু আগে বলা হল –এক নম্বর আলস্য, দ্বিতীয় lack of consistence, lack of consistence মানে ভাবকে ধরে রাখতে পারে না। ভাব যদি ঠিক হয়, তাহলে কি হয়? তাহলে কাম-ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে।

আমি একটা বর্ণনা শুনেছিলাম, নিজে পড়িনি; কেরল প্রদেশের একজন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ছিলেন। পরে উনি সঙ্ঘ ত্যাগ করে চলে যান। তিনিই পরে মালায়ালাম ভাষার একজন বিরাট

বড় কবি হলেন। বর্তমানকালে তাঁকে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠতম কবি বলা হয়। অনেক বছর সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু পরে ওনার মনে হল, না এটা না, আমার জীবন অন্য ধরণের। ছেড়ে দিলেন, বিবাহ করেন, একটি মেয়েও হয়েছিল, কিন্তু তিনি একজন শ্রেষ্ঠতম কবি। ওনার মেয়ে বাবার উপর একটা বই লিখেছিলেন, সেখানে বর্ণনা করছেন –বাবা বলতেন, যেদিন উনি গেরুয়া ছাড়লেন, তাঁর চোখ থেকে ঝরঝর করে জল বেরোতেই থাকল, সে যেন অশ্রুবন্যা। কারণ এই সন্ন্যাসীর ভাব রীতিমত গভীর ছিল। কিন্তু যে করেই হোক, পারলেন না, সন্ন্যাসজীবন তো অত সহজ না। লোকেরা আমাদের সন্ন্যাসীদের ব্যঙ্গ করে বলে মঠঠুর খাউছি, খট্টর শুইছি, মঠের খাচ্ছ আর খাটে শুচ্ছ, বেশ মজায় আছ। তা নয়, খুব কঠিন জীবন। ভাব যদি ঠিক থাকে, কাম-ক্রোধ তখনও থাকবে, কিন্তু তার আকার মাত্র থাকে। সাধুরা বাচ্চাদের মত, এই গালাগালি, রাগারাগি, একটু পরেই শান্ত হয়ে যান।

রাজস্থানী ভাষাতে খুব সুন্দর একটা ছড়া আছে – থারে সঙ্গ রহনা পাঁউ, থারে বীন রহনা পাঁউ, অর্থ হল, তোমার সাথে থাকতেও পারি না, তোমাকে ছাড়াও থাকতে পারি না। বাচ্চারা ঠিক এই রকম হয়, এক অপরকে ছেড়ে থাকতেও পারে না, আবার তার সঙ্গে থাকতেও পারে না। বাচ্চাদের রাগতে যতক্ষণ, খুশী হতেও ততক্ষণ, সাধু-সন্ন্যাসীরা এই রকমই হয়। কামের মূল শুধু কামিনী না, কামের মূল হয় আমার সন্তান, যার জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে পুত্রৈষণা। ঘর-সংসার করব, ওই মেয়েকে ভালবাসি, ওকে ছাড়া আমার জীবন চলবে না –এগুলোই ভুল পদক্ষেপ।

বলছেন, **যদি ঈশ্বরলাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারু অনিষ্ঠ করতে পারে না**। ভক্তের 'আমি' কারু ধারে কাছে যায় না, লক্ষ্মণরেখা কক্ষণ তাঁরা পার করবেন না। **পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারু হিংসা করে না**। হিংসা জিনিসটা তমোগুণ থেকে হয়। পরশমণি লোহাকে স্পর্শ করলে লোহা সোনা হয়ে যায়। অলঙ্কার হয়ে থাকে, সংসারে থাকতে গেলে এগুলো থাকবে, কিন্তু ক্ষতি করতে পারে না, বাঁধতে পারে না। পোড়ো দড়ি, দড়ির আকার মাত্র থাকে, সেটা দিয়ে আমরা বাঁধনের কাজ করতে পারব না। ঠাকুর এবার নারিকেল গাছে উদাহরণ দিচ্ছেন।

নারিকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলে কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ওইখানে নারিকেলের বেল্লো ছিল। সেইরকম যার ঈশ্বরলাভ হয়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম-ক্রোধের আকারমাত্র থাকে, বালকের অবস্থা হয়। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত, এখানে সন্ন্যাসীদেরকেও ধরা হচ্ছে, কারণ সন্ন্যাসীরাও ভক্ত, তাঁদেরও দেখে বোঝা যায় যে বেল্লো ছিল। ঠাকুরের ভাষা শুনলে বোঝা যায় তিনি গ্রামের লোক। ঠাকুরের সাথে হৃদয়রামের ঝগড়ার অনেক বর্ণনা আছে। ঠাকুর রেগেমেগে হৃদয়কে এমন গালাগাল দিচ্ছেন যে, হৃদয়কে বলতে হচ্ছে, মামা, তুমি কি ভাষা ব্যবহার করছ, আমি যে তোমার ভাগ্নে। শুনে ঠাকুর আরও গালাগাল দিচ্ছেন। এই তো ঠাকুর রেগে যাচ্ছেন, কিন্তু এই রাগে কারুর ক্ষতি করে না।

বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নেই। বালকের কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ – তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ। একখানা পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধ পয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পার। কিন্তু প্রথমে খুব আঁট করে বলবে এখন – 'না আমি দেব না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে'। বাচ্চাদের কোন কিছু দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। সেন্টারগুলি থেকে কখন সখন সাধুদের নিমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে কোন কোন সময় সাধুদের গিফট দেওয়া হয়, একটা তোয়ালে, কিংবা ধুতি বা বই। কোন সাধু যদি না পায়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে, আমি পেলাম না কেন, আমারটা কোথায়? যেমনি দিয়ে দেওয়া হল, সঙ্গে সঙ্গে খুঁজতে শুরু করবে কাকে গচান যায়, একেবারে বাচ্চার মত। অনেকে কোন সাধুকে বলবে, আপনি সাধু হয়ে এটা কি করছেন? আরে ভাই এগুলো কিছু না, সাধুরা বাচ্চাদের মত।

বালকের আবার সব্বাই সমান – ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতি বিচার নাই। মা বলে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়', সে ছুতোর হলেও একপাতে বসে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি-অশুচি বোধ নাই। পায়খানায় গিয়ে হাতে মাটি দেয় না। বালক সব কিছুর বন্ধন থেকে মুক্ত, ওর একটাই আছে –মা। ঠিক তেমনি যে ঠিক ঠিক ভক্ত, ও পুরো inclusive, ঝগড়া-ঝাটি সবই আছে, আমোদ-আহ্লাদ, লোকের সাথে মজা করা, সবটাই আছে, কিন্তু কোন কিছুর বন্ধনে নেই, তৎক্ষণাৎ সে ফেলে দিতে পারে।

কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি' নিয়ে থাকে। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান'–অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব 'আমি' যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ। এই বাক্যটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠাকুরের ঈশ্বরদর্শন, অদ্বৈতজ্ঞান সবই হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি 'আমি ভক্ত' এই ভাবটাকে শেষ দিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, কপিল মুনি, এনাদের সবারই আলাদা আলাদা ভাব ছিল, ঠাকুরের ছিল –আমি ভক্ত। কেউ জ্ঞানের আমি, কেউ শক্তির আমি, বিভিন্ন আমি নিয়ে থাকতে পারেন। ঠাকুর ভক্তের আমি নিয়েছিলেন।

এই যে আমরা এ্যপ্লিকেশানের কথা বললাম, প্রার্থনার কথা বললাম, কেন বলা হল? এটা অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বরদর্শন হয়। কারণ সাধনা আর সিদ্ধি এক। ঈশ্বরদর্শনের পর যাঁর 'আমি' থেকে গেছে, তিনি দেখেন 'আমি ঈশ্বরের দাস', 'আমি সেই ঈশ্বরের ভক্ত'। ঠিক তেমনি কেউ যদি অনুশীলন করতে থাকে, 'আমি ঠাকুরের ভক্ত', দিনরাত যদি অভ্যাস করে, এটাই তাকে জ্ঞানের দিকে নিয়ে চলে যাবে। বিজয়কে ঠাকুর বোঝানর চেষ্টা করছেন, দেখ তুমি যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, জ্ঞানযোগের কথা ভাবছ, এরকমটি না ভেবে ভক্তি জিনিসটাকে ভাব। এই জিনিসটাকে ঠাকুর আরও জোর দেওয়ার জন্য পরের অনুচ্ছেদে বলছেন।

ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ছেলে, তুমি মা' – এই অভিমান রাখতে চায়। আগে যে মনের কথা বলা হল, যারা ভক্ত তারা এই রেখাটুকু রেখে দিতে চায়। কারণ তাতে ভালবাসাটা ধরে রাখা যায়। যার জন্য ঠাকুর চিরদিন মায়ের সন্তান রূপে থেকে গেলেন। অদ্বৈত যদি শ্রেষ্ঠ হত, তাহলে ঠাকুর কেন মায়ের সন্তান রূপে থাকলেন। শ্রেষ্ঠ বলে কিছু হয় না, এগুলো ভাব। ঠাকুরের অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেল, তারপরেও সেই 'আমি' রাখছেন। কি আমি? ভক্তের আমি।

বলছেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঠাকুরকে কেউ যদি মনে করেন, আপনি আমার ভগবান। তাহলে কি হবে? তিনি চাইলে আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দিতে পারেন। কারণ যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে অনেক সময় আমরা একটা ভুল করে বসি; আমরা মনে করি আমি যেমন একটা সত্তা, ঠাকুরও তেমন একটা সত্তা। কিন্তু তা না। আমরা সবাই জুড়ে এক, তিনি সেই বৃহৎ। বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটা ঢেউ, সেই ঢেউতে আমি যেন একটা জলের বুদ্বুদ। সমুদ্রও যা ঢেউও তাই, জলও তাই, জলের বুদ্বুদও তাই। কিন্তু কোথাও অনেক সময় আমরা একটা ভুল ধারণা করে ফেলি –ঠাকুর যেন একটা বড় জাহাজ, তিনি আমাদের পারে নিয়ে যাচ্ছেন। আসলে জিনিসটা তা না। বস্তুত তিনটেই এক, মনের জগতে এই তিন আলাদা হয়ে দেখান। বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান তিনি দিতে পারেন, কিন্তু ভক্তরা চায় না। ঠাকুর আবার অন্য জায়গায় বলবেন, যাঁকে ভালবাসি, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রতি আমার আর দৃষ্টি থাকে না।

কথামৃতে আমরা এখনও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বরে আছি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাথে ভক্তি নিয়ে ঠাকুরের কথা চলছে। আজ শুভ দিন, অযোধ্যায় আজ রামজন্মভূমিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভূমিপূজন করছেন, সেখানে শ্রীরামমন্দির নির্মিত হবে। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, যিনি রাম

যিনি কৃষ্ণ তিনিই রামকৃষ্ণ। আজ খুব ভাল দিন, আমাদের সৌভাগ্য যে আজই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের পাঠ ও আলোচনা করছি, তাও আবার ভক্তিকে নিয়ে। কাঁচা ভক্তি, পাকা ভক্তি, এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আলোচনা হবে। তার সঙ্গে জ্ঞানের প্রসঙ্গ আসবে। আচার্য উপযুক্ত আধার পেলে তাঁর ভিতরের জ্ঞানরাশি পুরোটা ঢেলে দিতে চান, সামনে ভাল আধার না থাকলে বেরোয় না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একজন উচ্চ আধার।

এর আগে আমরা আমিত্বকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমিত্বকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঠাকুর 'দাস আমি'র কথা বলছিলেন। অনেক কিছুর আলোচনা হওয়ার পর বিজয় প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি 'বজ্জাৎ আমি ত্যাগ করতে বলছেন'; 'দাস আমিতে দোষ নাই'? ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত –এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বরলাভ হয়। এই কথাগুলো অতি সাধারণ কথা, আমরা সবাই জানি। সংসার মানে আমি, আমি মানে সংসার। যা কিছু আছে সব আমিত্বকে নিয়ে। যার জন্য পাকা আমি, কাঁচা আমি এই কথাগুলো ঠাকুর বলেছেন। যত শাস্ত্রলো আছে তা সে যে ধর্মেরই হোক, ঈশ্বর নিয়ে যখনই কথা বলেন, এনারা সবাই একটা কথাই বলেন –ঈশ্বরে মন দাও। কিন্তু মনটাই তো আমি, আমি বলতে মন। তাই না, সবারই জীবনে কোন না কোন দুঃখ-কষ্ট থাকে, জীবনে দুঃখ-কষ্ট সবারই আছে। কিছু আছে যেগুলো জাগতিক কষ্ট –টাকা-পয়সা নেই, বাসস্থানের ঠিক ব্যবস্থা নেই, সন্তান অবাধ্য, ছেলের চাকরি নেই, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, বাড়িতে অসুখ লেগে আছে; এই ধরণের অনেক রকম সমস্যা থাকে। জাগতিক সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি না, এটা আমাদের কাজ না। এটা অর্থনীতবিদ্, রাজনীতিবিদদের কাজ। যেখানে মনের জগৎ শুরু হয়, মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও আমাদের কোন কাজ নেই, ওটা আবার মনস্তত্ত্ববিদদের কাজ। কিন্তু আমাদের পরম্পরায় ভারতবর্ষে সাধু সন্ন্যাসীরাই কাউনসেলিংএর কাজটা করতেন। মন্দিরে যাঁরা পূজারীরা আছেন, গ্রামের আশেপাশে যত মঠ, আশ্রম আছে, সেখানকার সাধু, মহন্ত যাঁরা থাকতেন, তাঁদের কাজ ছিল কাউনসেলিং করা।

যেখান থেকে মনের রাজ্য শুরু হয়, সেখান থেকেই সাধু সন্ন্যাসীদের দায়ীত্ব শুরু হয়ে যায়। আর যখন ধর্মে প্রবেশ করবেন, সেখানে পুরোপুরি সাধু-সন্ন্যাসীদের রাজত্ব, সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া হয় না। যে যাই বলুক, ত্যাগী ছাড়া ধর্মকথা হয় না। আমরাও অল্প বয়স থেকে শুনে আসছি, ভাল মানুষ হলেই হল, তার জন্য সন্ন্যাসী হওয়ার কি আছে। পরে দেখলাম, ত্যাগী না হলে ধর্মকথা বলা যায় না, লোকেরাই নেবে না। 'ত্যাগের জীবন' জিনিসটাই আলাদা, যতক্ষণ না এই পথে আসছে, ততক্ষণ এটাকে বোঝা যাবে না।

এই 'আমি' হাজারটা জিনিসের সাথে জুড়ে আছে। নিজের যে অস্তিত্ব, নিজের যে ছোট্ট মনের সংসার, যেখানে আমি পাঁচটা জিনিসের সাথে জড়িয়ে আছি –আমি এই বংশের লোক, আমার এত টাকা-পয়সা আছে, আমি অমুক স্কুল-কলেজে পড়েছি, আমি অমুক শহরের লোক, আমি অমুক রাজ্যের লোক, আমি অমুক ধর্মের লোক এই রকম হাজারটা জিনিসের সাথে এই 'আমি' জুড়ে আছে। জীবনে আপনার যদি উপলব্ধি না থাকে, তাহলে আপনি যে জিনিসগুলোর সাথে জড়িয়ে আছেন, তার অহংকারে নিজের অহংকার হয়। আমরা নিজেকে যেটার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করি সেটাকে নিয়ে সবাই বলে – আমার দেশ মহান, আমার রাজ্য মহান, আমার ভাষা মহান। মহান, মহান, মহান চলতেই থাকে। কেন? কারণ নিজের কোন উপলব্ধি নেই, নিজস্ব কিছু নেই কিনা। যাঁর নিজের উপলব্ধি থাকে সে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে ভাবতে যায় না। এখন, সেখানে যে অহংকার, 'তুমি জানো আমি কে', এই যে কথা; দিল্লীতে খুব নামকরা কথা আছে, পুলিশ যদি কাউকে ধরে তার প্রথম কথা এটাই –জানতে হ্যায় ম্যায় কৌন হুঁ। কি করে জানব আপনি কে? ট্রাফিক আইন ভেঙেছে, পুলিশ খপ্ করে ধরেছে, পুলিশকে বলছে, জানতে হো ম্যায় কৌন হুঁ। এই যে অহংকার, তিনি যদি সত্যিকারের বড়লোক হতেন এই কথা তিনি কখনই বলতেন না।

যে নিজেকে বড়লোকের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে, যারা ক্ষমতাবান লোকের সাথে আইডেন্টিফাই করে রেখেছে, তারা এই ধরণের কথা বলে। এদের বিরাট অহংকার, আমি একটা বিরাট কিছু। দিল্লীতে সবাই কথায় কথায় নিজের স্ট্যাটাস দেখায়, বেঙ্গলে এটা কম। আপনি একটা পুলিশের লোককে জানেন, হয়ত সে একজন সাব-ইন্সপেক্টর বা ইন্সপেক্টর, বা একজন আইপিএসকে জানেন, একটা সাধারণ একজন বিডিও বা এসডিওকে জানেন, তাতেই আপনার এত অহংকার, তাতেই আপনার গলার কত জোর। ঠাকুর এর আগে বললেন, একটা ব্যাঙের একটা টাকা হয়েছিল, তাতেই তার কি অহংকার, হাতিকে লাথি দেখায়। যাঁরা শুনছেন, আপনাদের সবারই কিছু না কিছু অহংকার আছে, আমারও আছে। আমাদের সবারই দুর্বলতা আছে, আপনারও আছে, আমারও আছে।

নিজের উপলব্ধির অহংকার খুব কম, কিন্তু অপরের সঙ্গে জুড়ে থাকার যে অহংকার, ওই অহংকার অনেক বেশি। আপনি দেখতে সুন্দর, তাতে আপনার কত অহংকার। এই সৌন্দর্যটা কি আপনি নিজে এনেছেন? কখনই না। জেনেটিক কম্বিনেশান একটা হয়েছে, আমাদের সহজ ভাষায় –ঈশ্বর দিয়েছেন। তাতে আপনার অহংকার করার কি আছে। যাঁর সত্যিকারের বিদ্যা আছে, তিনি বিনয়ী হয়ে যান, *বিদ্যা দদাতি বিনয়ং*। আর যে একটু পড়াশোনা করেছে, তার কত অহংকার। কেন অহংকার? কারণ বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু মূল কথা, যেটার সঙ্গে আপনি জুড়ে রয়েছেন, সেটাকে দিয়ে নিজেকে কত বড় মনে করছেন।

একটা ধর্মের লোক সে নিজেকে তাদের ভগবানের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে বলে, আমি তাঁর ভক্ত; তাতেই সে মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে। গত দু-হাজার বছরের ইতিহাস দেখুন, এটাই চলছে। এ তাকে মারছে, সে তাকে মারছে, মারামারি লেগেই আছে; শুধু এইটুকু –আমি ভগবানের লোক, যেটা পুরো ফাক্কা। কিন্তু তার থেকে বেশি আমাদের সমাজের যেটা খুব বাজে অবস্থা –কোন এক মুখিয়াকে চেনে, কোন বিডিওকে চেনে, তাতেই কত অহঙ্কার। যদি আপনি এবার সত্যিকারের নিজেকে জুড়ে দেন –আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি ঈশ্বরের দাস; তাহলে ভাবুন আপনার চরিত্রের কি আমূল পরিবর্তন হবে!

উপনিষদের ক্লাশ করার সময় আমি প্রায়ই বলি, 'Power of Positive Thinking'বই পড়ার পর লোকেরা বলে নাকি, তার অনেক মঙ্গল হয়েছে। আর ধর্মগ্রন্থের দুটি কথা পড়ে লোকেরা মনে করে আমি আমার ধর্মের রক্ষা করছি, তাতেই সে সুইসাইডাল বম্বার হয়ে যাচ্ছে। আর সেই জায়গায় যদি আপনি মনে করেন, আপনি সেই আত্মা যাঁর জন্ম নেই মৃত্যু নেই, যাঁর দুঃখ নেই, শোক নেই; এর সঙ্গে যদি আপনি আইডেন্টিফাইড করে নেন তাহলে আপনার শক্তি কি রকম হবে ভেবে দেখুন তো। এখানে এই জায়গাতে আত্মজ্ঞান নিয়ে কথা চলছে না, ঈশ্বরকে নিয়ে চলছে। পরে ঠাকুর বলবেন, আমরা যে মনে করি আমরা ভক্ত না, এ-রকম মনে করাটা ঠিক ঠিক হয় না, আসলে এটা কাঁচা ভক্তি, সেইজন্য আমাদের এত সমস্যা হয়। পাকা ভক্তি তখনই হয়, যখন ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তখন কেমন ক্ষমতা বাড়বে, একবার ভেবে দেখুন তো।

আপনারা যে কজন শুনছেন, আপনাদের মধ্যে একজন কেউ আছেন, যাঁর মধ্যে কোন ভয় নেই? গতকালই আমার একজন বন্ধুকে বলছিলাম, আমার জীবনে existing সবচেয়ে যে আনন্দ হয়, তা হল যখন ঘুমোতে যাই –আঃ দুনিয়াটা পিছনে থেকে গেল, এখন আমি আমার মধ্যে আমার মত থাকব। আর anticipated সুখ? সবচেয়ে সুখ হল –মৃত্যু যখন আসবে। মৃত্যুর কথা ভাবলেই আমার আনন্দে হাসি ফুটে ওঠে। এটা কোন মানসিক অসুস্থতা না। যে বীর, যে সন্ন্যাসী, সে মৃত্যুকে ভালবাসে। আমি ভাবি মৃত্যু যখন আসবে কি মজাটাই তখন হবে। যেমন ঘুমোতে যাওয়ার সময় আমার জাগ্রত অবস্থাকে পিছনে ছেড়ে দিলাম, মৃত্যুর সময় স্বপ্নের অবস্থাটাও পিছনে চলে গেল। অথচ মানুষ মৃত্যুকে কি প্রচণ্ড ভয় পায়। একটু বিচার করে দেখুন। অল্প বয়সে মন্দিরে একটা গান শুনতাম, তখন খুব মজা লাগত –'আমরা মায়ের ছেলে, আমরা মায়ের ছেলে। আমরা কি কম আসুক না যম'। আমার তখনও

মনে হত, আচ্ছা এই গানটা কেন লেখা হয়েছে? আমরা মায়ের ছেলে, আমরা যমকে ভয় পাই না। তখনই ভাবতাম, যমকে ভয় কেন পাবো, যমকে ভয় পাওয়ার কি আছে।

ছোট বাচ্চা, তিন-চার বছরের হবে, দুষ্টুমি করেছে, তাকে কেউ তাড়া করেছে, বাচ্চাটি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে মায়ের কোলে লুকিয়ে গেল। ক্যাঙারুর বাচ্চা, ভয় পেলে মায়ের পেটে যে থলে থাকে তাতে ঝাঁপ মেরে সেঁদিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। যদি একবার কেউ এই আমিত্বটাকে নিজের বাবা-মা, নিজের সম্পত্তি, নিজের যে মান-সম্মান, এগুলো থেকে সরিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারে, তার ফল কি হবে? আমাদের সমস্যা কি হয়, আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে যাই তখন আমাদের মধ্যে জাগতিক চাহিদাই বেশি থাকে –ঠাকুর, আমার যেন এটা হয়, ঠাকুর আমার যেন ওটা হয়। আর এগুলোর সমাধান না হলেই মনে হবে, ঠাকুরকে ভালবেসে আমার কি হল? তা না। যিনি ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক ভালবাসেন, তাতে তাঁর কি হবে? সে কি সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষ মেরে বেড়াবে? বম্বিং করে বেড়াবে? কখনই না।

ছোটবেলায় বন্ধুরা মিলে আমরা কত রকমের দুষ্টুমি করতাম, খেলতে গিয়ে ও বাড়ি থেকে কিছু খাবার এনেছে, আমি কিছু নিয়ে গেছি, আমরা কেউ ওর থেকে নিয়ে খাচ্ছি, ও তার থেকে নিয়ে খাচ্ছে। হঠাৎ মাঝখান থেকে কোন ব্রাহ্মণ বাড়ির বন্ধুর পৈতে হয়ে গেল। খেলতে এসে প্রথম দিন থেকেই শুরু করবে –আমি এঁটো খাব না। এ ব্যাপারে খুব দৃঢ়, কোন মতেই কারুর এঁটো খাবে না। ওই পরিবর্তনটা কম বয়সে আমার কাছে খুব অবাক লাগত। যে কাল পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে খাবার শেয়ার করছে, কিন্তু যেই পৈতে হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তার এই অহঙ্কার –আমি কারুর এঁটো খাবো না। ব্রাহ্মণত্বের সাথে সে আইডেন্টিফাইড।

স্বামীজী বলছেন, তুমি যদি হিন্দু হও তাহলে কি করতে হবে তোমাকে? তুমি হিন্দু এই অহংকার তোমার যদি থাকে তাহলে কি তুমি ঢাক-ঢোল-করতাল নিয়ে কীর্তন করবে, আরতি করে বেড়াবে? একেবারেই না। হিন্দু মানে out and out spiritual, out and out spiritual মানে হয় ঈশ্বরে মন। অন্যরা মুখে বলে, অন্যরা বলে, হে ভগবান রুটি দাও, হে ভগবান তলোয়ার দাও, হে ভগবান বোমা দাও। আমাদের কাছে তা না। আমাদের কাছে হল –হে ভগবান আমি তোমার সন্তান, আমি তোমার সাথে এক হতে চাই। আমরা হিন্দুরা ধর্ম, অর্থ, কাম বলি ঠিকই, সেটা সবচেয়ে নিম্ন স্তরে। কিন্তু আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষপ্রাপ্তি।

দ্বিতীয় প্রত্যেক হিন্দুকে ভালবাসা। ভাল করে দেখলে দেখবেন, এই দুটো জিনিসই হিন্দুরা করে না। স্বামীজী বারবার এই কথা বলছেন –I don’t call a Hindu a Hindu if he is not spiritual। পুরোদমে তুমি যদি আধ্যাত্মিক না হও, তাহলে তুমি হিন্দু নও। তাহলে প্রথম, হিন্দুত্বের সঙ্গে আপনার সেই যুক্ত ভাব নেই, দ্বিতীয় হিন্দুত্ব জিনিসটা কি সেটা আপনার জানা নেই। অথচ লোকেরা বলে যাচ্ছে, হিন্দু ধর্ম ধর্মই না; কি-সব বলে রে ভাই! অন্য ধর্ম হল এক-একটা হীরা, মুক্তা, মোতি, দামী পাথর, সোনা; হিন্দু ধর্ম হল কুবেরের খাজানা, আপনি যা চাইবেন সব হিন্দু ধর্মে পেয়ে যাবেন। বাকি সব ধর্ম হল ডোবা, পুকুর; হিন্দু ধর্ম হল মহাসমুদ্র। সেই হিন্দু ধর্মের সাথে আপনার কোন আইডেন্টিফিকেশানই নেই, সেইজন্য হিন্দুদের আজ এই দুর্বস্থা। একবার যদি আইডেন্টিফিকেশান কোন রকমে হয় –আমি হিন্দু; তার পরের আইডেন্টিফিকেশান হবে, হয় আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, নাহলে আমি ঈশ্বরের সন্তান। তৃতীয় আর অন্য কোন আইডেন্টিফিকেশান হবে না।

এই দুটো আইডেন্টিফিকেশানের মধ্যে একটা যদি হয়, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, দ্বিতীয় হল আমি ঈশ্বরের সন্তান বা আমি ঈশ্বরের দাস, বা যে ভাব হয়, যেমন গীতায় ভগবান বলছেন *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, এই জগতের আমি বাবা, এই জগতের আমি মা আর এই জগতের আমি পিতামহ, আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে একটা ভাব করুন না, ঈশ্বরকে মা রূপে দেখুন, ঈশ্বরকে বাবা রূপে

দেখুন, ঈশ্বরকে ঠাকুর্দা রূপে দেখুন; আর ধাতা, তিনি আমাদের ধারণ করে আছেন, তিনি আমাদের পোষণ করছেন সেই রূপে দেখুন। তাহলে কি হবে? ভগবান একটা ক্রেডিট কার্ড দেবেন, যে ক্রেডিট কার্ডে টাকা তোলার কোন সীমা নেই। Limitless withdrawal, যত খুশী টাকা withdraw করুন – না সেটা হবে না। ভগবান কল্পতরু, ভগবান কামধেনু, যত খুশী দুয়ে নাও। বিজয় জিজ্ঞেস করছেন।

বিজয় – আচ্ছা, যার 'দাস আমি', তার কাম-ক্রোধাদি কিরূপ? তাহলে কি এদের কাম-ক্রোধ থাকে না? গীতাদিতে বারবার বলছেন, এনারা রাগ-দ্বেষের পারে চলে যান, কাম-ক্রোধের পারে চলে যান। ঠাকুর এবার অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – ঠিক ভাব যদি হয়। ঠাকুরের এই কথাটা 'ঠিক ভাব যদি হয়' দাগ দিয়ে রাখবেন। আপনি কি নিজেকে একজন সত্যিকারের হিন্দু মনে করেন, আপনি কি সত্যিকারের ভগবানের ভক্ত, সত্যিকারের ঠাকুরের ভক্ত? যদি বলেন 'হ্যাঁ', তাহলে আপনি মনে করবেন, আপনাকে স্পিরিচুয়াল হতে হবে; স্পিরিচুয়াল মানেই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মভাবে এক, আর তা নাহলে সন্তান রূপে, দাস রূপে যেভাবেই হোক এক। তাহলে কি হয়? তাহলে একটাই লক্ষণ –যদি ঠিক ভাব হয়; তাহলে কাম-ক্রোধের আকার মাত্র থাকে।

এটাই হচ্ছে ultimate taste। আপনি ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছেন কিনা, আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়েছেন কিনা, এর একটা লক্ষণ –inclusiveness। তার প্রতিফলন কিভাবে দেখা যাবে? কাম-ক্রোধ থাকবে, কিন্তু আকার মাত্র। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এত হিংস্রলোকদের দেখেছি, ওদের কথা ভাবলে এখনও আঁৎকে উঠি। ঘুমোতে যাওয়ার আগে যদি কোন দিন এদের হিংস্র ঘটনা মনে পরে, সেদিন আমার ঘুম চটকে যায়।

২০০৫ সালে আমি স্বামীজীর বাড়িতে ছিলাম, সেই সময়কার একটা ঘটনা এখনও মনে পড়লে আঁৎকে উঠি। ওখানে একজন দ্বারবান ছিল, সে ওখানকারই একটি ছেলের সাইকেলটা চেয়েছিল। ছেলেটি সাইকেল দেয়নি। তারপর ছেলেটি এসে দেখে সাইকেলের চাকা পাঞ্চার। সারাতে নিয়ে গিয়ে দেখছে চাকাতে প্রায় আশি খানা পেরেক মেরে দিয়েছ। ভাবুন আশি খানা পেরেক চাকাতে মেরে রেখেছে, মানে ওর টায়ার-টিউবকে পুরো দফারফা করে রেখেছে। কতটা হিংস্রভাব। প্রথম কথা, আমি চেয়েছিলাম সে দিল না, ইচ্ছা করেই হয়ত দিল না, আচ্ছা না হয় ছেলেটা বদমাশ, আপনি একটা কি দুটো পেরেক মারুন। কিন্তু তাই বলে আশিটা পেরেক! ভাবা যায়! এটা হল হিংস্রভাব।

তাহলে সংসারে যারা আছে তাদের কি কাম-ক্রোধ থাকবে না? কাম না থাকলে সংসার চলবে কি করে, কাম না থাকলে সন্তানোৎপত্তি কি করে হবে? তবে আকার মাত্র থাকে। হিন্দুদের যে ষোড়শ সংস্কার আছে, তাতে প্রথমেই আসে গর্ভাধান। মানুষ পশুপাখির মত মৈথুন করে বেড়াবে, এ-জিনিস কল্পনাই করা যায় না। সন্তান উৎপত্তি করতে হলে তার আগে যজ্ঞ করতে হবে, তারপরে আসবে গর্ভাধান, তারপরে গর্ভ। তার মানে কাম থাকবে, কিন্তু আকার মাত্র। ক্রোধ থাকবে, ঠাকুর বলছেন ফোঁস করতে, তা নাহলে ক্ষতি করে দেবে। জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরলাভ। এই জীবনটাই যদি নাশ হয়ে যায়, এরপর আপনি কোথায় গিয়ে পড়বেন তার কোন ঠিক নেই। জীবনটাকে যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে। কারণ যখন এই জীবনে এসেছেন, একটা তো কিছু উদ্দেশ্য আছে। ঠাকুর বারবার বলছেন, উদ্দেশ্য একটাই –ঈশ্বরলাভ। তাহলে ধর্ম, অর্থ, কাম কেন বলা হয়? কারণ মানুষ নিতে পারে না। বিবর্তনের যে সিঁড়ি, এখন এরা সেই সিঁড়ির অনেক নীচের ধাপে আছে, দুম্ করে তাকে উপরের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় না। স্কুলে বাচ্চারা যখন পড়তে যায়, প্রথমেই তাদের গ্রাজুয়েশানের সিলেবাস দেয় না, আগে অ-আ-ক-খ শেখায়। ধর্ম, অর্থ, কাম এটাও সেই রকম, নীচের ক্লাশের সিলেবাস। হিন্দুদের আসল ও একমাত্র উদ্দেশ্য মুক্তি। ঠাকুর সেইজন্য বারবার হিন্দু ধর্মকে সামনে রেখে বলছেন, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

ত্যাগ, তপস্যা, মুক্তির সাধন যা কিছু আছে, আমরা একে যে নামেই সম্বোধন করি, এটাই হিন্দু ধর্ম, এটাই ঠিক ঠিক হিন্দু ভাব –এর একমাত্র উদ্দেশ্য মুক্তি। জীবনটাই যদি নাশ হয়ে যায়, দেহটাই যদি না থাকে, পাগলই যদি হয়ে যায়, তার থেকে ভাল বাবা তুমি থাক, তোমার যা করার করে নাও, কিন্তু তারপরে তুমি জেনে রাখ তোমার উদ্দেশ্য ত্যাগের পথে আসা। আর তুমি যদি ওদিকে না যাও, প্রকৃতি তোমাকে দিয়ে ত্যাগ করিয়ে নেবে। তুমি ত্যাগী হতে চাইছ না তো, মৃত্যুর সময় তোমার পায়ে দড়ি বেঁধে যমদূতরা তোমাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে, তোমার সব কিছু এখানে পড়ে থাকবে। জীবনে সবাইকে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে হয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন জীবদ্দশায় হয়, বাকিরা মৃত্যুর সময় হয়।

ভয় যদি না পাও, তাও টেনে নিয়ে যাবে, ভয় যদি পাও তাও টেনে নিয়ে যাবে; সারা জীবন ভয়ে ভয়ে কাটানোতে আপনার কি লাভ? এগুলো অতি সাধারণ কথা, এই কথাগুলো সবাই জানেন, সবাই বোঝেন। আর এগুলো পালন করা এমন কিছু না যে, আপনাকে বলা হচ্ছে না দিনে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা পা মুড়ে জপধ্যান করতে হবে। শুধু এইটুকু –একটু ছাড়তে শিখুন। আর ঠিক যদি আপনার ভাব হয়, আপনি যদি সত্যিকারের হিন্দু হন, তাহলে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু জাতিকে রক্ষা করতে শিখুন। হিন্দু জাতির উপর যে এত অত্যাচার হয়েছে, এই কারণেই হয়েছে। লোকেরা জিনিসটাকে ভুল বুঝেছিল। হিন্দু জাতি স্বভাবে খুব নরম, তবে রক্ষা করতেও শিখতে হয়। যার জন্য ক্ষত্রিয় বর্ণ তৈরী করা হয়েছিল, ক্ষত্রিয়ের কাজই হল সে রক্ষা করবে; কিন্তু কোথাও তারা রক্ষা করতে পারলেন না। কিন্তু যে জাতি একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে আছে, সেই জাতিকে রক্ষা করার জন্য একটা বিশেষ বর্ণ দরকার, যারা এটাকে রক্ষা করবে। কাম-ক্রোধ রাখতেই হয়। যাতে সৃষ্টিটা চলে তার জন্য কাম রাখতে হয় আর অপরে যাতে ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য ক্রোধ রাখতে হয়। কিন্তু কেউটে সাপের মত না, ক্রোধে মারল এমন ছোবল যে শেষ।

যদি ঈশ্বরলাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারু অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারু হিংসা করে না। গীতাতে আছে, এবং আচার্যও তাঁর গীতা ভাষ্যে বলছেন, মহাপুরুষরা যে জিনিসগুলিতে সিদ্ধ হয়ে যান আর অনায়াস করেন, সাধারণ মানুষ সেটাকেই চেষ্টা করে করেন, এটাকেই বলে সাধনা। আমাদের সাধনা হল, সকাল-বিকাল কোন রকমে একশ আট বার জপ করা, এটা সাধনা না। সাধনা মানে, যিনি আপনার ইষ্ট, যিনি আপনার গুরু, তাঁর জীবনে যেগুলো আদর্শ রূপে ছিল, যেগুলো তাঁর জীবনে স্বাভাবিক ছিল, স্বতঃস্ফূর্ত ছিল; আপনাকে চেষ্টা করে ওটাই করতে হবে।

আপনারা কথামৃত শুনছেন, আমরা ধরেই নিচ্ছি আপনারা ঠাকুরের ভক্ত। যদি ঠাকুরের ভক্ত হন, ঠাকুর ছিলেন ত্যাগের বাদশা, সেখানে আপনি একটুও কি ত্যাগ করতে পারেন না? একটা সীমা বেঁধে দিতে কি পারেন না? আমার এই এই জিনিস এতটা এতটা করে থাকবে, এর বেশি না। ছাড়ার অভ্যাস করুন, ত্যাগের বাদশা হন। নিজের সন্তানের জন্য কিছুটা করতে হবে, অবশ্যই করতে হবে, কেউ আপনাকে করতে নিষেধ করছেন না। কিন্তু যিনি ত্যাগের বাদশা, তাঁর ভক্ত হয়ে আপনি কি রকম করবেন? লাটু মহারাজ, স্বামী অদ্ভুতানন্দজী কাশীতে থাকতেন, তিনি ত্যাগী আবার বিরাট তপস্বী ছিলেন। ওনার একবার হঠাৎ ইচ্ছা হল ঠাকুরের জন্য একটা রূপোর আসন করাবেন। কোন ভাবে কোথা থেকে মনের মধ্যে একটা ভাব এসে গেছে। তিনি অনেকের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশও করেছেন। তারপরে হঠাৎ তাঁর মনে হল –ঠাকুর ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এ আমি কি করছি? মনের ভাবটা পাল্টে গেল, ওই ইচ্ছা থেকে তিনি সরে এলেন। খ্রীশ্চানিটির ইতিহাস খুলে দেখুন –যীশু ত্যাগের বাদশা। যীশুর জীবনী পড়তে পড়তে মনে হবে, একজন বেদান্তী সন্ন্যাসীর জীবনী পড়ছি। আর চতুর্থ, পঞ্চম শতকে সারা ইউরোপের চার্চগুলিকে দেখুন, মনে হবে যেন ধন-দৌলতের খনি।

একটা খুব সুন্দর ঘটনা আছে। ডেজার্ট ফাদাররা ছিলেন খুব তপস্বী। একবার কিভাবে একজন এই রকম খ্রীশ্চান ফাদার, খুব বড় তপস্বীকে কোন কারণে তাঁকে রোমে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ওই ডেজার্ড ফাদারকে চার্চে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখানো হচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে ঐশ্বর্য দেখতে লাগলেন। যিনি তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, হয়ত পোপ ছিলেন বা কোন বিশপ ছিলেন, উনি এই ডেজার্ড ফাদারকে খুব সম্মান করে সব লিছু দেখাচ্ছেন। ত্যাগী কিনা, ত্যাগী পুরুষদের সবাই সম্মান করে। খাওয়ার সময় রূপোর পাত্রে সব রকম খাবার আনা হয়েছে। পোপ ফাদারকে বলছেন – Gone are the days, when we had to be satisfied with bread and water। আমাদের আর সেই দিন নেই, যখন শুকনো রুটি আর জল খেতে হত। মানে, বলতে চাইছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের দিনকাল এখন ভাল হয়েছে। সেই ডেজার্ট ফাদার তখন তার উত্তর দিচ্ছেন – Gone are the days, when someone will tell a lame, 'get up and walk' and he starts walk, যীশু একবার এক খঞ্জকে দেখে বললেন, 'get up and walk' সেই লোকটি সুস্থ হয়ে চলতে লাগল। বক্তব্য হল, তোমার এই বিশাল ঐশ্বর্য এসেছে ঠিকই, কিন্তু তোমার স্পিরিচুয়াল পাওয়ারস কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে। এই রকম আরেকজন ডেজার্ট ফাদারকে নিয়ে এসেছিল, তিনি ঐশ্বর্য দেখছেন, আর জিজ্ঞেস করছেন, where are the wives। যিনি সঙ্গে ছিলেন, তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, Father we don't marry। ক্যাথলিকরা বিয়ে করে না, উনিও জানেন। কিন্তু আবার ঐশ্বর্য দেখছেন, আবারও জিজ্ঞেস করছেন, where are the wives। তিন-চারবার বলার পর যিনি গাইড তিনি খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনাকে তো কতবার বললাম, আমরা বিয়ে করি না, কেন এই প্রশ্ন আপনি বারবার করছেন'? সেই ডেজার্ট ফাদার বলছেন, 'এত ঐশ্বর্য যখন এসে গেছে, বউ আসতে আর কতক্ষণ'। সেই যীশু যিনি হলেন ত্যাগের মূর্তরূপ, তাঁর চার্চের কি ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য গর্বের কিছু না, এটা লজ্জার জিনিস। তোমার ইষ্ট তিনি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা সন্ন্যাসীর হলাম ঠাকুরের ভাবের, আমরা যদি দেখি কোন সাধুবাবা সিল্কের জামা-কাপড় পড়ে আছেন আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে মাঝে মাঝে সোনার রুদ্রাক্ষ; লজ্জার জিনিস, এটা গর্বের কিছু না। আমরা বলতে পারি উনি রজোগুণী সাধু, কিন্তু লজ্জার বিষয়। ভক্তদের জন্যও একই জিনিস। ঠাকুর ত্যাগের বাদশা, আপনি তাঁর ভক্ত, আপনার চাল-চলনে ত্যাগের শক্তি প্রকাশ পাবে। কাম-ক্রোধ থাকবে, টাকা-পয়সা থাকবে, সবই থাকবে; কিন্তু ঐশ্বর্য থাকবে ত্যাগের, টাকা-পয়সার না, ত্যাগের শক্তিটা যাতে দেখা যায়।

কেউ যখন ঈশ্বরের ভক্ত হয় তখন কি হয়? তখন ঠাকুর নারিকেল গাছের বেল্লোর উপমা দিচ্ছেন। **নারিকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলে কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ওইখানে নারিকেলের বেল্লো ছিল। সেইরকম যার ঈশ্বরলাভ হয়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম-ক্রোধের আকারমাত্র থাকে, বালকের অবস্থা হয়**। বালকের মধ্যে যেমন সত্ত্ব, রজো, তমোগুণ, কোন গুণের আঁট নেই। **বালকের কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ –তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ**। কোন জিনিসকে বালক ধরে রাখে না, কোন কিছুতে আঁট থাকে না, সরল মন। **একখানা পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধ পয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পার। কিন্তু প্রথমে খুব আঁট করে বলবে এখন –'না আমি দেব না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে'। বালকের আবার সব্বাই সমান – ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতি বিচার নাই। মা বলে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়', সে ছুতোর হলেও একপাতে বসে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি-অশুচি বোধ নাই। পায়খানায় গিয়ে হাতে মাটি দেয় না**।

এই কথাগুলো ঠাকুর তাঁদের কথা বলছেন, যাঁদের ঈশ্বরলাভ হয়ে গেছে। আবার বলছেন, **কেউ কেউ সমাধির পরেও 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি' নিয়ে থাকে। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ভক্ত,**

তুমি ভগবান' –এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব 'আমি' যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়। এরই না ভক্তিযোগ।

এই যে একটু বলা হল, যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, তাঁদের যে আচরণ, সেটাকে যখন সাধারণরা অভ্যাস করেন, সেটাকেই বলা হয় সাধনা। যিনি ভক্তিপথে ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁর স্বভাব কি রকম হয়? বালকের যে বর্ণনাগুলো ঠাকুর করছেন –সত্ত্ব, রজো, তমো এই তিনগুণের পারে। কোন জাতি বিচার নেই। হিন্দুদের জাতি বিচারটা বড্ড বেশি ছিল। আমরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে inclusive, কিন্তু বাস্তবিক জীবন খুব বেশি exclusive। বালক সবাইকে সমান দেখে, সবাই ঈশ্বরের সন্তান কিনা। সেইজন্য যিনি ঈশ্বরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনিও সবাইকে সমান দেখেন। কোন বিচার করেন না, এটা বলেন না যে, এ আমার ধর্মমতের লোক নয়, এর গলাটা কেটে দাও। বিভিন্ন গ্রন্থে এই জিনিস আছে, শুধু মাত্র একটা গ্রন্থে নেই, আপনারা যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন, সেখানেও পাবেন। যে ধর্ম বলে, আমার ধর্ম মতের না হলে তার গলা কেটে দাও, তার বাড়ির মেয়েদের সাথে এই রকম কর, এই ধর্ম কিসের ধর্ম? প্রথম ও শেষ কথা –তুমি ঈশ্বরের ভক্ত। অন্য ধর্মের লোকেরা কি ঈশ্বরের সন্তান না? তার মানে তোমার দুটো ঈশ্বর আছে।

কথামৃতে প্রথমের দিকে আছে, মাস্টারমশাই বলছেন, মূর্তিপূজা যারা করে তাদেরকে বলে দেওয়া দরকার যে, জিনিসটা এই রকম। ঠাকুর বলছেন, তুমি বোঝাবার কে, যিনি বোঝাবার তিনিই বুঝিয়ে দেবেন। আরে ভাই, হয় তুমি বল, তোমার ধর্মের যিনি স্রষ্টা তিনিই আসল ঈশ্বর। তার মানে আর-একজন ঈশ্বর আছেন, কারণ সৃষ্টি করার একমাত্র অধিকার ঈশ্বরের। আর যদি মনে কর আমরা ভুল পথে আছি, সেই একই ঈশ্বরের সন্তান, তিনিই তাঁর সন্তানকে দেখবেন, তুমি দেখার কে?

এখানে ঠাকুর বলছেন, যদি ঠিক ঠিক কারুর সত্যিকারের ঈশ্বরদর্শন হয়, তখন তাঁর কি হয়। গীতায় বলছেন –*সর্বভূত হিতে রতাঃ*। গীতায় এই *সর্বভূতে হিতে রতাঃ* ছয়বার আসে। তিনি সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের জন্য লেগে থাকেন। বলছেন, সিদ্ধপুরুষদের আচরণ যখন পালন করা হয়, যেটাকে বলছেন–এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। এখানে বালক সম্বন্ধে যে কটা কথা বলা হয়েছে –জিনিসের প্রতি আঁট নেই, মান-সম্মানের প্রতি আঁট নেই, কোন কিছুর প্রতি আঁট নেই, বালক সব কিছুর পারে। এটা একেবারে উচ্চ অবস্থার কথা বলা হল, এগুলোই একটু একটু অভ্যাস করতে হয়। অনেকে বলতে পারেন, বাহ্যে গিয়ে হাত ধোয় না, এগুলোকে কি বলবেন? না, এটা হল হিন্দুদের শুচি-অশুচি নিয়ে বিরাট বড় সমস্যা ছিল, এটাই শুচিবাঈ রোগে দাঁড়িয়ে যায়। মায়ের কথা বইত আছে, শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝি নলিনীদির এই শুচিবাঈ রোগ ছিল। শুচিবাঈ একটা মানসিক ব্যাধি, সব সময় হাত ধুচ্ছে, পা ধুচ্ছে।

ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ছেলে, তুমি মা' – এই অভিমান রাখতে চায়। আগে যে মনের কথা বলা হল, যারা ভক্ত তারা এই রেখাটুকু রাখতে চায়। কারণ তাতে ভালবাসাটা ধরে রাখা যায়। যার জন্য ঠাকুর চিরদিন মায়ের সন্তান রূপে থেকে গেলেন। অদ্বৈত যদি শ্রেষ্ঠ হত, তাহলে ঠাকুর কেন মায়ের সন্তান রূপে থাকলেন। শ্রেষ্ঠ বলে কিছু হয় না, এগুলো ভাব। ঠাকুরের অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেল, তারপরেও সেই 'আমি' রাখছেন। কি আমি? ভক্তের আমি।

বলছেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঠাকুরকে কেউ যদি মনে করে, আপনি আমার ভগবান। তাহলে কি হবে? তিনি চাইলে আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দিতে পারেন। কারণ যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে অনেক সময় আমরা একটা ভুল করে বসি; আমরা মনে করি আমি যেমন একটা সত্তা, ঠাকুরও তেমন একটা সত্তা। কিন্তু তা না। আমরা সবাই জুড়ে এক, তিনি সেই বৃহৎ। বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটা ঢেউ, সেই ঢেউতে আমি যেন একটা জলের বুদ্বুদ। সমুদ্রও যা ঢেউও তাই, জলও তাই, জলের

বুদ্বুদও তাই। কিন্তু কোথাও অনেক সময় আমরা একটা ভুল ধারণা করে ফেলি –ঠাকুর যেন একটা বড় জাহাজ, তিনি আমাদের পারে নিয়ে যাচ্ছেন। আসলে জিনিসটা তা না। বস্তুত তিনটে এক, মনের জগতে এই তিন আলাদা হয়ে দেখান। বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান তিনি দিতে পারেন, কিন্তু ভক্তরা চায় না। ঠাকুর আবার অন্য জায়গায় বলবেন, যাঁকে ভালবাসি, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রতি আমার আর দৃষ্টি থাকে না। তখন বিজয় আবার প্রশ্ন করছেন।

বিজয় – যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান?

শ্রীরামকৃষ্ণ – হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তভূমির কথা বলেছি। সপ্তমভূমিতে মন পৌঁছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা – এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কেমন করে বোধ হবে? সে-বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। আমরা এটা অনেকবার আলোচনা করেছি। এই যে ভক্তির কথা বলা হয়, আপনি যেটা সাধনা করছেন, সাধনা করে আপনি ওই স্তরে পৌঁছালেন –এটাকে বলে ভক্তিযোগ। আর জ্ঞানযোগ মানে, যেখানে আপনি একটা একটা করে সব বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। যতই আমরা বিচার করি না কেন, কোনখান থেকে যে দেহাত্মবুদ্ধি এসে যায় বুঝতেও দেয় না।

আপনি কোন সিদ্ধপুরুষকে আদর্শ মেনে সেই আদর্শে চলছেন। জ্ঞানী হলেন, যেখানে তিনি বিচার করে করে অনাত্ম বস্তুকে বাদ দিতে দিতে এগোচ্ছেন। এখানেও সেই একই আদর্শ। যাঁরা ভক্ত, যেমন ঠাকুর, ঠাকুর অবশ্য জ্ঞান ভক্তি দুটোই করেছিলেন, যিনি ভক্ত তিনি দেখেন সব তিনিই হয়েছেন। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন আত্মাই আছেন; আত্মার বাইরে যা কিছু আছে সব নাম-রূপের খেলা।

ধর্ম জীবনে দুটো দৃষ্টিভঙ্গী–একটা হল ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, যেটাকে নিয়ে আমরা এত লম্বা আলোচনা করলাম। ভক্ত দেখেন তিনিই সব হয়েছেন, বা তিনিই সব করেছেন। জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী হল, ব্রহ্মই আছেন, সেই চৈতন্যই আছেন–বাকি সব কিছু নাম-রূপের খেলা। এই যে বজ্জাৎ আমির কথা বলা হল, এবার এই জায়গাতে বজ্জাৎ আমি এসে গেল ভক্ত আমি বা দাস আমিতে। এরপর আসছে আরও একটা আমি, যে আমি দেখছে এই সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে, আমি ওগুলোর কোনটাই নয়, *চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্*। তার মানে দুটো এ্যপ্রোচ এসে যাচ্ছে –একটা হল ভক্তির, আরেকটা হল জ্ঞানের। ভক্তির এ্যপ্রোচে কি হয়? আমি তোমার সন্তান; জ্ঞানের এ্যপ্রোচে হয়, সবটাই নাম-রূপের খেলা, সবটাই সমুদ্রের ঢেউ। জ্ঞানমার্গী বলেন, আমার ঢেউ লাগবে না, আমি সমুদ্রের সাথে এক হতে চাই। আপনি ভক্তির পথ নিচ্ছেন বা জ্ঞানের পথ নিচ্ছেন, দুটো পথের ক্ষেত্রেই থেকে যাচ্ছে সেই একই কথা–আমিটা কোথায়?

ঠাকুর এখানে বলছেন – **আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কই? – এই বোধ কলিতে হওয়া কঠিন**। ঠাকুর এখানে এই যে বলছেন আমি দেহ নই, মন নই –এখানে ত্যাগটা উচ্চস্তরের ত্যাগ। ঠাকুর বারবার অশ্বত্থ গাছের ফেঁকড়ির উপমা দিচ্ছেন, এখানেও এই উপমাটা দিচ্ছেন।

এই যে ঠাকুর বলছেন, আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি। এখানে ঠাকুর দুটো জিনিস বলছেন। জ্ঞানযোগের প্রথম সমস্যা হল, দেহবুদ্ধি যদি থাকে, সহজে ত্যাগের পথ অবলম্বন করা যায় না। জ্ঞানযোগে দ্বিতীয় সমস্যা হল, মানুষের মধ্যে ইমোশান অনেক বেশি থাকে। যাদের ভিতর ইমোশানস আছে, তাদের মধ্যে ভালবাসা থাকে। যাদের ভিতর ভালবাসা আছে, বন্ধুবান্ধবদের ভালবাসা, আপনজনদের ভালবাসা; এনারা যখন সাধনা করেন তখন তাঁরা ঈশ্বরকেও ভালবাসতে চান।

সেইজন্য তাঁদের দ্বারা জ্ঞানযোগের সাধনা হয় না। উপনিষদের যে আদর্শ, যে সাধনাবিধি, সেটা তাঁদের জন্য কঠিন। উপনিষদে দুটোই রয়েছে, তবে নেতি নেটি ভাবটা বেশি পপুলার হয়ে গেছে।

চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি বলার পর ঠাকুর এবার বলছেন – **পঞ্চমভূমি আর ষষ্ঠভূমির মাঝখানে বাচ খেলানো ভাল। ষষ্ঠভূমি পার হয়ে 'সপ্তমভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নামগুণগান করব –এই আমার সাধ। সেব্য-সেবক ভাব খুব ভাল। আর দেখ গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না। 'আমি সেই' এ অভিমান ভাল নয়**। কথামৃতে এই লাইনটা 'আমি সেই' এ অভিমান ভাল নয়, ভাল করে আণ্ডারলাইন করে রাখুন। এই কথার মূল বক্তব্য হল, আপনি নিজেকে আইডেন্টিফাই কিভাবে করবেন, নিজের জীবন কিভাবে চালাবেন। হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাঁরা অনেকদিন ধরে সাধনা করে যাচ্ছেন, তাঁদেরও কিন্তু অনেক এলেমেলো হয়ে যায়।

এরপরই ঠাকুর বলছেন, **দেহাত্মবোধ থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায় আবার নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না**। এগুলোকে নিয়ে অনেক গল্প আছে, ঘটনা আছে, যেখানে মুখে বলে যাচ্ছে, আমি শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু ব্যবহার তার বিপরীত। যেটা এলেমেলো করছে সেটাকে justify করে দিচ্ছে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন বেদান্তী ছিল, সে অনেক উল্টোপাল্টা করতে, ঠাকুর তাকে বলছেন, তুমি এগুলো করছ কেন? সে বলছে, জগৎ মিথ্যা, এগুলোও মিথ্যা। ঠাকুর অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলছেন, তোমার এই বেদান্তে আমি ইত্যাদি করি। এগুলোই হিপোক্রেসি। এই যে ঠাকুর বলছেন, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায় আবার নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না, এই কথাগুলো বলে ঠাকুর সাবধান করে দিচ্ছেন, এগুলো করতে নেই, করলে সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

কিন্তু অমনি ভক্তি করলেই ঈশ্বরলাভ হয়ে যাবে না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগাত্মিকাভক্তি। ঈশ্বরে প্রেম, অনুরাগ না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ঠিক ঠিক ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

প্রেমাভক্তির কথা বলার পর ঠাকুর বৈধী ভক্তিকে নিয়ে বলছেন। বৈধী ভক্তির আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। **এত জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে, এত উপচারে পূজা করতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে –এ-সব বৈধী ভক্তি। এ-সব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগভক্তি আসে**। অনেকে প্রশ্ন করেন, জপ করলে কি হবে? অবশ্যই হবে, অনেকদিন জপ করছেন, জপ করতে করতে প্রেমাভক্তি এসে যায়। **কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে**। ঠাকুরে এখানে বলছেন, সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে; এই সংসারবুদ্ধিটা কি? এই যে আমরা প্রথম থেকে যে আলোচনাটা টেনে আনলাম, সেখানে এটাই বলতে চাওয়া হয়েছে–আপনার আমিত্ব কোথায় আছে? সংসারে আছে। এই সংসারবুদ্ধি, আপনার আমিত্ব যতক্ষণ সংসারে আছে, ততক্ষণ আপনি কিন্তু আধ্যাত্মিক হতে পারবেন না।

কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা-আপনি হয়। যেমন স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের ছিল, শ্রীরাধার ছিল, গোপীদের ছিল। **ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি –যেমন, হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম, আপনি এলে, জপাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী কর্ম কে করবে?** ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এসে গেলে তখন আর বৈধী কর্ম করার আর কি দরকার। তাহলে এখন আমাদের উদ্দেশ্য কি?

যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাস এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকা ভক্তি। ভক্তি থেকে শুরু করে ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ, সেখান থেকে এবার বলছেন, যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা ভক্তি। এই জিনিসটাকে আলোচনা করার জন্য আমরা এত লম্বা আলোচনা করলাম। এই তিনটে – জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ, ভক্তি পথে আবার হয়ে যায় কাঁচা ভক্তি ও পাকা ভক্তি। ঠিক ঠিক ভালবাসা যদি এসে যায়, তবেই পাকা ভক্তি হয়। সেইজন্য বলছেন, যতক্ষণ তাঁর উপর ভালবাসা না আসে ততক্ষণ কাঁচা ভক্তি।

যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ ধারণা করতে পারে না। এই কথাগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না, অনেক প্রশ্ন আসে। কেন ধারণা হয় না? প্রেম নেই বলে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হলে এগুলো মানুষ চটপট বুঝে যায়। **পাকা ভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাচে যদি কালি (Silver Nitrate) মাখানো থাকে, তাহলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না–একটু সরে গেলেই, যেমন কাচ তেমনি কাচ**। ঠাকুর যেখানে যেটা পেতেন সেটাকে উপমা দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। **ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না**।

আমরা মনে করি আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি, ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসা অত সহজ না। বৈধী ভক্তি করতে করতে, লেগে থাকতে থাকতে, তখন ভালবাসা জন্মায়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা যখন জন্মে গেল, তখন শাস্ত্রের কথাগুলো বোঝা যায়। রাজযোগে একটা বর্ণনা আছে, যোগী যখন সাধনা করে অনেকটা এগিয়ে যায়, তারপর একটা সময় আসে যখন সে বলে, আমার যা জানার জেনে গেছি, অর্থাৎ শাস্ত্রের মর্মটা বুঝে নেয়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এক সময় এই ভক্তিকে নিয়েই পড়ে থাকতেন। তিনি আবার প্রশ্ন করছেন -

বিজয় – মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে, তাঁকে দর্শন করতে গেলে ভক্তি হলেই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ – হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

আমাদের এক মহারাজ বলেছিলেন, তখন তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছিল। একবার ওনার পূর্বাশ্রমের কোন বন্ধু জিজ্ঞেস করছিলেন, 'ভাই এতদিন তো সন্ন্যাসজীবনে থাকলে, কি পেলে'? মহারাজ বন্ধুকে খুব সুন্দর বলছেন –'তুমি তোমার সন্তানকে যেমন ভালবাসো, আমি ঠাকুরকে সেইভাবেই ভালবাসি, সারা জীবনে আমার এটাই উপলব্ধি'। এই ভালবাসা, এই প্রেম যখন ঈশ্বরের প্রতি আসে, তখন গিয়ে শাস্ত্র বোঝা যায়, চরিত্র নির্মাণ হয়, জীবনে ভাল কিছু হতে শুরু হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড়, যেটা প্রথমে বলা হল –কাম-ক্রোধের আকার মাত্র থেকে যায়।

এ-ভালবাসা, এ-রাগভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি কিন্তু কলকাতায় কর্মভূমি; কলকাতায় বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি– বিষয়বুদ্ধি –একেবারে যাবে।

বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে হাজার ঘষো, কোনরকমেই জ্বলবে না–কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

শ্রীমতি (রাধিকা) যখন বললেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি, সখীরা বললে, কই আমরা তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি প্রলাপ বোকচো? শ্রীমতি বললেন, সখি –অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে। (বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেরই গানে আছে –প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ, তোমারে কি যায় জানা।

এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকা ভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তাহলে সাকার-নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।

এতক্ষণ যে প্রসঙ্গ চলছিল, সেই প্রসঙ্গটা এবার শেষ হতে চলেছে। আমাদের মনে প্রায়ই যে প্রশ্নের উদয় হয়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরকে সেই প্রশ্ন করছেন।

বিজয় – ঈশ্বরদর্শন কেমন করে হয়?

আমাদের মনে কখন সখন যে প্রশ্ন আসে, বিজয়কৃষ্ণ সেই প্রশ্নই করছেন। তবে একটা ছোট্ট তফাৎ আছে। আমার আপনার মনে এটা একটা কৌতুহল। ঠাকুরের কথায়, বিকারের রোগী বিকারে চেঁচিয়ে ওঠে, বলে এক জালা জল খাবো। কিংবা এই পথে একটু পা দিয়েছি কি দিইনি, সঙ্গে সঙ্গে শেষ কথা নিয়ে বলা শুরু করে দিই।

এটা হয়, অনেক সময় আমাদের একটা কৌতুহল থাকে। বাচ্চা বয়সে কোথাও যাব, ট্রেনে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত, দিল্লী কখন আসবে। আরে দিল্লী কি এমনি আসবে, চোদ্দশ কিলোমিটারের লম্বা রাস্তা। আধ ঘন্টা না যেতে যেতেই বলতে শুরু করতাম, এখনও দিল্লী এলো না, ফালতু ট্রেন একটা, চলো আমরা অন্য ট্রেনে যাই। আমাদের সবারই এই মানসিকতা। যখন আমরা একটা কোন পথে নামি, একটু এগোতে না এগোতেই হাজার রকম কৌতুহল।

রুডিয়ার্ড কিপ্লিংএর নামকরা বই The Jungle Stories, পরে এর উপর টিভি সিরিয়ালও তৈরী হয়েছে। সেখানে বান্দরলোক একটা চরিত্র, ওদের ওই রকম ইচ্ছে, এটা শিখবে, সেটা শিখবে। একটাতে একটু থেকে সঙ্গে সঙ্গে সেটা থেকে মনটা উঠে যাবে, তারপর আরেকটাতে গিয়ে লাগবে। এটা আমাদের পরম্পরাতেই আছে। বানরগুলো এই রকমই হয়, এটা করবে, সেটা করবে, যেমনি কিছু হল না, ওখান থেকে মন উঠে যাবে। আমরা হলাম ঠিক ওই কাহিনীর বান্দরলোক। আমার এখনও মনে পড়লে হাসি পায়, ট্রেনে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন দিল্লী কখন আসবে। দিল্লী এখনও এলো না, তাহলে ট্রেনে কেন বসে আছি, চল নেমে যাই। আমাদের প্রায়ই শুনতে হয় –আপনি এতদিনের সন্ন্যাসী, এখনও ঈশ্বরদর্শন হল না, তাহলে ওখানে আছেন কেন? এভাবে শুধু ঈশ্বরদর্শনই না, কোন কিছুই হয় না।

কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ যখন প্রশ্ন করছেন, সেখানে তিনি কৌতুহলবশতঃ প্রশ্ন করছেন না। এই প্রশ্ন হল একজন সাধকের প্রশ্ন।

আমাদের এক মহারাজ আছেন, খুব পণ্ডিত লোক, অনেক বইটই লিখেছেন। মজা করে গল্প হচ্ছিল। উনি মজা করে বলছিলেন, 'ভাগবতে শুনেছি মরার সময় হরির নাম নিলেই নাকি হয়ে যায়'? আমি বললাম, 'হ্যাঁ আছে'। কথা বলতে বলতে আমি বললাম, 'এগুলো সব অর্থবাদ'। অর্থবাদ মানে – একটা বিদ্যার স্তুতি করা। বেদে অর্থবাদে ভরা, তুমি এই যজ্ঞ করলে স্বর্গে যাবে, এই যজ্ঞ করলে সন্তান হবে, এই যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হবে। ভাগবতের মজা হল, ভাগবত নিন্দা করে বলছেন, বেদে বড্ড বেশি অর্থবাদ করা হয়েছে। কিন্তু আসল জিনিসটা হল–জ্ঞান ভক্তি। অথচ যাঁরা ভাগবত পণ্ডিত, যাঁরা ভাগবতের ব্যাখ্যাদি করেন, তাঁরা জ্ঞান-ভক্তির কথা ছেড়ে নিজেরাই এখন অর্থবাদে নেমে গেছেন। কিন্তু অর্থবাদ যদি না থাকে, এই যে বিভিন্ন ধর্ম বলে, তুমি ধর্ম ঠিক ভাবে পালন করলে মৃত্যুর পর স্বর্গে

যাবে। তুমি দশজনকে যদি মারত পার, মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে যাবে; সবটাই অর্থবাদ। আমাদের যিনি ধর্ম প্রণেতা তাঁর অনুসরণ করলে তুমি স্বর্গে যাবে, এগুলোও অর্থবাদ।

ঠাকুর বলছেন, ছোকড়াদের আমি একটু আঁশধোওয়া জল দিই। একটু না দিলে লোকেরা আসবে না। বিষয়াসক্ত মানুষ বিষয়ে ডুবে আছে। সেখানে যদি বলা হয়, সব ছেড়ে তুমি কৃষ্ণ নামে মত্ত হয়ে যাও, তা কি কখন সম্ভব, বেচারার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে। একটু একটু করে টানা হয়। একটু একটু করতে করতে যখন ঈশ্বরের একটু ভালবাসার আস্বাদ পায়, ঈশ্বরের সেই রস যদি একটু আস্বাদ করতে পারে, তখন তাকে ধীরে ধীরে ত্যাগের কথা শোনান হয়।

বিষয় থেকে সরে একটা দুটো কথা বলছি। আপনারা অনেকেই হয়ত প্রচুর জপ করেন, নিশ্চয়ই করেন। কিন্তু আপনাদের অনেকে আছেন যাঁরা করতে চান কিন্তু পারেন না। কেন পারেন না? কারণ আপনার কাছে এটা মেকানিক্যাল। কিন্তু ঠাকুর যেমন বলছেন, কিছু দিন নির্জনবাস; ঠিক তেমনি যদি ঠিক করে নেন, কষ্ট করে একটি মাস আমি দু-ঘন্টা করে টানা শুয়ে বা চেয়ারে বসে বা আসনে বসে জপ করব। বাড়ির লোকেদের বলে রাখুন, আমরা জীবনে অনেক কিছু করি, আমরা বেড়াতে যাই, ছুটি কাটাতে যাই, একটি মাস আমাকে এটা করতে দাও। সকালে হোক, দুপুরে হোক, রাত্রে হোক, দিনে একবার দু-ঘন্টা টানা জপ করে যাব। আপনারা করুন এক মাস দু-ঘন্টা করে জপ, ধ্যান করতে হবে না, শুধু জপ।

গীতায় বলছেন *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে*, একটা বিষয়ের চিন্তা করতে করতে সেই বিষয়ের প্রতি একটা আসক্তি জন্মে যায়। ঠিক তেমনি হরিনাম করতে করতে দেখবেন তাঁর প্রতি একটা আসক্তি জন্মে যাবে, তখন একটা আনন্দ রস পেয়ে যাবেন। এরপরে জপধ্যান করাটা কঠিন মনে হবে না। ফিজিক্সে বলে লিমিটিং ফ্রিক্শান, কোন জিনিসকে আপনি যদি ঠেলতে চান, প্রথমে ওটা বাধা দেয়, ঠেলা যায় না। একবার যখন সে চলতে শুরু করে দেবে, তারপর আর সমস্যা হয় না। আমাদের বেশির ভাগেরই সমস্যা হল প্রথমটাই চলতে চায় না, প্রথমটা চলছে না বলেই এত সমস্যা। আর এটা তেমন কঠিনও না। কমপক্ষে এক মাস দু-ঘন্টা টানা জপ। আপনি যদি বলেন, মহারাজ এক সপ্তাহ করলে হবে না? না, হবে না; এক মাসটা সব থেকে কম করে বলা হল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বছরের পর বছর সাধনা করেছেন। তিনি ঈশ্বরীয় ভালবাসায় ডুবে রয়েছেন। আজ খুব ঈশ্বরের নাম করেছি, আগামীকাল অন্য কিছু করছি, সংসারের কাজে মজেই আছে, না এভাবে হয় না। এবার তিনি বুঝতে পারছেন ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ, এটা হল সাঁতরে সমুদ্রের পারে যাওয়ার মত। প্রথমে মনে হবে কিছুই না, এটা একটা ডোবা।

একজন বলছে, 'আমি ইংল্যাণ্ড গেছি'। অনেক আগেকার গল্প, এখন অনেকেই ইংল্যাণ্ড যান। 'তুমি ইংল্যাণ্ড কবে গেলে'? 'কেন, এই যে বম্বে গেলাম'। 'বম্বেতে ইংল্যাণ্ড কোথায়'? 'আরে সমুদ্রের এপার আর ওপার'। এভাবে ইংল্যাণ্ড যাওয়া হয় না। পুকুরের এপার-ওপারের মত সমুদ্রের এপার-ওপার হয় না। সেইজন্য ঠাকুরের যেখানেই আলোচনা রয়েছে, যেখানে তিনি এই ধরণের জ্ঞানীগুণীদের সাথে কথা বলছেন, ওগুলো খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। অন্য অনেক জায়গায়, যেমন থিয়েটারওয়ালারা জিজ্ঞেস করছে, ঈশ্বরদর্শন কি রকম। ঠাকুরা ঈশ্বরজ্ঞানের ব্যাপারে কাউকে মজা করে উড়িয়ে দেবেন না। যেখানেই দেখবেন একটু নিষ্ঠা আছে, সেখানেই তিনি ঢালবেন। তবে ভগবান যেমন গীতাতে বলছেন, জ্ঞানীরা আমার সবথেকে প্রিয়, কারণ জ্ঞানী আমার আত্মা। বিজয়ের মত যাঁরা এনারা জ্ঞানী, এনারা ঠাকুরের আত্মা, তাই এনাদের কাছে অধ্যাত্ম জ্ঞানের ভাণ্ডার পুরোটা ঢেলে দিচ্ছেন। জিনিসটা যেমন, তেমনটা দিচ্ছেন। বাচ্চাদের যেমন লালিপপ দেওয়া হয়, একটা মিষ্টি খাইয়ে বাচ্চাদের যেমন ভুলিয়ে দেওয়া হয়, এখানে জিনিসটা তা না। ছোকড়াদের মাছ ধোওয়া জল দেওয়ার মতও না, যেমনটি তেমনটি দিচ্ছেন। আমাদের উপনিষদ দেখুন, গীতা দেখুন; যেমনটি তেমনটি দেওয়া আছে।

কিন্তু যখন ইতিহাস পুরাণে, বিশেষ করে পুরাণে যখন আসে, তখন এটাকে মানুষের মনের মত করে পরিবেশন করা হয়। যেমনটি আছে তেমনটি আর মনের মত পরিবেশন –দুটোরই দরকার আছে। ঈশ্বরদর্শন কেমন করে হয়? এই ছিল বিজয়ের প্রশ্ন। ঠাকুর অতি সহজভাবে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না। ঈশ্বর হলেন সহজ, সহজেরও সহজ, simplest of the simple। সেইজন্যই তো তিনি সর্বব্যাপী। ঈশ্বরই সত্য, এটাও সহজ। ধর্মীয় কথাগুলো অত্যন্ত সহজ। শুনলে মনে হয় কি সহজ, যেন কিছুই না। কিন্তু ধারণা করতে গিয়ে তখন দেখা যায়, জিনিসটা তত সহজ নয়, কারণ আমাদের নিজেদের যে মন, এই মনটাই জটিল। উপনিষদে বর্ণনা আছে, শিষ্যকে গুরু বলে দিয়েছেন তত্ত্বমসি, তুমি সেই; এগুলো ধারণা হয় না। রাজযোগে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন, ঠাকুর তার পূর্বাবস্থার কথা বলছেন –চিত্তবৃত্তি তখনই নিরোধ হয়, যখন চিত্তশুদ্ধি হয়। কারণ শুদ্ধ পবিত্র মন মানে পুরো শুদ্ধ সাত্ত্বিক মন, এই সাত্ত্বিক মন দিয়ে মনের মধ্যে যে ঢেউগুলি উঠছে, এটা আটকানো সহজ হয়, অর্থাৎ সাত্ত্বিক মন দিয়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধ সহজ। অশুদ্ধ মন মানেই চঞ্চল মন, যেখানে কত রকমের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে; গীতাতে এটাই বলছেন, *আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ*, অসংখ্য আশাপাশে আবদ্ধ। এই অশুদ্ধ মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন মনে যে একটা-দুটো ঢেউ থেকে যায়, সেটাকে শান্ত করা খুব সহজ হয়ে যায়।

বলছেন, **কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বক টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বক টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর, আর অমন কাজ করব না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তাহলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর্দর্শন হয়**। আমি ধরে নিচ্ছি, যাঁরা কথামৃত শুনছেন তাঁদের সবারই কথামৃত আগে পড়া আছে, আর নিজের নিজের মত বুঝে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কথামৃত কেন শুনছেন? এইজন্যই শুনছেন, ঈশ্বরীয় কথার সঙ্গ হয়। *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*, ভগবান বলছেন আমাকে কি করে ভক্তি করবে? আমারই কথা বলবে, আমাতেই আনন্দ পাবে। দ্বিতীয়তঃ কথামৃত হল আমাদের যত শাস্ত্র আছে, বেদ, বেদান্ত, গীতা, সবার সার। এত সারতত্ত্বকে বোধগম্য করার জন্য একটু আলোচনা তো করতে হয়। একটু আলোচনা না করলে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব ভিতরে আসবে না, বাইরেই পড়ে থাকবে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভিতরে যতক্ষণ না আসছে, যেমন অতি সাধারণ একটা কথা, যে কজন আপনার শুনছেন, আপনাদের সবারই নিশ্চয়ই বিশ্বাস আছে যে ঈশ্বর আছেন, ঠাকুর আছেন। ঠাকুর আছেন, ঈশ্বর আছেন যদি এই বিশ্বাসটা থাকে তাহলে ঈশ্বরকে নিয়ে আমাদের কোন একটা ধারণাও নিশ্চয় আছে। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের উপর কৃপা করেন, তিনি আমাদের দেখছেন, এই ধরণের কোন একটা ধারণা নিশ্চয় আছে, তাহলে আমরা সবাই ঈশ্বরের দিকে যাই না কেন? তার মানে, এগুলো সব মুখের কথা।

একটা খুব সহজ ঘটনা মনে করুন, রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির স্থাপন করলেন। রানীর কি সুন্দর পরিকল্পনা, মন্দিরে মা কালী আছেন, পাশে বিষ্ণু মন্দির, পশ্চিম দিকে দ্বাদশ মন্দিরে শিব আছেন। পূণ্যতোয়া মা গঙ্গা পাশ দিয়ে প্রবাহিতা। কিন্তু মা কালী হলেন মূল। আমরা ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয় ভাবের কথা বলি ঠিকই, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সবই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানকার পূজারী, পূজার সময় পূজা করেন, আর নিজের মত গান করেন। দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে এখনও পূজা হয়, গান হয়। কিন্তু কেবল ওনারই মনে হল, এই মা কালী কি সত্য? এই কথাগুলি কি সত্য?

ঠাকুরের জীবনী যাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, যাঁরা ভাসাভাসা পড়েছেন, সবারই নজরে কিন্তু এই জিনিসটা আসবে। রানী রাসমণির কি বিশ্বাস ছিল না যে, মা কালী সত্যিই আছেন। ঠাকুরের বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপধ্যায় এমন ধার্মিক লোক ছিলেন যে, ঠাকুর নিজেও তাঁর বাবার প্রশংসা করছেন। তাহলে ঠাকুর কি জানতেন না যে ঈশ্বরই সত্য। আমরা এখানে ঠাকুরকে অবতার রূপে, লীলা রূপে না দেখে

একজন সাধারণ সাধক রূপে দেখছি। যে ভক্ত নয়, সে যখন পড়বে তখন সে জিনিসটাকে কিভাবে দেখবে? এটাই দেখবে –এক ভক্ত পরিবারের, ঈশ্বর অনুরাগী পরিবারের এক যুবকের মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগল, ঈশ্বর কি সত্য, কালী কি সত্য? সেখান থেকে শুরু হয়ে যায় সাধনার জীবন।

তাহলে বাকিরা ওখানে কি করছিলেন? বাকি যাঁরা পূজারীরা ছিলেন, ব্রাহ্মণরা ছিলেন, তাঁরা একটা নিয়ম পালন করছিলেন। এই নিয়ম পালন করা যেটা, এটাকেই বলা হয় ধর্ম। তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা কর হয়, ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন? এটাই তো বলবেন –অবশ্যই আছেন। যে জেহাদীরা বোমা মেরে যাচ্ছে, সুইসাইড বম্বিং করছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারাও বলবে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু যখন ভিতরে ঠিক ঠিক প্রশ্নটা জাগে, ঈশ্বর কি সত্য, সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন, তখন ধর্ম জীবন শুরু হয়। এতক্ষণ ছিল ধর্ম, যতক্ষণ আপনার বিশ্বাস ঈশ্বর আছেন, ততক্ষণ এটা ধর্ম। মনে যখন অত্যন্ত ছোট্ট একটি প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন? শুরু হয় ধর্ম জীবন। পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী প্রায়ই আমাদের সাধুদের বলতেন –ধর্ম আর ধর্ম জীবন, দুটো পুরো আলাদা জিনিস। ধর্ম চলে পুরো বিশ্বাসের উপরে, ধর্ম জন্ম দেয় ধর্মান্ধতাকে। ধর্ম জীবন পুরো আলাদা জিনিস, সমস্ত জীবের প্রতি তখন ভালবাসা জেগে ওঠে।

এই ভাব কিভাবে আসবে? ঈশ্বরের কৃপা না হলে এই ভাব আসে না। আর এই ভাব কার উপর হয়, কেন হয় আমরা জানি না। আমরা এটা জানি যে, আপনি যদি লটারির টিকিট কেনেন, আপনি লটারি পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন। কিন্তু লটারির টিকিট যদি নাই কেনেন, কোন দিন লটারি পাবেন না। ধর্ম জীবনে যদি আপনি থাকেন, আপনাকে ঈশ্বর কৃপা করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। থিয়োরেটিক্যালি আমরা এটা দেখেছি, যাঁরা ধর্ম জীবনে ছিলেন না, তাঁদেরও অনেক সময় তিনি কৃপা করেন; কিন্তু আমরা তো তাঁর ভিতরটা জানি না, তাঁর বাইরেরটা দেখে বলব। তবে সাধারণ ভাবে যেটা দেখা যায়, যাঁরা ধর্ম জীবনে থাকেন, কখন যে তাঁকে তিনি টেনে নেন, কেন টেনে নেন কেউ জানে না; কারুর কাছে কোন উত্তর নেই।

আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি, ঘটনাটার কথা ভাবলেও আমার অবাক লাগে। আমি তখন কলেজের ছাত্র। লক্ষ্ণৌ থেকে আমার নৈনীতাল যাওয়ার ছিল। অনেক আগেকার কথা। তখনকার দিনে ট্রেনে রিজার্ভেশান পাওয়া খুব মুশকিল ছিল। কপাল এমন আমি যে ট্রেনে এসেছিলাম, সেই ট্রেন চব্বিশ ঘন্টা লেটে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেছিল। নৈনীতাল এ্যক্সপ্রেস দিনে একবার করে যেত। আমার রিজার্ভেশান টিকিট মার খেয়ে গেল। এবার আমি সকালে টিকিট কাউন্টারে গেছি। বিশাল লাইন, তারপর প্রচণ্ড গরম। আমি অনেক করে বললাম, 'দেখুন আমার নৈনীতাল যাওয়ার ছিল, কিন্তু ট্রেন এত লেট করেছে যে আমার কানেক্টিং ট্রেন মিস হয়ে গেছে'। অত চেঁচামেচির মধ্যেও দেখছি সেই টিটি কারুর কিছু করছে না, আমার টিকিটটা নিয়ে আমাকে পাঁচটা টাকা দিতে বললেন। তখনকার দিনে রিজার্ভেশান করতে পাঁচ টাকা লাগত। তারপর কি একটা কাগজ দিয়ে দিল। কাগজটা হাতে নিয়ে ভাবছি, কারুরই করছে না, আমারও কিছু করেনি। আমাকে জেনারেল ক্লাশেই যেতে হবে। ওখানে যেতে গিয়ে দেখি, আরে আমার রিজার্ভেশান তো করে দিয়েছে। আমি একটা বার্থ পেয়ে গেছি। আমার কাছে এখনও ওটা একটা রহস্যের। ওই ভিড়ের মধ্যে সবাইকে ভাগিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ আমারটা করে দিল, আর ওই দিনের রিজার্ভেশান, তাও আবার নৈনীতাল এ্যক্সপ্রেসের মত ট্রেনে; কল্পনাই করা যায় না। ঘটনাটা আমার মনে একটা গভীর ছাপ ফেলেছিল। প্ল্যাটফরমে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, লোকে লোকারণ্য, ট্রেনগুলি ভর্তি হয়ে আছে, এত ভিড় যে ট্রেনে ঢোকা যাচ্ছে না। হঠাৎ কে একজন হাত বাড়িয়ে আপনাকে টেনে নিল। আর এবার চলতে লাগল গ্রেট রামকৃষ্ণ এ্যক্সপ্রেস মুক্তির দিকে। এটা তখনই সম্ভব হয়, যখন চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। এখন চিত্তশুদ্ধি জিনিসটা কি?

ঠাকুর খুব সহজ করে বলে দিলেন, কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে। রাজযোগ দুটি জিনিস বলছেন – এক চৈতন্য সত্তা, দুই জড় জগৎ। আত্মা ব্যাতিরেকে সবই জড় – শরীর জড়, ইন্দ্রিয় জড়, মন জড়, সবটাই জড়। যোগশাস্ত্র বলছেন, পুরুষ আর প্রকৃতি, প্রকৃতি মানেই জড়, এই দুজন যখনই পরস্পরের কাছে আসে, চুম্বকের মত এক অপরকে টেনে নেয়। প্রকৃতি মানে নারী না, আর পুরুষ মানে ব্যাটাছেলে না। সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও নারী-পুরুষে ভেদ নেই। অন্যান্য ধর্মে মেয়েরা গোলাম, হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই জিনিস হয় না। তাহলে হিন্দুদের এটা কেন, ওটা কেন? এগুলো সামাজিক, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজে যদি বদমাইশ লোক থাকে, তার জন্য ধর্ম দায়ী না। বদমাইশ লোক চিরদিনই ছিল, সব জায়গাতেই ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। চৈতন্য সত্তা যখন জড়ের সাথে মেলে, তখন তারা এক হয়ে যায়।

এই এক হয়ে যাওয়াটা, এই যে যোগ, জাংশান, যোগের ভাষায় এটাকে বলে অস্মিতা। অস্মিতা হল, যে জায়গাতে পুরুষ আর প্রকৃতির যোগ হয়। এই জাংশান পয়েন্টটাই হল অশুদ্ধির সমস্ত কারণ। পুরুষ আর প্রকৃতির এই যোগ যতক্ষণ আছে, জড় আর চেতনের যোগ যতক্ষণ আছে, তখন একশ ভাগ অশুদ্ধি। যতক্ষণ মন আছে, যতক্ষণ বুদ্ধি আছে ততক্ষণ চিত্ত অশুদ্ধ। চিত্তে কোন চিন্তা যদি থাকে মন অশুদ্ধ থাকবে, সবটাই অশুদ্ধ। যখন মন বুদ্ধির পারে যায়, তখন বলে ধর্ম-অধর্মের পারে, পাপ-পূণ্যের পারে। কারণ মনে যদি পূণ্য আসে, সেটাও কিন্তু অশুদ্ধি। তবে ওই অশুদ্ধিতে, অন্যান্য অশুদ্ধি যেমন একেবারে নোংরা অশুদ্ধি, তার মত অশুদ্ধ না। একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বেলুড় মঠে যে গর্ভগৃহ আছে, অনেকেই গর্ভগৃহের কাছে গিয়ে বাইরে থেকে প্রণাম করেন। ঠাকুর সেখানে সাক্ষাৎ বিরাজমান। বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারীরা রোজ সকালবেলা গর্ভ মন্দিরের ওই বিশাল মেজে বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর দু-মাস করে ডিউট পড়ে, আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, আমাকেও দু-মাস করে তখন ডিউটি দিতে হয়েছে। প্রথমে ঝাঁটা দেওয়া হয়, তারপর পুরো ফ্লোরটাতে জল ছেটানো হয়, ছেটানোর পর পুরো সেই জলটাকে তোলা হয়। জল তোলার পর ন্যাতা দিয়ে মোছা হয়। এরপরে ঠাকুরের পূজোর ফুল এলো। পূজোর ফুল বিশেষ ফুল, ভক্তিমান মহারাজরা ঠাকুরের বাগান থেকে এই বিশেষ পূজোর ফুল তুলেছেন। সেই বিশেষ ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজানো হবে। পূজোর জন্য কিছু ফুল আলাদা রাখা হল। তার একটা ফুল, যত ভাল ফুলই হোক, বিশেষ ফুলই হোক, সেটা ওই ফ্লোরের উপর পড়ে গেল।

আপনারা কল্পনা করুন, পূজারী মহারাজ বসে আছেন, সামনে ঠাকুরের বিগ্রহ, একটা ফুল, তা পদ্মফুলই হোক, জবাফুলই হোক, ফ্লোরে পড়ে গেল। ফুলটাকে এবার কি করা হবে? ঠাকুর সাক্ষাৎ ওখানে বসে আছেন, ব্রহ্মচারী মহারাজেরা বিশেষ ভাবে ফ্লোর পরিষ্কার করে গেছেন, বিশেষ ভাবে পূজার ফুল আনা হয়েছে; আর সেই বিশেষ একটা ফুল ফ্লোরের উপর পড়ে গেল। কি হবে ওই ফুলটার? ওই ফুলটাকে কি সাজানোর জন্য ঠাকুরকে অর্পণ করা হবে, নাকি ওখানেই মেজেতে পড়ে থাকবে? নাকি ওটা পূজাতে লাগবে? যাঁরা ভক্তির ব্যাপারে জানেন, তাঁরা জানেন, ওই ফুলটাকে তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হবে। যে মাটিতে আপনি মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন, আমিও সব কিছু ঠিক থাকলে সকালে একবার গর্ভগৃহের মেজেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করি। যে গর্ভগৃহে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমরা সাধু-সন্ন্যাসীরা নিজেদের ধন্য মনে করি। আমার জীবনে যখনই দুঃখ-কষ্ট আসে, তখন শুধু ঠাকুরের ওই গর্ভগৃহের কথা মনে করে নিজেকে তুলে ধরি।

ওই পবিত্র মন্দিরের মেজেতে পূজোর বিশেষ ফুল পড়ে গেল, সেটাকে তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে। ঈশ্বরদর্শনের পথে শুদ্ধতম ধর্ম, ওটাও অশুদ্ধ, ওটাও অপবিত্র। কেন অশুদ্ধ, অপবিত্র; এই উপমাটা যদি মনে রাখেনে তাহলে বুঝতে পারবেন। যিনি ঈশ্বরদর্শন করতে চাইছেন, ঈশ্বরদর্শনের পথে, সেখানে পূণ্য, ধর্ম সবটাই অশুদ্ধি, যেটাতে চিত্তবৃত্তি হয় সেটাই অশুদ্ধ। সেখান থেকে নামতে নামতে

ওনারা বলেন, এই যে অস্মিতা, এই অস্মিতা থেকে আসে রাগ, দ্বেষ। কোন জিনিসের প্রতি যে ভালবাসা এটাই অনুরাগ, রাগ; বাংলা রাগ না। আর বিদ্বেষ, কোন কিছু থেকে সরে আসার ইচ্ছা। আমরা এটা খুব উচ্চস্তরের কথা বলছি। কিন্তু এটাই যখন নামতে নামতে আমাদের মত মানুষের স্তরে নিয়ে আসা হয়, তখন এটাই হয়ে যায় –কামিনী-কাঞ্চন, খুব হলে নামযশ। আমাকে মানলে না, জানো আমি কে। কামিনী-কাঞ্চন হল চালিকা শক্তি, যেটা আমাদেরকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এটা হল স্থূলতম।

কিন্তু এটাই শেষ না। এরপরেও ঠাকুর কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারের কথা বলবেন। এগুলো চিত্তকে মলিন করে, তবে খুব স্থূল ভাবে। কিন্তু যদি আপনি উপরের দিকে যান সেখানে আছে অস্মিতা, যেখান পর্যন্ত পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ রয়েছে, এর সবটাই অশুদ্ধির কারণ। চিত্তশুদ্ধি মানে, একমাত্র ঈশ্বরচিন্তন। ঈশ্বরচিন্তন বাদে যে কোন চিন্তন; মানুষের মঙ্গল করব, মানুষের সেবা করব; এটাও অশুদ্ধি।

তাহলে সেবা কিভাবে করতে হবে? নারায়ণ জ্ঞানে, শিব জ্ঞানে সেবা করুন। সন্তানকে ভালবাসি–অশুদ্ধি, আমার উপর স্ত্রী-সন্তানের দায়ীত্ব –অশুদ্ধি। সেই সন্তানকে এবার আপনি নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করুন, তখন এটাই শুদ্ধি। একবার করে দেখুন, আপনার বাড়িতে যে সন্তান আছে, সে আপনার সন্তান হোক, আপনার নাতি হোক; তাকে আপনি কম করে তিন দিন মনে করুন, ও আমার বালকৃষ্ণ। একটু মনে করুন, ইনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা আমার গদাই; আর সেই অনুসারে তার প্রতি ব্যবহার করুন। যদি মেয়ে হয় তাহলে তাকে মনে করুন শ্রীরাধা বা সীতা বা মা সারদা, আপনার যেটা খুশী ভাবুন। তিন দিন এভাবে মনে করুন, ঠাকুর আপনার কাছে এই রূপে এসেছেন; আপনি একটু করে দেখুন কি কি হয়, কি রকম হয়। আপনার যে স্বামী আছে, তাঁকে ঠকুর রূপে দেখুন। আপনার স্ত্রী, তাঁকে শক্তি রূপে, মা কালী রূপে দেখুন। মাত্র তিন দিন সত্যিকারের এভাবে দেখুন, করে দেখুন তো কি হয়। যাকে অপছন্দ করেন, যার উপর রেগে আছেন, এমন রেগে আছেন যে, ও মরলে আমার খরচে ওর শ্রাদ্ধ করব, এই রকম বিরূপ মনোভাব যার উপর, সে ছেলে হলে ঠাকুর রূপে, মেয়ে হলে মা সারদা রূপে তাকে দেখুন। কিন্তু আমরা ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের এক কথা, আমি নিজেকে শোধরাবো না। তাতে আমার কি করার আছে, আপনি শুনে যান, আমি শুনিয়ে যাব, একটা আধ্যাত্মিক মনোরঞ্জন হচ্ছে।

আমরা যে অস্মিতার আলোচনা করলাম, গর্ভগৃহে ফুলের কথা আলোচনা করলাম, এগুলো খুব উচ্চস্তরের কথা বলা হল। আমাদের মন কোথায়? কামিনী-কাঞ্চনে, এই সংসারে। যাদের বয়স হয়ে গেছেন, দেখবেন নিজের শরীর ছাড়া কিছু চিন্তা করে না। টাকা-পয়সার অভাব, সেইজন্য আরও বেশি শরীরের কথা ঘুরতে থাকে। এগুলো আপনারা ভাল করেই জানেন, এখানে আলোচনা করার কিছু নেই। জানবেন, যে কোন জিনিস যদি আপনি করতে থাকেন, ওটাই হতে থাকবে। একজনের প্রতি আপনার যদি ক্রোধ থাকে, মনে রাখবেন, এই ক্রোধ কিন্তু বাড়তে থাকবে। আমি আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি, যার ভিতরে একটা কোন স্বভাব আছে, সে স্বভাবটা দমে গেছে। *প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি*, প্রকৃতি তাকে ওই দিকেই টেনে নিয়ে যায়, নিগ্রহ আর কি করে করবে? ক্রোধ থাকলে যেমন ক্রোধ বাড়তেই থাকে, তেমনি আপনি যদি জপধ্যান করতে থাকেন, আপনার জপধ্যান বাড়তেই থাকবে। যেটাই করবেন সেটা বাড়তে থাকবে। আপনি ক্রোধ করে করে কি এমন জায়গায় পৌঁছাতে চান, যেখানে গিয়ে আপনার শরীর থেকে আগুন বেরোতে থাকবে।

আমার টিয়া বইতে এই ধরণের একটা বর্ণনা আছে, সেখানে জেরিজ বলে একটা চরিত্র আছে। ওর দুটো জিনিস বাড়তে থাকে –গালাগাল আর থুতু ফেলা। কোমরের নীচ থেকে তার পুরো পাথর। যেমন যেমন ওরা রাগে, তেমন তেমন পাথর হতে থাকে। হতে হতে পুরোটাই যখন পাথর হয়ে গেল তখন থেমে যাবে, কারণ এখন আর কথা বেরোবে না। আবার যখন মানুষ স্বরূপে আসে, তখন আবার আগের মত শুরু হয়ে যায়। কোন একটা বিষয় পেলেই শুরু হয়ে যাবে, এ ওকে গালাগাল দেবে, সে তাকে গালাগাল দেবে। আমাদের সেই অবস্থা, মাঝখান থেকে আমরা পাথর হয়ে যাচ্ছি। এইসব

আলোচনা শুনে, শাস্ত্র পড়ে যদি একটু চেতনা জাগে, তখন বলতে হয়, হে ঈশ্বর আর অমন কাজ করব না। তবে এই ভাব আসতে সময় লাগে। মন অনেক শুদ্ধ না হলে এই ভাব আসবে না। তবে যে নোংরা কাজে জড়িয়ে আছে সেখানে থাকতে থাকতে একটা সময় মানুষ বুঝতে পারে আমার ভুল হচ্ছে। আচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে বলছেন –যে অজ্ঞানী বিষয়সুখে রমণ করে তার আনন্দ হয়। কিন্তু এই ধর্মকথা শুনে যাঁদের চেতনা হয়েছে, তাঁরা বলেন আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার আমাকে এখনও এই মন্দ কাজ করাচ্ছে, আমি অনুতপ্ত, আমি চাই না যে এরকম হোক।

আগেকার দিনে মানুষ লজ্জাজনক কোন কাজ করলে মুখ ঢেকে নিত। যখন মনে হবে কাউকে মুখ দেখাতে পারছি না, তখন চোখের জল ফেলে কাঁদতে হয়, তাতেই শুদ্ধ হয়ে যায়। এটাই প্রায়শ্চিত্ত থেকে বড় প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ থেকে বড় প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু হয় না। এতে আপনি তো নিজেকে শুদ্ধ করে দিলেন, কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার কথা? ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন –

কিন্তু হাজার চেষ্টা করুন, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। তাঁর কৃপা হতে হবে। কিন্তু আপনি যদি একদিকে নিজেকে শুদ্ধি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, অন্য দিকে প্রার্থনা করতে থাকেন, তখন তিনি কৃপা করবেনই করবেন। আমাদের সমস্যা হল, আমরা প্রচণ্ড রকমের হাভাতে মানুষ। তাঁর কৃপা না হলে তিনি দর্শন দেন না। কেন দর্শন দেবেন, তিনি আলু পটল নাকি! শ্রীশ্রীমাও বলছেন, ঠাকুর কি আলু পটল যে, এত জপ, এত ধ্যান, এত তীর্থ করলে তিনি দেখা দেবেন? টাকা দিয়ে আলু, পটল কেনা হয়, সেই রকম আপনি একটু জপ করলেন, কি ধ্যান করলেন আর ঠাকুর মন্ত্রবিদ্ধ সাপের মত আপনার সামনে এসে হাজির হয়ে যাবেন? তা কি কখন হয়। তিনি দেখা দেবেন কি দেবেন না, তাঁর খুশি। এরপর ঠাকুর আসল গোলমালের জায়গাতে আসছেন।

কৃপা কি সহজে হয়? অহংকার একেবারে ত্যাগ করতে হবে। 'আমি কর্তা' এ-বোধ থাকলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। অস্মিতা আর অহংকার দুটো এক না, পুরো আলাদা। পুরুষ আর প্রকৃতি যে জায়গাতে যোগ হয় বা জড় ও চৈতন্যের যেখানে যোগ, সেখানেই আমিত্বের সৃষ্টি হয়ে যায়। জগতে এমন কোন জিনিস হয় না, যেখানে আমরা নিউট্রাল থাকতে পারি। গীতায় বলছেন, *তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*, যেমনটি আছে তেমনটি ছেড়ে দিলাম, এই জিনিস আমাদের দ্বারা হয় না।

আমাদের এক মহারাজ মজা করে বলতেন, নরেন্দ্রপুরে ছেলেরা পড়াশোনা করে, অভিবাবকরা রবিবার দিন দেখা করতে যেতেন। একবার এক অভিবাবক ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে, 'ওই যে মহারাজ আসেছেন, তোর কি কাজে লাগবে'? ছেলে বলছে, 'না না, আমার কোন কাজে লাগবে না'। মহারাজ ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর উল্টো দিক থেকে আরেকজন মহারাজ আসছেন, দেখিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করছে, 'তোর কি কাজে লাগবে'? কপাল এমন ওদের পিছন পিছন একজন মহারাজ আসছিলেন, তিনি সব ঘটনাটা মজা সহকারে দেখে যাচ্ছিলেন। ছেলে বলছে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি আমাদের পড়ান'। মহারাজকে দেখেই বাবা খুব উৎফুল্ল হয়ে বলছেন, 'মহারাজ আর কি বলব, আমার ছেলে শুধু আপনার কথাই বলে'।

লোকেরা আমাদের কি মনে করে কে জানে, আমরা কি এতই গাধা? সব কিছুতেই আমাদের মনোভাব হল, ধর আর চুষে নাও। কাজে লাগবে না, ফেলে দাও। যেমনটি আছে তেমনটি ছেড়ে দেব, হয় না, আমরা সবটাতেই বিচার করে দেখব এটাকে চুষে নেওয়া যাবে কিনা? যদি না, ফেলে দাও। যদি হ্যাঁ, চুষে নাও। যেমনটি আছে, তেমনটি ছেড়ে তুমি বেরিয়ে যাও, এই জিনিস কিছুতেই আমাদের হয় না। এটাকেই বলা হয় অহংকার। অহংকার মানেই হয়, সংসারে যত বস্তু রয়েছে, যা কিছু রয়েছে, এমন কি নিজের শরীর, নিজের মন, নিজের বুদ্ধি, এগুলোর সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নেওয়া, এটাকেই বলে অহংকার। যতক্ষণ এই অহংকার থাকবে, ততক্ষণ কিছুতেই ঈশ্বর দর্শন হবে না। চিত্তশুদ্ধি দিয়ে চেষ্টা করে করে অহং ভাবটা যায়।

ঠাকুর এই উদাহরণটা খুব সুন্দর দিতেন – **ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ির কর্তাকে যদি কেউ বলে, মহাশয় আপনি এসে জিনিস বার করে দিন। তখন কর্তাটি বলে ভাঁড়ারে একজন রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি করব**! ইদানিং কালে অতটা দেখা যায় না, কিন্তু আগেকার দিনে আমরা দেখেছি, কোথাও যজ্ঞ হলে, বিয়ে হলে কি পৈতে হলে, এই ধরণের কোন অনুষ্ঠান হলে একজনকে ভাণ্ডারী করে দেওয়া হত, অনুষ্ঠানের সব জিনিসপত্র দেখাশোনা করত। বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি ওদিকে যেতেন না, তিনি একজনকে দায়ীত্ব দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এখানেও যেমন জেনারেল সেক্রেটারী আছেন, ওনাকে যদি কিছু বলেন, উনি বলে দেবেন, ওমুক জায়গায় আমাদের সেক্রেটারী আছেন, ওকে বল, ও করে দেবে। যেমন প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, এনারা হলেন কর্তা, বিভিন্ন যে মন্ত্রীরা আছেন, ওনারা হলেন ভাণ্ডারীর মত। সবাইকে ওনারা দায়ীত্ব দিয়ে রেখেছেন, সেখানে আর হস্তক্ষেপ করেন না, চাইলে করতে পারেন। যতক্ষণ ভাণ্ডারী দায়ীত্বে আছে, ততক্ষণ কর্তা ওখানে হস্তক্ষেপ করবেন না।

যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না। একটা হল, আমিই কর্তা, এই ভাব। আরেকটা হল অপদার্থ, সব কিছুতে বলবে –তিনিই সব করছেন। এখানে অপদার্থদের কথা বলা হচ্ছে না। এখানে তাদের কথা বলছেন, যারা সব কিছু করছে, সমস্ত ক্ষমতা আছে, অথচ আমিত্ব বোধ নেই। আমিত্ব বোধ বলতে এখানে, মন বুদ্ধি থেকে যে আমিত্ব আসে –*যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে,* যার মধ্যে অহংকারের ভাব নেই, যার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে,* সে যদি সমস্ত বিশ্বের লোককে মেরে দেয় তাতেও তার আমি বোধ নেই। অহংকার কিছুতেই যেতে চায় না, কারণ অহংকার মনকে রঙিয়ে দেয়, রঙিয়ে দেওয়ার জন্য জিনিসটাকে জানা যায় না। আমাদের যখন বয়স কম ছিল, যে জিনিসটাকে পুরো জানি না, সেখানে আমরা আমাদের মত বুদ্ধি লাগিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতাম জিনিসটা কি। কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর, জ্ঞান যখন হয়ে যায়, তখন অজ্ঞানটাও সরে যায়। অজ্ঞান সরে গেলে জিনিসটা যেমন তেমনটা দেখা যায়। সেই ঈশ্বর, তিনি এই জগৎরূপে ভাসছেন, তিনি আমাদের সামনে বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, নাতি হয়ে ভাসছেন। কিন্তু অজ্ঞান আমাকে দেখাচ্ছে –এ আমার স্বামী, এ আমার স্ত্রী, এ আমার সন্তান আর ও আমার মিত্র, ও আমার শত্রু, ওকে মারতে হবে, একে ভালবাসতে হবে। এই অজ্ঞান যখন নাশ হয়ে যায়, তখন দেখে, তিনিই তো সব কিছু হয়ে আছেন। খুব স্থূল স্তরে কামিনী-কাঞ্চন; নিজের যে লোভ, মোহ আদি রয়েছে, এর জন্যই আমরা এগোতে পারি না। আরও উপরে গেলে, আমিত্ব আমাদের এগোতে দেয় না।

আমরা সেই ট্রেনের উদাহরণটা আবার নিচ্ছি। আপনার কোথাও যাওয়ার আছে। প্রথমে আপনাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে যেতে হবে, ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে, সব শেষে ট্রেন থেকে কে যেন আপনাকে টেনে নিল। বলবেন, কই মিললো না তো। এতক্ষণ তো আমার চেষ্টা চলছিল। ঠিকই, ওই জায়গাতে আপনার চেষ্টা চলবে না। উপনিষদে আমাদের বড় বড় যত ঋষিরা ছিলেন, সবাই একই কথা বলছেন। তিনি যখন বরণ করবেন, তখনই হবে, তা নাহলে হবে না।

ঈশ্বরদর্শন কেমন করে হয়, আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এরপর ঠাকুর জ্ঞানসূর্য নিয়ে আলোচনা করবেন।

ঠাকুর পরপর কয়েকটা কথা বললেন, প্রথমে চিত্তশুদ্ধির কথা, তারপর বললেন –তিনি যদি কৃপা করেন। চিত্তশুদ্ধি নিয়ে লোকেরা প্রায়ই এই ভুলটা করেন, যেমন আমরা মনে করি প্রার্থনা করলেই সব হবে। সবাইকে আমরা বলি প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করে যাও। আমিও মজা করে বলি, যখন বাচ্চা ছিলাম, বাচ্চা মানেই শুদ্ধ মন, সেই শুদ্ধ মনে আমরা কত প্রার্থনা করতাম, মাস্টারমশাইয়ের যেন জ্বর হয়ে যায়, খুব বৃষ্টি যেন হয়, তাহলে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। মাস্টারমশাইয়ের শরীর খারাপ হত না, বৃষ্টিও হত না। চিত্তশুদ্ধি হতে হয়, মলিন মনের প্রার্থনাতে কিছু হয় না, ফল দেয় না। এরপর ঠাকুর আরেকটা কথা বলছেন –যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

আমরা এই বাক্যের উপর আলোচনা শেষ করলাম। এখন আমরা যা কিছু আলোচনা করব, এই বাক্যকে অবলম্বন করে আমাদের আলোচনা চলতে থাকবে। আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না, কখন আমরা নিজেকে কর্তা মনে করে বসে আছি। ফলে ঈশ্বরের কৃপা আমাদের উপর আসে না। আমাদের আলোচনায় দুটো জিনিস আসবে, তিনি জ্ঞানসূর্য; দ্বিতীয় আসবে খুব নামকরা আমাদের কথা –ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঠাকুর বলছেন সকলই ঈশ্বরের অধীন। এই দুটো জিনিসকে নিয়ে আমাদের আলোচনা এখন ঘুরতে থাকবে। কিন্তু আমাদের এই বাক্যটাকে মনে রাখতে হবে –যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না, কারণ পুরো জিনিসটা এটাকে নিয়ে ঘুরঘুর করবে।

কৃপা হলেই দর্শন হয়। এটা দুদিকেই –যাঁরা অদ্বৈত সাধনা করেন, তাঁরাও এই জিনিসটা জানেন, আগেও আমরা এই জিনিসটা আলোচনা করতে গিয়ে কঠোপনিষদের কথা বলেছিলাম, রমণ মহর্ষিও এই কথা বলছেন। চেষ্টা করে ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। কারণ চেষ্টা করে যদি ঈশ্বরজ্ঞান হত, যদি জপধ্যান করে ঈশ্বরলাভ হত, তাহলে জ্ঞান একটা কর্মের ফল হয়ে যেত, ঈশ্বরদর্শন আর ঈশ্বরজ্ঞান একই জিনিস। আর যে কোন কর্মের ফল অস্থায়ী হয়। এই ভাবটাকে নিয়ে স্বামীজী অনেকবার খ্রীশ্চান ধর্মকে আক্রমণ করেছেন। এখানে ভাল ভাবে থাকব আর অনন্ত স্বর্গে আমার স্থান হবে, এটা হয় না। কারণ যে কোন কর্মের ফল সীমিত। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান এটাই বলছেন, কর্মের ফল সব সময় অস্থায়ী, সেইজন্য স্বর্গবাসের যে কথা বলা হয়, এই বাস চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু আত্মজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞান বা ঈশ্বরদর্শন আলাদা জিনিস, এটা হল জ্ঞান, কর্ম না। সেইজন্য জ্ঞান আর কর্ম দুটো পুরোপুরি আলাদা। যে জিনিসটাকে জেনে গেলেন, সেই জিনিসটা আর কোন দিন অজ্ঞানে পরিবর্তিত হবে না, এই জ্ঞান কর্ম না। আগুন জিনিসটা কি, একবার জেনে গেলেন, এই জ্ঞান চিরদিন থাকবে। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, কৃপা হলেই দর্শন হয়। ওই জ্ঞান কিভাবে হয় আমরা কেউ জানি না। তবে এটা জানা আছে, চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান হবে না।

তারপরেই বলছেন – **তিনি জ্ঞানসূর্য**। 'জ্ঞানসূর্য' এই কথাগুলো আমাদের সাধারণ মনকে বোঝানর জন্য বলা হয়। আগে আমরা যখন কথামৃত পড়তাম তখন এগুলো পড়ে মনে হত, বাঃ কি সুন্দর কথা। কথামৃত যতক্ষণ পড়ছেন ততক্ষণ সহজ মনে হবে, কিন্তু একটু গভীরে গেলে বোঝা যায় সত্যগুলো কত কঠিন। যে কোন সত্য, সত্য মানেই সহজ। মানুষ দুই প্রকার –সহজ ও জটিল। সত্যও দুই প্রকার –সহজ ও জটিল। সহজ জিনিসটাকে মনে হয়, আহা কত সোজা, কিন্তু যত গভীরে যাওয়া যাবে তত তার কুল-কিনারা পাওয়া যাবে না। জটিল জিনিসকে প্রথমেই মনে হবে বিরাট কিছু, ভিতরে গিয়ে দেখবেন কিছু নেই, ফাঁপা। 'জ্ঞানসূর্য' এটা কোন প্রশংসা করে ঈশ্বরকে বড় করার জন্য বলা হচ্ছে না। এটা একটা অত্যন্ত সাধারণ মৌলিক জিনিস। বেদে বলছেন সচ্চিদানন্দ, যখন সচ্চিদানন্দ বলছেন, তার মানে তিনি চৈতন্য, তিনি জ্ঞানস্বরূপ।

এটাকেই ঠাকুর বলছেন, তিনি জ্ঞানসূর্য। যেমন আলোতে সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায়, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেলে সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায়, যেটা যেমন সেটা তেমন দেখাবে; *ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়ঃ*, সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। এই যে আমি আছি, আপনি আছেন, আমরা সবাই আছি, আমরা তো জগৎকে দেখছি, জগতের ব্যাপারে সবার ভাল আইডিয়া আছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আজ আমরা কত কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সব দেখে-শুনে মনে হয়, আমরা কত এগিয়ে গেছি, আমাদের পূর্বজদের থেকে আমাদের জ্ঞানরাশি কত বেড়ে গেছে। ঠিকই, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভুলে যাচ্ছি, বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাক, ফিজিক্স যতই এগিয়ে যাক, বায়োলজি যতই এগিয়ে যাক, কিন্তু বিজ্ঞানের এই জ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে অল্প একটু আলো। ওই একটু আলোতে জিনিসগুলোকে দেখার মত।

রাতের তারার আলোতে দেখতে গিয়ে কখনো জিনিসটাকে ঠিক দেখব, কখনো জিনিসটাকে ভুল দেখব। অন্ধকার রাতে একটা দড়ি পড়ে আছে, তারার আলোতে কখন ওটাকে দড়ি মনে হবে, কখন সাপ মনে হবে, কখন লাঠি মনে হবে। কিন্তু আপনার যে সব সময় ভুল হবে তা না। অনেক সময় ঠিকও হবে, অনেক সময় ভুলও হবে। আরেকটু পরে আকাশে চাঁদ উঠল, এবার জিনিসগুলিকে আগের থেকে একটু পরিষ্কার দেখা যাবে। কঠোপনিষদে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে –বিভিন্ন লোকে মানুষ সত্যকে কিভাবে দেখে। সেখানে বলছেন, *ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে*, জ্ঞান যখন হয়ে, যখন ব্রহ্মলোকে যায় তখন আলোছায়ার মত একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়।

ঈশ্বরদর্শন যাঁর হয়ে গেছে, তিনি জগৎকে স্পষ্ট দেখেন; ঠাকুর জগৎকে স্পষ্ট দেখছেন, স্বামীজী জগৎকে স্পষ্ট দেখছেন। কারণ ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে, জ্ঞানসূর্যের আলো উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। সূর্যোদয় হয়ে গেছে, এখন আর কোন জিনিস কোথাও আধা আলো, আধা অন্ধকারের মধ্যে নেই, সব কিছু সূর্যের কিরণে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যার জন্য দেখা যায়, আগেকার ঋষিরা যে ধ্যান করতেন, ধ্যান করে চিত্তশুদ্ধ হতে লাগল, যেমন যেমন চিত্তশুদ্ধ হওয়া মানেই তেমন তেমন তাঁর কৃপা আসা। তাঁর কৃপা আসা মানেই জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি পাওয়া।

উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের খুব নামকরা কাহিনী আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে তাঁর গুরুর রাগারাগী হল, যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকে বলে দিলেন, আপনার বিদ্যা আমার আর লাগবে না, এই বলে সব বিদ্যা গুরুকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি সূর্যের উপাসনা করলেন। সূর্য দেবতা যাজ্ঞবল্ক্যকে পুরো বেদের জ্ঞান দিয়ে দিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো শুক্ল যজুর্বেদ। কাহিনীর পিছনে আসলটা আমাদের জানা নেই, পরম্পরায় যেভাবে এসেছে সেভাবেই আমরা জানি যে শুক্ল যজুর্বেদ সূর্য দেবতা থেকে যাজ্ঞবল্ক্য পেয়েছিলেন।

তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কতরকম বিদ্যা উপার্জন করছি। ওই অনন্ত জ্ঞানের একটি কিরণ তাতেই কত বিদ্যা, দেখে আমরা অবাক হই। উনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করেছেন, উনি স্ট্যাণ্ডফোর্ডের প্রফেসর, উনি কেম্ব্রিজ থেকে পোস্ট ডক্ করেছেন, উনি অক্সফোর্ড থেকে পড়াশোনা করা লোক; দেখলেই মাথা নত হয়ে আসে, কত সম্মান করছি। কিন্তু এনাদের মধ্যে তাঁর অনন্ত জ্ঞানের একটি কিরণ পড়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের আরাধনা করতে গিয়ে মাতৃভক্ত কবি বন্দনা করছেন –সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী, যত রকমের বিদ্যা হতে পারে, পরা বিদ্যা, অপরা বিদ্যা, সমস্ত বিদ্যার তিনি স্বরূপিণী।

তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শনলাভ হয়। 'তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন', কথামৃতের এই শব্দগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই শব্দগুলিকে যদি আমরা লক্ষ্য না করি তাহলে অর্থ এদিক সেদিক হয়ে যাবে। 'তিনি নিজে', তার মানে আমাদের দ্বারা হবে না, ওটা তাঁকেই করতে হবে, তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজের মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শনলাভ হয়। উদাহরণ দিচ্ছেন – **সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ওই আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়**। আগেকার দিনে সার্জেন্ট যারা হত, ঠাকুর ইংরাজী অত জানতেন না কিনা, সার্জন বলছেন। তখনকার দিনে ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না, লণ্ঠন নিয়ে চলাফেরা করত সবাই। আত্মা, যোগে যাঁকে পুরুষ বলছেন, তিনি আছেন বলে মনকে আলোকিত মনে হয়, মনে হয় মন যেন চৈতন্য। এই চেতন মন দ্বারা আমরা পুরো জগৎকে জানছি, কিন্তু আত্মাকে জানতে পারব না। যদি আত্মাকে জানতে হয়, তাহলে মনটাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে খুব সুন্দর বলছেন –

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্
আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন।।২/১/১।।

কশ্চিদ্ধীরঃ, ধীর পুরুষের কথা বলছেন। আপনি হরিদ্বারের গঙ্গায় একটা কাঠের উপর যদি বসে যান, প্রবাহমান গঙ্গা নিজেই আপনাকে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগরে নিয়ে চলে আসবে, স্রোতের অনুকূলে আরামসে ভেসে চলে আসবেন। কিন্তু আপনি যদি ঠিক করেন, গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী যাবেন, আপনার দম বেরিয়ে যাবে। যদি কেউ ঠিক করে নেন যে, আমি আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাই, সেটা হবে গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী যাওয়া, আচ্ছা গঙ্গাসাগর অনেকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বেলুড় মঠের গঙ্গা থেকেই না হয় যাত্রা শুরু করছেন। এবার ওই কাঠটাও গেল, সাঁতরে হরিদ্বার পর্যন্ত যেতে হবে। মনে হবে খুব খাটনি। খাটনি কিছু না, খাটনি খুব সাধারণ জিনিস। আধ্যাত্মিক জীবনে খাটনি এমন কোন কিছু না। সমস্যা অনেক গভীর হয়ে যায়। কি রকম? নদীর সঙ্গে সঙ্গে যখন ভেসে যাচ্ছেন তখন আপনার আশেপাশে যে জিনিসগুলো আসছে, যাচ্ছে, সেগুলোকে আপনার মনের মত করে নিতে পারেন। একটা মরা কুকুর ভেসে যাচ্ছে, আপনি লাঠি দিয়ে ঠেলে দিলে মরা কুকুরটা দূরে চলে যাবে। যেগুলো আপনার প্রিয় জিনিস সেগুলোকে কাছে থাকতে দিলেন, অপ্রিয় জিনিসগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন। সাংসারিক জীবনে ঠিক এটাই হয়, প্রিয় জিনিসগুলিকে আমরা কাছে টেনে এনে ধরে রাখি, অপ্রিয় জিনিসগুলিকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিই, একটা কোকুন তৈরী করে নিই আমরা। উল্টোদিকে যখন যেতে শুরু করলেন, তখন পরিস্থিতি পুরোপুরি আপনার বাইরে চলে যায়।

গঙ্গাবক্ষে সাঁতরে আপনি বেলুড় থেকে যেতে শুরু করলেন, উদ্দেশ্য হরিদ্বার। উপর থেকে অনেক কিছুই ভেসে আসতে পারে, এই ব্যাপারে আপনার কোন হাত নেই। কখন কি আসবে আপনার জানা নেই, আসতেই থাকবে, সরাতেও পারবেন না। বৃষ্টি হলে বা বন্যা হলে কত কচুরিপানা ভেসে আসে। স্রোতের অনুকূলে চললে সমস্যা হবে না, কিন্তু বিপরীত ধারায় যদি যান, একটি পানার দল গেল, আরেকটা পানার দল আসছে। এই কারণে লোকেরা ঘাবড়ে যায়, বাবাঃ একটু জপধ্যান করতেই আমার এত ঝামেলা তৈরী হচ্ছে! শুধু আপনার না, এ-পথে পা দিলে সবারই হয়। যারা জপধ্যান করে না, তাদেরও হবে, আজ হচ্ছে না কিন্তু কাল হবে, দশ জন্ম পরে হবে, এই জিনিস সবারই হয়। ঠাকুর কড়াইতে কিছু মাছ ভাজছেন, কিছু মাছ থালাতে রাখা আছে, এগুলোও একটু পরে ভাজা হবে, সব কটাকে ভাজা হবে। বাংলায় প্রবাদ আছে, ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে; তোমাকেও পুড়তে হবে, শুধু তোমাকে না, সবাইকে।

এই যে বলছেন, *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্*, মনকে আত্মা বলে মনে হচ্ছে, শরীরকে যে আত্মা বলে মনে হচ্ছে, সেই আত্মার কথা বলছেন না, বলছেন, *প্রত্যগাত্মন্*, ভিতরে যিনি আছেন। সেই *প্রত্যাগাত্মন্*কে যখন জানতে চায়, তখন *আবৃতচক্ষুঃ*, নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে ঢেকে নেয় আর ভিতরের দিকে চলা শুরু হয়। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, সার্জনকে প্রার্থনা করা। যখন তিনি প্রার্থনা করছেন, যে আলো দিয়ে তিনি সবাইকে দেখছেন, যে আলোতে আমরা পরস্পরকে দেখছি, সেই আলোটা এবার *আবৃতচক্ষুঃ* হয়ে ঘুরে গেল *প্রত্যগাত্মনে*র দিকে। সংসার থেকে মন সরে এলো। তিনি জ্ঞানসূর্য, আলো যেটাতে পড়বে সেটাই স্পষ্ট দেখা যাবে। এবার সে মুখ দেখিয়ে দিল, এই দেখ; ঠাকুর আবার সেই সার্জনের উদাহরণ দিচ্ছেন।

যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

কঠোপনিষদের যে মন্ত্রটা আমরা বললাম, *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূঃ,* যিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি সৃষ্টি করে ইন্দ্রিয়গুলির ভিতর থেকে সংযোগটা কেটে দিলেন, সেইজন্য আমরা বাইরের জিনিস দেখি, ভিতরের জিনিস দেখতে পাই না। যদি ভিতরের জিনিস দেখতে চান, তাহলে ভিতরের দিকে যেতে হবে। তার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। যিনি আপনার ইষ্ট তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারেন, কিংবা আপনার যিনি নিজের আত্মা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন।

ঈশোপনিষদে ব্রাহ্মণ খুব সুন্দর জীবন-যাপন করেছেন, মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর চেতনা একেবারে সজাগ। তিনি সূর্যের উপাসনা করছেন, খুব সুন্দর প্রার্থনা করছেন, *যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি*, তোমার যে কল্যাণতম রূপ মৃত্যুর আগে আমি সেই রূপ দেখতে চাই। কতটা নিয়ন্ত্রণ নিজের উপর, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে, এক্ষুণি তাঁর কাহিনী শেষ হয়ে যাবে, তখনও মনটা পুরো নিয়ন্ত্রণে, ওই অবস্থায় তিনি প্রার্থনা করছেন। আমরা খুব সহজেই বলে দিই, শেষ সময় ঠাকুর ঠিক এসে আমাদের নিয়ে যাবেন; শ্রীশ্রীমাও বলছেন, ঠাকুর তোমাদের নিয়ে যাবেন। একদম ঠিক, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু উদ্দেশ্য হল, মন এমন নিয়ন্ত্রণে থাকবে যে, মৃত্যুর সময় এই ব্রাহ্মণের মত বলতে পারেন –হে ঠাকুর সারাটা জীবন আমি তোমার আরাধনা করেছি, তোমাকে নিয়েই থেকেছি। এই আমার শেষ সময়, আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছে, আমার ইন্দ্রিয়গুলি কর্ম থেকে অবসর নিয়ে শিথিল হয়ে আসছে, এখন তোমার কল্যাণতম যে রূপ, সেই রূপ আমাকে দেখাও।

আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, কিশোরী মহারাজ, গোশালা দেখতেন। পরে বয়স হয়ে যাওয়ার পর বারাসতে থাকতেন। শেষ সময় সেবা প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। সেই সময় ট্রেড ইউনিয়নের লোকেরা স্ট্রাইক করার ফলে সেবা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিত হয়েছিল। বন্ধ হয়ে যাওয়াতে রোগীদের অন্যান্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আমি তখন এন্টালির অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম। আমরা রোজ একবার করে খবর নিতে যেতাম, মহারাজ কেমন আছেন। মহারাজ যেদিন দেহত্যাগ করলেন, তার একদিন আগের ঘটনা আমার এখনও মনে আছে। আমি ওখানে তখন ছিলাম, আমার চোখে দেখা। আমাদের এক মহারাজ ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বলছেন, 'মহারাজ চিনতে পারছেন'? ওনার তখন হুঁশ চলে গিয়েছিল। কোন রকমে চোখটা খুলে দেখলেন, দেখে বলছেন –'আহা, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল'। এই ঘটনাটা আমার ভিতর গভীর ছাপ ফেলেছিল।

করোনার প্রভাবে চারিদিকে কেমন আতঙ্ক, সবাই মনে করছে বিশ্ববাসীর উপর দুর্দিনের কালো ছায়া নেমে এসেছে। কিন্তু কিসের আতঙ্ক? শেষ সময় এই চেতনা যদি না থাকে, *যত্তে রূপং কল্যাণতমম্,* তবে নিশ্চয় এটা দুঃখের কথা। শেষ সময় যদি এই বোধ না থাকে, 'প্রাণ জুড়িয়ে গেল', তাহলে তো অবশ্যই দুঃখের কথা। মৃত্যু এসেছে, তাতে দুঃখের কি আছে, ভালই তো নূতন করে আবার শুরু হবে। এর জন্য নিজের ইষ্টের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয় – হে প্রভু, এই যে তোমার জ্ঞানের আলো দিয়ে আমার মন ইন্দ্রিয় দিয়ে সমস্ত জগৎকে ধারণা করছিল, এবার তুমি এই আলোকে ঘুরিয়ে নিয়ে তোমার মুখের উপর দাও, তোমাকে দেখি। আত্মাই আত্মারই আলো মন দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎকে দেখছে। ফিজিক্সের বুদ্ধিতে আমরা মনে করি এই প্রতিফলন, সেই প্রতিফলন দিয়ে আমরা সব কিছু দেখছি, জানছি; কিন্তু না, এরজন্য চেতনা লাগে। কখন এই বিষয় এলে আমরা বিস্তারে আলোচনা করব, কিভাবে আত্মার চৈতন্য মন দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরে এসে জিনিসটাকে ধরে।

ফিজিক্সে বলে আলোর প্রতিফলন গিয়ে একটা অনুভূতি তৈরী করে, সেখান থেকে আসে জ্ঞান। ফিজিক্স জানে না জ্ঞান কিভাবে হয়। বায়োলজিও জানে না, নিউরোলজিও জানে না, নলেজ কিভাবে হয়। আমরা একটা জিনিসকে কিভাবে জানি, সেটাকে জানার জন্য আগে দরকার চেতনা। চেতনা জিনিসটা কি, তার আবার ওনাদের কাছে ব্যাখ্যা নেই। তুমি মান আর নাই মান, আমাদের কাছে এর ব্যাখ্যা আছে। এই জ্ঞানসূর্য যত যাঁর হৃদয়ে প্রকাশ হবে, তত তিনি সাত্ত্বিক, তত তিনি মহাপুরুষ।

ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্রের চিহ্ন। সন্ধ্যে হলে এখনও আমরা আলো জ্বালাই, ধূপবাতি জ্বালাই। সন্ধ্যে হলে সমস্ত ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিতে হয়, যেখানে দরকার নেই সেখানেও আলো জ্বালিয়ে দিতে হয়। আলো না জ্বালানোটা দারিদ্রের লক্ষণ। **হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হয়। জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না**। হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানের আলো না থাকা মানে, spiritual poverty, যারা আধ্যাত্মিক কাঙাল তাদের হৃদয়ে জ্ঞানসূর্যের উদয় হয়নি।

হিন্দু ধর্মের উদ্দেশ্য, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, আমরা environment তৈরী করি। যেমন ক্ষেত তৈরী করা হয়, তেমনি ক্ষেত তৈরী করে দিলেন। জল, সার, বীজ সব দিয়ে দেওয়া হল। বীজ নিজের মত অঙ্কুরিত হবে। খোল করতালগুলো হল ফ্যাক্টরি প্রোডাক্ট। ডিসিপ্লিন যেখানে থাকে, যেমন ধরুন মিলিটারি, মিলিটারিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়, বিভিন্ন ধর্মে ট্রেনিং দেওয়া হয়, তোমাকে এটাই করতে হবে। বনসাই গাছের মত, সমস্ত ফ্রীডম কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্ম তা না, হিন্দু ধর্ম হল, সে environment তৈরী করে দেয়, তুমি এখন নিজের মত বড় হও। Equality আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সবাইকে খোল-করতাল নিয়ে, গলায় তুলসীর মালা পরে নাচতে হবে, তা না; উদ্দেশ্য হল তোমার growth। রামকৃষ্ণ মিশন তাই করে। তোমাকে মন্ত্র দিয়ে দেওয়া হল, এবার তুমি তোমার নিজের মত বড় হতে থাক। যদি তুমি grow না কর, তুমি একটা আগাছা হয়ে থাকবে, এটা তোমার ব্যাপার। মিলিটারিতে যেমন ট্রেনিং দিয়ে একটা লেভেলে নিয়ে আসা হয়। এটা হিন্দুদের কাজ না, হিন্দুদের এটা ধর্মই না। একটা ট্রেনিং দিয়ে একটা পরিস্থিতির জন্য তৈরী করা হয়, এটা এক রকম। আর একটা স্বচ্ছ environment দিয়ে দিল। তুমি যদি বিশাল বটবৃক্ষ হতে চাও, তোমার ভিতরে যদি থাকে তুমি হতে পার। আর তুমি যদি আগাছা হতে চাও, সেটাও তোমার হাতে। এই হল হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য, ফ্রীডম। ফ্রীডম কিসের জন্য? To grow। ওখানে হিন্দু ধর্ম সাহায্য করবে না, তোমাকে environment তৈরী করে দেবে, ওপর থেকে তোমাকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এরপরে নিজের মত গ্রো করতে হয়।

এটা কিভাবে হয়? এই যে বলছেন, হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য, এই জ্ঞানসূর্যের প্রকাশ যদি না করতে পারেন, তাহলে আধ্যাত্মিক দারিদ্রতা গ্রাস করে নেবে। আর যেখানে ইমোশানালিজম্ থাকে, যেমন অনেকে আমাদের এসে বলে, 'মহারাজ আপনি কি সুন্দর বললেন', এই কথা শোনার পর আমার ইচ্ছে করে মাথাট দেওয়ালে ঠুকে দিই। আমি আপনার আধ্যাত্মিক মনোরঞ্জনের জন্য আছি? আপনার কি পরিবর্তন হচ্ছে? যদি সত্যি পরিবর্তন কিছু হয়, তাহলে পাবলিক প্ল্যাটফরমে জানাবার কি দরকার? গরীব, কাঙালিরা, একটা নূতন জামা কিনলে ওটা গায়ে চাপিয়ে সবাইকে দেখাতে থাকে, বড়লোকরা দেখায় না। আপনার ভিতরে সত্যি যদি কিছু থাকে, ওটা দেখানর কিছু নেই। আপনার হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য আছে, ওই জ্ঞানদীপকে প্রজ্জ্বলিত করুন, ব্রহ্মের স্বরূপকে দেখুন। আমরা এখানে শুধু যে ইনফরমেশান দিচ্ছি, তা না; শুধু যে ব্যাখ্যা করছি তা না। কথামৃতের যে ভাব, ঠাকুর যেটার জন্য এলেন, স্বামীজী যার জন্য এলেন, শ্রীশ্রীমা যার জন্য এলেন; এই ভাবটাকে যদি ধরতে না পারেন, পুরো জিনিসটাই বৃথা হয়ে গেল। ভাবটা যদি ধরতে পারেন, সেটা আপনাকে কাউকে দেখাতে হবে না, লোকেরা নিজে থেকেই আপনার কাছে আসবে। ফুল ফুটলে ভ্রমর আসে, ঘা হলে মাছি আসে, ঠাকুর বলছেন।

আপনি দেখুন আপনার কাছে কারা আসছে, ভ্রমর আসছে, না মাছি আসছে? সংসারের বিষয়ের টানে আপনার কাছে আসছে, নাকি আধ্যাত্মিক টানে আসছে? জ্ঞানসূর্য রূপে এই হল ঈশ্বরের একটি বর্ণনা। এই প্রসঙ্গে এখানেই শেষ। **বিজয় সঙ্গে ঔষধ আনিয়াছেন। ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিবেন। বিজয় এবার বিদায় নেবেন**। সবাইকে সঙ্গে করে তিনি বলরামের নৌকাতে উঠে বসলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাবুরাম প্রভৃতির সঙ্গে, ফ্রি উইল সম্বন্ধে কথা – তোতাপুরীর আত্মহত্যার সঙ্কল্প

এখানে বাবুরাম আছেন, সঙ্গে মাস্টার, রামদয়াল প্রভৃতিরা আছেন। ঠাকুর সেখানে এই বলে কথা শুরু করছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –ঈশ্বর সব করছেন, এ-জ্ঞান হলে তো জীবনমুক্ত। এই যে যাঁরা কথায় কথায় ঠকুরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলেন, এনারা তো জীবনমুক্ত। আপনার যদি ঠিক ঠিক মনে হয়, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা; আপনি জীবনমুক্ত হয়ে গেলেন, আপনি তো মহাপুরুষ।

কেশব সেন শম্ভু মল্লিকের সাথে এসেছিল, আমি তাকে বললাম, গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়তে পারে না। স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) কোথায়? সকলই ঈশ্বরাধীন। স্বামীজী তাঁর রচনাবলীতে বারবার এই জিনিসটাকে বলছেন। এখানে ঠাকুর দুটো ঘটনা বলছেন। ন্যাংটা, মানে তোতাপুরীর কথা বলছেন, তাঁর একবার পেটের ব্যারাম হয়েছিল। রোগের যন্ত্রণায় জলে ডুবে মরতে গেছেন। ঠাকুর বলছেন, **রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গঙ্গাতে ডুবতে গেছল। ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া, যত যায় হাঁটু জলের চেয়ে আর বেশি হয় না**। দক্ষিণশ্বরের গঙ্গায় এখনও ভাটার সময় চড়া পড়ে। তখন ফরাক্কা ড্যাম হয়নি, জল আরও কম থাকত। অনেক দূর চলে গিয়ে যখন দেখছেন, সব জায়গায় হাঁটু জল; তখন বুঝলেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় মরতে পারবেন না; তাঁর ইচ্ছে নেই, তিনি ফেরত চলে এলেন। তার থেকেও বড় হল, ঠাকুর নিজের কথা বলছেন, **আমার একবার খুব বাতিক বৃদ্ধি হয়েছিল, তাই গলায় ছুরি দিতে গিছলুম**। ভাবা যায়, যিনি অবতার তিনি নিজের গলায় ছুরি দিতে চাইছেন। আরেকবার হৃদয়ের জ্বালায় অতীষ্ঠ হয়ে গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গলায় ছুরি দেননি। বলছেন, **তাই বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি রথ, তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি – যেমন করাও তেমনি করি'**।

এই যে ঈশ্বরের ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা তার সাথে ঠাকুর তোতাপুরী ও নিজেকে নিয়ে যে দুটো ঘটনার কথা বলছেন, এখানে আমাদের একটু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ অধ্যক্ষ থাকাকালীন সকালবেলায় সাধুরা তাঁকে প্রণাম করতে যেতেন, আধ ঘন্টার মত নানান রকমের আলোচনা হত। একদিন একজন মহারাজ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মহারাজ এই যে ঠাকুরের ইচ্ছা বলা হয়, ঠাকুরের ইচ্ছা মানেটা কি'? মহারাজ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিজে চেষ্টা করে যতদূর গেলে, যাওয়ার পর দেখছ চেষ্টা করেও ফল হল না, বা ফল অন্য রকম কিছু হল, তখন বুঝতে হয় এটা ঠাকুরের ইচ্ছা।

কয়েকটা ক্লাশ আগে বলা হয়েছিল, ঠাকুর বলছেন, যে নিজের কর্তা হয়ে বসে আছে, তার হৃদয়ে ঠাকুর সহজে আসেন না। কিন্তু আমরা সবাই নিজেকে কর্তা মনে করি। এখানে আরও দুটো ঘটনা বলছি, খুব মজার। পিটার নামে যীশুর একজন শিষ্য ছিলেন। যেদিন যীশুকে ক্রুশিফাইড করা হবে তার আগের দিনের রাত্রিবেলার কথা বাইবেলে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। ওদের পাসওভার একটা ফেস্টিভ্যাল ছিল, সেখানে শেষ নৈশভোজ হচ্ছে। যীশু সেখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, তিনি চলে যাবেন, এই আমার শেষ ভোজন এরপর আমি স্বর্গে গিয়ে খাব। নানান রকমের কথা বলছেন। পিটার যীশুকে খুব ভালবাসত। পিটার বলছেন, 'প্রভু, কোন মতেই আমি আপনার সঙ্গ ছাড়ব না। আপনাকে যদি কারাগারে যেতে হয়, আপনার সাথে আমি কারাগারে যাব, মরতে যদি হয়, আপনার সঙ্গে যাব'। যীশু সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'যতক্ষণ তুমি আমাকে তিনবার ডিনাই না কর, (অর্থাৎ আমাকে চেনো না), ততক্ষণ আগামীকাল সকালে মোরগ ডাকবে না, অর্থাৎ সূর্য উঠবে না। তুমি যে বলছ, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, এটাই হবে তার পরীক্ষা'। রাত্রিতে হৈ হৈ পড়ে গেছে, তখন একটি মেয়ে এসে পিটারকে দেখে বলছে, 'আরে আমি তো ওকে যীশুর সঙ্গে দেখেছি'। কি হল পিটারের মনে, পিটার ঘাবড়ে গিয়ে বলছে, 'না না আমি ওনাকে চিনি না'। আবার একজন এসে বলছে, তাকেও বলছেন, আমি চিনি না। আরেকজন এসে বলছে, আবার ওর কথায় পিটার বলছে, 'আমি ওনাকে চিনি না'। যেমনি তৃতীয়বার

বলল ‘না আমি তাঁকে জানি না’, সঙ্গে সঙ্গে মোরগ ডাক দিয়েছে, তার মানে সূর্যোদয় হল। আর পিটারের কি কান্না। ওনারা এটাকে বলছেন, স্যাটার্ন পিটারের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। একেবারেই না। এটাই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা আর স্বাধীন ইচ্ছা। এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা, যীশু ক্রুশিফাইড হবেন। এটা দেখানো হল, এই যে তুমি বলছ, তুমি আমার পাশে থাকবে, আমার কিছু হবে না। তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারছ না, ঠিক আছে, তোমাকে দিয়ে আমি এটা করাব।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে এই ধরণের একটি ঘটনা আমরা পাই। ঠাকুরের তখন মহাসমাধি হতে যাচ্ছে। ঠাকুর মর্ত্যধাম ছেড়ে চলে যাবেন, মা মেনে নিতে পারছেন না। তিনি তারকেশ্বর গেলেন হত্যে দেওয়ার জন্য। সংস্কৃতে এটাকে বলে প্রায়োপবেশন, এই আমি এখানে বসলাম, আমি খাওয়া দাওয়া করব না, অভুক্ত থেকে আমি দেহত্যাগ করব যদি না আমার প্রার্থনা পূরণ হয়। মা ওই রকম তারকেশ্বরে পড়ে আছেন। একদিন হঠাৎ তিনি অনেক হাঁড়ি ভাঙলে যে ধরণের আওয়াজ হয়, সেই ধরণের আওয়াজ শুনতে পেলেন। মা বুঝে গেলেন, তিনি তারকেশ্বর থেকে ফিরে এলেন। ঠাকুর হেসে জিজ্ঞেস করছেন, কি পেলে? ঠাকুর সবটাই জানেন। মা স্বয়ং ভগবতী, তিনিও যখন চেষ্টা করছেন যে আমি আমার প্রাণ দিয়ে ঠাকুরকে বাঁচাবো, তিনি পারলেন না। কেন পারলেন না? এই যে ঠাকুর বলছেন, এটাই ঠিক ঠিক উত্তর –নিজে যে কর্তা হয়ে রয়েছে। আমার যে অহংকার, আমিত্ব, এই আমিত্বই স্বাধীন ইচ্ছাকে পরিভাষিত করে।

এর আগে আমরা আমিত্ব নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করেছি। এই যে বৈজ্ঞানিকরা কত কিছু আবিষ্কার করছেন, এগুলো তাহলে কি? এগুলো তাঁদের বুদ্ধির সাম্রাজ্য। বুদ্ধি যেখানে যেখানে যায়, সেখানে সেখানে ‘আমি’ও যায়। বুদ্ধি যেখানে থাকবে সেখান ‘আমি’ থাকবেই। কিন্তু স্বামী ভূতেশানন্দজী যে ঘটনাটা বললেন বা সেন্ট পিটারের ক্ষেত্রে যেটা হল বা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যেটা হল – একটা জায়গা পর্যন্ত চেষ্টা করে গেলেন, কিন্তু পরে আটকে গেল, তখন বুঝে গেলেন এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আপনারা যদি বুঝতে চান ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তাহলে দেখবেন আপনি সমস্ত চেষ্টা করতে করতে যে জায়গাতে দেওয়ালে এসে পিঠ ঠেকে গেল, বুঝবেন এবারে এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই যে গীতায় বলছেন, *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ,* কে জীবনে দুঃখ পেতে চায় বলুন, আপনি দুঃখকে সরিয়ে রাখার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যারা ড্রাগাসক্ত, তারাও ড্রাগ নিয়ে সুখ পেতে চায়, দুঃখ কেউ পেতে চায় না। তা সত্ত্বেও সবারই জীবনে দুঃখ আসে। আমরা সাধারণ মানুষরা দুঃখে ভেঙে পড়ি। কেন ভেঙে পড়ি? কারণ, আমার আমিত্বটা এত বেশি এগিয়ে রয়েছে যে, যেটা আমার সীমানা সেটা শেষ হয়ে গেল, এরপর আমরা তারও বাইরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, ওটা আমার এলাকা নয়, ওই এলাকাটা হল ঈশ্বরের এলাকা।

তাহলে দুটো এলাকা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আমার একটা এলাকা, ঈশ্বরের একটা এলাকা। এই দুটো এলাকা কি সত্য? যতক্ষণ আমিত্ব আছে ততক্ষণ পুরো সত্য। ঠাকুর এর আগে বলেছিলেন, পুকুরের জলে লাঠি ফেলে দিলে জল দুটো ভাগে দেখায়। ওই ভাগটা আমি, এই ভাগটা তুমি; আসলে কিন্তু দুটো এক, কোথাও কোন বিভাজন নেই। মাঝখানে আমি রূপ লাঠি পড়ে আছে বলে দুটো আলাদা এলাকা দেখাচ্ছে। এই দুটোর জন্য মনে হয়, এটা আমার ইচ্ছা, এটা ঠাকুরের ইচ্ছা। আমার ইচ্ছাকে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা বলছেন, এটা হিপোক্রেসি। যাঁরা জীবনমুক্ত, এনাদের ক্ষেত্রে আমিত্বটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে গুটিয়ে একেবারে জিরোতে চলে আসছে।

একটা বৃত্ত মনে করুন, আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিস খাঁ, এদের বৃত্তটা বিরাট বড়, ওই বৃত্তের মধ্যে মনে করছে আমি এই করছি, আমি সেই করছি। যদি কোন ভাবে কোথাও বাধা পেয়ে আটকে যায়, আমরা তখন বলব, দেখলে তো ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না বলে এটা হল না। কিন্তু যিনি জীবনমুক্ত, যিনি ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, যিনি ঈশ্বরে মন-প্রাণ সব ঢেলে দিয়েছেন, তাঁর ক্ষেত্রে কি হয়? ওই যে বৃত্তটা,

ওই বৃত্ত গুটিয়ে গুটিয়ে একেবারে পয়েন্ট সাইজে চলে এসেছে। ফলে উনি পুরোটাই দেখতে পান; ওই পুরোটা দিয়ে দেখছেন সব ঈশ্বরের ইচ্ছা। এটাকেই ঠাকুর বলছেন –ঈশ্বর সব করছেন এ-জ্ঞান হলে তো জীবনমুক্ত। আবার উল্টোটাও আছে –যিনি জীবনমুক্ত তিনি দেখেন সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

খুব সহজ ব্যাপার, সার্কেলটা হল আমিত্ব, অর্থাৎ আমি কর্তা এই ভাবটা যতদূর যাচ্ছে, ততদূর পর্যন্ত যেন আপনার স্বাধীন ইচ্ছা চলছে। কিন্তু আদপে কি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু আছে? একেবারেই না। বলছেন, এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু নেই, ঠাকুর বলছেন –ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। স্বাধীন ইচ্ছা মানেই যতটা আপনার মনের এলাকা। কিন্তু মনের তো সত্তাই নেই, মনের অস্তিত্বই নেই, কোথা থেকে তার স্বাধীন ইচ্ছা হবে। তার মানে, আমরা যেটাকে স্বাধীন ইচ্ছা বলে মনে করি, এটা একটা কল্পনা মাত্র। জ্ঞানী ভক্ত কবীর দাস এই ভাবকে আধার করে খুব সুন্দর দোঁহা রচনা করেছেন – জব ম্যায় থা হরি নহি থা। আব হরি হ্যায় ময়য় নহি হ্যায়। আমি অর্থাৎ এই আমিত্ব যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ আমি ছিলাম, হরি ছিলেন না; এখন হরি আছেন আমি নেই। তারপরের লাইনে বলছেন, প্রেমগলি অতি সাঁকড়ি, প্রেমের যে গলি তা অত্যন্ত সরু। জা মে দোনো ন সহাঁয়ি, এই গলিতে দুজন একসঙ্গে থাকতে পারে না। আমি আর ভগবান দুই থাকতে পারে না।

তাহলে কেন এই স্বাধীন ইচ্ছার বোধ হয়? প্রথমের দিকে যে জ্ঞানসূর্য আর তার আলোর কথা বলা হল, জীবনে এই আলো নেই। ফলে কি হয়? নাইট ল্যাম্পের আলোতে, খুব ক্ষীণ একটা আলোতে, এমনকি অন্ধকারে আমরা জিনিসগুলিকে দেখছি। আপনি একটা কল্পনা করুন, খুব হাল্কা আলোতে আপনি একটা জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছেন, এখন আশেপাশের জিনিসগুলিকে কিভাবে দেখবেন? আমরা আগে দড়ির উপমা নিলাম, অনেকগুলো দড়ি পড়ে আছে, কখন সেগুলোকে সাপ মনে হবে, কখন লাঠি মনে হবে। তার মানে কখন ওটা ঠিক মনে হবে, কখন ওটা ভুল মনে হবে, কখন আধখানা ঠিক, কখন আধাখানা ভুল মনে হবে। পুরো এই যে জগৎ, এর মধ্যে বিজ্ঞানের যে জ্ঞান আমাদের কাছে আছে, ভূগোলের যত জ্ঞান আছে, মেডিসিনের যত জ্ঞান, যাবতীয় যত জ্ঞান আছে, সবটাই কিন্তু আন্তারাক্কা।

যাঁরা বিজ্ঞান সম্মত নিয়ে কথা বলেন, তাঁদেরকে এই কথাগুলো বললে আপনাকে মারতে চলে আসবে। করোনা নিয়ে কত আর্টিকেল, কত কিছু লিখছে, আমার পড়তে মজা লাগে। কি কি সব সিদ্ধান্ত দিচ্ছে, বলছেন, যেখানে মেয়েরা হেড অফ দি স্টেট সেখানে করোনা কম হচ্ছে। এটা তোমার scientific study হল? বলছেন, ষাটের উপর বয়স্কদের করোনার ভয় বেশি। আজকেই রিপোর্ট এসেছে শতকরা চুয়ান্ন জন করোনা আক্রান্তের বয়স ষাটের নীচে। এগুলো কি করছ তোমরা, দুমদারাক্কা একটা বলে দিচ্ছ? তার কিছু লাগছে, কিছু লাগছে না, একটা কোন ভাবে লেগে যাচ্ছে। আপনার যদি বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়েন, দেখবেন এনারা কত ভুল ইনফরমেশান দিয়ে রেখেছেন, কল্পনাও করতে পারবেন না। কদাচিৎ কখনও একটা হয়ত লেগে যায়, তখন গলা ফাটিয়ে বলতে থাকবে, দেখ দেখ আমরা কি বিরাট কাজ করেছি। সারা বিশ্বে বছরে হাজার হাজার কোটি ডলার শুধু বায়োলজিক্যাল রিসার্চের উপর চলে যাচ্ছে। অথচ কোন ট্রিটমেন্ট নেই, কোন দায়বদ্ধতা নেই। আমাদের সীমান্তে যে সৈন্যরা আছেন, তাঁদের যে এত মাইনে দেওয়া হয়, এত ট্রেনিং দেওয়া হয়, কিসের জন্য? চীন, পাকিস্থান যখন তখন বাঁদরামো করতে পারে, তুমি আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখ।

কিন্তু এখানে তোমার আগে থেকে প্রস্তুতি কোথায় ছিল? কারণ যুদ্ধে লড়াই করা এক জিনিস, জ্ঞান অর্জন করা পুরো অন্য জিনিস। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে মনে করছি, আমরা যাকে জ্ঞান বলে মনে করছি, ওটা হল আলো-আঁধারিতে জিনিসটাকে ধরার প্রচেষ্টা। ধরেছে কিন্তু ঠিক, একটা যখন ঠিক ধরে তার সাথে একশটাকে ওরা ভুল ধরে। ওরা তখন গর্ব করে বলে, আমরা একশটা ভুল করতে পারি, কিন্তু আমরা ঠিক পথে আছি। মায়ার রাজ্যে, এই জগতে কেউ শতকরা একশ ভাগ ঠিক হবে না। বিজ্ঞান একশ ভাগ ঠিক হবে না, ধর্ম একশ ভাগ ঠিক হবে না, দর্শন একশ ভাগ ঠিক হবে না, কেউই

একশ ভাগ ঠিক হবে না। ঠিক হবে একমাত্র সেইখানে, যেখানে জ্ঞানসূর্য এসে গেছে। যার জন্য আমরা দেখতে পাই, যাঁরা ধর্মজগতের লোক, এই বিশ্বের উপর তাঁদের যে প্রভাব, এটাই মানবজাতি দেখেছে যীশুর ভিতর, এটাই দেখেছে ভগবান বুদ্ধের ভিতর, শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর। কারণ এনাদের জ্ঞানসূর্য উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, জ্ঞানসূর্যের আলোতে এনারা জিনিসটা যেমন তেমনটি দেখেন। অন্য কেউ দেখতে পায় না, কোন বৈজ্ঞানিক দেখতে পায় না, কোন কবি দেখতে পায় না, কোন দার্শনিক দেখতে পায় না, আমার আপনার তো প্রশ্নই নেই।

এই যে আলো-আঁধারতে জিনিসটাকে দেখছি, ওটাকেই মনে হয় স্বাধীন ইচ্ছা। দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এটা বুঝতে পারি না, আমরা যেটাকে স্বাধীন ইচ্ছা বলে মনে করছি, ওটাই আমাকে ভুল জ্ঞান দিচ্ছে। এই আমিত্বটা যদি চলে যেত তাহলে ওই অন্ধকারটাও চলে যেত, জিনিসটাকে পরিষ্কার দেখতে পারতাম। যত এই আমিটা যাবে, তত ঈশ্বরের আলোটা বেরোবে। কিন্তু আমিটা এত জোরাল যে, ও কিছুতেই সরতে চায় না, সরানোও যায় না।

অনেক আগে আমি একটা ঘটনা বলে ছিলাম, পোল্যাণ্ডে Ignacy Jan Paderewski নামে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮ই নভেম্বর ওনার জন্ম। এক সময় উনি পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু ওনার আসল পরিচয় –প্যাডেরেস্কি একজন বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক, খুব উচ্চমানের পিয়ানো বাজাতেন। ওনার একটা নামকরা কথা আছে –উনি রোজ পিয়ানোর রেওয়াজ করতেন; বলতেন, ‘একদিন যদি আমি রেওয়াজ না করে থাকি, বাজাবার সময় আমি বুঝতে পারি আজ আমি রেওয়াজ করিনি। দুদিন যদি আমি রেওয়াজ না করি, ক্রিটিকসরা এটা বুঝতে পারেন। তিন দিন যদি রেওয়াজ না করে থাকি, শ্রোতারাও বুঝতে পারেন যে, আমি অনুশীলন করিনি’। আমাদের যে ধর্ম জীবন, এতে একদিন যদি বাদ যায়, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। ঠিক তেমনি দু-দিন যদি ধর্ম জীবনের অনুশীলন বন্ধ থাকে, বিচক্ষণ যাঁরা তাঁরা বুঝতে পারবেন, তিনি দিন যদি ফাঁকা যায়, সমাজ বুঝতে পারবে।

প্যাডেরেস্কি এক সময় আমেরিকা ভ্রমণে ছিলেন। স্ট্যাণ্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে হার্বার্ট হুবার, পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তিনি ওখানকার ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি প্যাডেরেস্কির পিয়ানোর একটা কনসার্ট করাতে চাইছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য এমন সেই রকম টাকা সংগ্রহ করা যায়নি। তিনি গিয়ে প্যাডেরেস্কিকে গিয়ে বললেন –দেখুন আমরা আপনাকে যতটা দেবো বলেছিলাম, দুর্ভাগ্য যে ততটা আমাদের সংগ্রহ হয়নি। উনি হেসে বললেন, ‘না না ঠিক আছে, তোমার নিজেরও তো খরচ হয়েছে, তুমি এই টাকাটা রেখে দাও’। এই ধরণের একটা ঘটনা আছে। প্যাডেরেস্কি বিরাট হৃদয়ের লোক ছিলেন। পরে এমনই কপাল যে, উনি পোল্যাণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার হলেন, আর সেই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন এই হার্বার্ট হুভার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হুভার পোল্যাণ্ডকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। পরে দুজনের একটা সাক্ষাৎকার হয়েছিল, প্যাডেরেস্কি পোল্যাণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার রূপে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হুভারকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করার জন্য। হুবার্ট তখন বলছেন, ‘না না ধন্যবাদ জানাবার দরকার নেই। আপনি আমাক চিনতে পারবেন না; এক সময় আমি স্ট্যাণ্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম, সেই সময় এক বিরাট বড় সমস্যা থেকে আপনি আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন, যা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। আমি আপনার দেশের জন্য যা করেছি সেটা সেই তুলনায় কিছুই না’।

প্যাডেরেস্কির আর-একটি খুব সুন্দর ঘটনার বর্ণনা আছে। খুবই মার্জিত, নম্র ও নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমেরিকার এক শহরে ওনার একটা কনসার্ট হবে। সেই শহরে একটা বাচ্চা তার মায়ের কাছে পিয়ানো বাজানো শেখে। সবে সে ‘টুইঙ্ক্যাল টুইঙ্ক্যাল লিটল স্টার’ পিয়ানোয় বাজাতে শিখেছে। ওই শহরে পৃথিবী বিখ্যাত পিয়ানো বাদক প্যাডেরেস্কির প্রোগ্রাম হবে, ভদ্রমহিলা ছেলেকে প্রোগ্রামে

নিয়ে গেছেন। বাচ্চা ছেলে, অডিটোরিয়ামের স্টেজে কিভাবে কিভাবে চলে গেছে। আর ওখানে পিয়ানোটা রাখা ছিল। ওনার প্রোগ্রাম শুরু হবে। স্টেজের পর্দা সরে যাচ্ছে। বাচ্চাটি ওখানে পিয়ানোতে বাজাতে শুরু করেছে টুইঙ্ক্যাল টুইঙ্ক্যাল লিটল স্টার। প্যাডেরেস্কিও ইতিমধ্যে স্টেজে পৌঁছে গেছে, গিয়ে দেখছেন বাচ্চাটি পিং পাং করে বাজিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির মা ওই দেখে প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে গেছে, দুশ্চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। উঠে গিয়ে যে বাচ্চাকে নিয়ে আসবেন, সেটাও পারছেন না। প্যাডেরেস্কি যে কত বড় একজন গ্রেট মানুষ, এখানেই বোঝা যায়। উনি বাচ্চাটাকে পিছন দিক দিয়ে ঘিরে ফেললেন আর ওনার দু-হাত দিয়ে পিয়ানোতে ওনার যেটা বাজানোর কথা সেটা বাজাতে শুরু করলেন। উনি বাজাচ্ছেন, বাচ্চাটাও ওর মাঝখানে পিং পাং করে যাচ্ছে। উনি নিজের মত বাজিয়ে প্রত্যেক বার শেষ করছেন বাচ্চাটির বাজানো টুইঙ্ক্যাল টুইঙ্ক্যাল লিটল স্টার দিয়ে, নিজের সৃষ্টি করা সুরটাকে বাচ্চার বাজানোর সুরে মিলিয়ে দিচ্ছেন।

একটা সময় প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেল। সব শ্রোতারা দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করছেন। করতালি থেমে যাওয়ার পর উনি বলছেন, 'দেখলেন বাচ্চাটা কি সুন্দর বাজালো'! আর দেখে কে, হল করতালিতে আবার ফেটে পড়ল। সব কিছু ঈশ্বরই করেন, দেখে মনে হয় আমরা করছি। তিনি একটু পিঠটা চাপড়ে বলবেন, বাঃ তুমি কি সুন্দর কাজ করেছ। সবটাই তাঁর ইচ্ছাতে হয়, একশ ভাগ তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু যতক্ষণ আমিত্বের নাশ না হয়, ততক্ষণ যদি বলেন –সব তাঁর ইচ্ছা, পুরোটা হিপোক্রেসি। ঠাকুর বলছেন –এরা নিজেকে ঠকায় পরকেও ঠকায়। যতক্ষণ আমিত্ব আছে ততক্ষণ 'সব তাঁর ইচ্ছা' বলতে নেই। আপনার চেষ্টার বাইরে যেটা। চেষ্টার বাইরে কি রকম? ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসী তালগাছ থেকে পড়বে কোন হাত-পা নাড়বে না, কোন চেষ্টা নেই, আমিত্ব জিরোতে চলে গেছে। রক্ষা করতে হলে তিনি করবেন।

আজকে আমাদের একজন পরিচিত ছেলে, টুকটাক সাহায্য করে দেয়, আমাকে বলছে, 'লকডাউনে আপনার তো খুব অসুবিধা হয়ে গেল'। তাকে আমি হেসে বললাম, 'দেখো বাপু, আমি ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছি, ঠাকুরই দেখছেন, যা দরকার ঠাকুরই জোগার করে দেবেন। যদি জোগার না হয়, তার মানে আমার দরকার নেই। যদি জোগার না হয়, কিন্তু দরকার আছে, না থাকার জন্য অসুবিধা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে; তাহলে আমাকে বুঝতে হবে এটা আমার জন্য তপস্যা, আমার জন্য এটা প্রায়শ্চিত্ত। তাই বলে মনে দুঃখ আসবে, কোন প্রশ্নই নেই'। এগুলো আমাদের বুঝতে হয়, আস্তে আস্তে এগুলোকে ধারণা করতে হয়।

এই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা আর স্বাধীন ইচ্ছা। ওখানে বাবুরাম আছেন, বাবুরামকে দেখে ঠাকুর বলছেন, **মা ওকেও টেনে নাও। ও অত দীনভাবে থাকে, তোমার কাছে আসা-যাওয়া করছে**। দীনভাবে থাকে মানে, আমিত্বটা কমে গেছে।

দক্ষিণেশ্বরে ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কথা চলছে। এই পরিচ্ছেদ অনেক লম্বা চলছে। এর মধ্যে ঠাকুর অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্যে ঠাকুরের আবার ভাবও হয়ে গেছে। আমরা এই পর্বের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি।

ঠাকুর ভাবে বলছেন, মা ওকেও টেনে নাও। ও অত দীনভাবে থাকে, তোমার কাছে আসা-যাওয়া করছে। মাস্টারমশাই নিজের থেকে যোগ করছেন, **ঠাকুর ভাবে বাবুরামের কথা কি বলিতেছেন?** আমাদের মেনে নিতে হয়, উনি ঠিকই লিখেছেন। ভাবে এই কথা বলার পর আস্তে আস্তে ভাব থেকে নেমে আসছেন। নেমে এসে ঠাকুর এবার সমাধির কথা বলছেন। **রাত্রি ৮টা ৯টা হইবে। ঠাকুর সমাধিতত্ত্ব বলিতেছেন। জড়সমাধি, চেতনসমাধি, স্থিরসমাধি, উন্মনাসমাধি**। আগে আমরা এর ব্যাখ্যা করেছিলাম। করে থাকলেও আবার বলতে অসুবিধা নেই। আমি আগেও অনেকবার অনুরোধ করেছি,

আমাদের পুরনো লেকচারগুলো ফাঁকা থাকলে বাজিয়ে শুনবেন। ঠাকুরের কথা অমৃত সমান। মিছরির রুটি আড় করে খাও, সিধে করে খাও মিষ্টিই লাগবে। ঠাকুরের কথা যেখান থেকেই শুনুন ভাল লাগবে।

সমাধির কথা বলতে গিয়ে প্রথমে জানা দরকার বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায় সাধনা কিভাবে করতে হয়, এগুলোকে নিয়ে অনেক লেখা, কথা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সাধনা কিভবে হয়, এর উপর সুফি সম্প্রদায়, খ্রীশ্চান সম্প্রদায়, বৌদ্ধদের সম্প্রদায়, আর হিন্দুদের তো আছেই, এনারা অনেক কথা বলে গেছেন। কিন্তু সিদ্ধি জিনিসটা, যেটাকে আমরা সমাধি বলি, এই জিনিসটার উপর বেশি আলোকপাত নেই। খ্রীশ্চান পরম্পরায় তাঁদের কিছু সাধক ছিলেন, খ্রীশ্চানদের বইতে তাঁদের অনেক কথা পাওয়া যায়, কিন্তু খুব বেশি না।

আল গাজালি নামে মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন বিরাট পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। তিনি সাধনা, ধ্যান, সমাধি নিয়ে অনেক রিসার্চ করেছিলেন। সেখানে তিনি মুসলিম পরম্পরায় কিভাবে সাধক ধ্যানের গভীরে যায়, এগুলোকে নিয়ে লিখেছেন, ওনার কথা আবার মুসলিমরা মানত না। মুসলমানরা প্রায়ই তাঁকে জেলে বন্দী করে রাখত। উনি যখন জেলে থাকতেন তখন ধ্যান করতেন, জেলের বাইরে যখন থাকতেন, তখন পড়াশোনা করতেন; পীর, সন্ত-মহাত্মারা ছিলেন, তাঁদের কথা শুনতেন, নোটস্ নিতেন। সাধন জীবনের অনেক কিছু ওনার কাছ থেকে পাই। কিন্তু সমাধি জিনিস যেটা, যেটা উচ্চ অবস্থা, এই অবস্থার কথা কোথাও আমরা পাইনা। যাঁদের সমাধি হত, তাঁরা কিছু বলতেন না। যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা কেউ কেউ এই মহাপুরুষদের কথা শুনে লিখেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, ঠাকুর অনেক ভাবের সাধনা করেছেন, অনেক ভাবে সমাধিতে চলে যেতেন, সেগুলো আবার বিভিন্ন জনকে, বিভিন্ন সময়ে বলেছেন। ফলে আমরা কিছু কিছু বর্ণনা পাই। আমি নিজে যেটা ভাল ভাবে বুঝেছি, আমাদের আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা যতটুকু শুনেছি, আর যেটা আমি ধারণা করতে পেরেছি, সেগুলোকেই আমি ব্যাখ্যা করি। তার বাইরে যা কিছু বলি, সেখানে আমি বলেই দিই যে, এটা বইয়ের কথা, আমার বিস্তারে জানা নেই। স্বাভাবিক ভাবে বলতে গেলে সমাধির ব্যাপারে আমার কোন আইডিয়া নেই। সমাধি হয়ে থাকলে আমি আর এখানে লেকচার দিতাম না। এখানে সমাধির যে কথাগুলো আছে, এর কোন ধারণা নেই। তাই আপনাদের হাতজোড় করে বিনতি করছি, এটা নিয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না। কারণ জিনিসটা খেলো হয়ে যাবে, উচ্চ জিনিসকে নিয়ে কক্ষণ খেলো করতে নেই, নিজের শ্রদ্ধার হানি হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এটা বৈষ্ণব অপরাধ বলে, এই অপরাধের কোন মার্জনা নেই। ঠাকুর যেমন ব্যঙ্গ করে বলছেন, সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন।

কথামৃত খুঁটে খুঁটে দেখলে দেখা যাবে ঠাকুর সমাধি নিয়ে অনেক কিছু বলছেন। কোথাও মহাবায়ু উপরের দিকে ওঠা নিয়ে বলছেন, যেমুন এর আগে কুণ্ডলিনী ওঠা নিয়ে বলছিলেন। সমাধি নিয়ে ঠাকুর যে কথাগুলো বলেছেন, আমরা অন্যান্য বইতে সত্যি পাই না। যোগদর্শনে সবিতর্ক, সবিচার আদি সমাধি নিয়ে যা বলছেন বা যোগসূত্রে যেসব সমাধির কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হল মন যখন কেন্দ্রিত হয়, তার বর্ণনা। যোগে যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতের কথা বলছেন, ওটাই হল ঠিক ঠিক সমাধি। কিন্তু সাধক যে মতকে অবলম্বন করে সাধনা করেছেন, সাধকের সমাধি সেই অনুসারে হবে। বিভিন্ন মতের জন্য সমাধির প্রকারটাও আলাদা আলাদা হবে। আমরা অনেক সময় ভুল মনে করি যে, সাধনা করে সবারই জ্ঞান একই রকম হবে, সমাধি একই প্রকার হবে, কিন্তু তা হয় না। বৈষ্ণব মতে যে সমাধিগুলো হয়, ওর প্রকার আলাদা। অদ্বৈত মতে বা জ্ঞানমার্গে যে সমাধিগুলো হয়, তা আলাদা। ঠিক তেমনি তন্ত্র মতে যে সমাধি হয়, সেটাও আলাদা, যোগ মতে যে সমাধি হয়, আলাদা হয়। তার কারণ হল, তিনি ঈশ্বরকে যেভাবে দেখেন, বা চৈতন্যকে যেভাবে দেখেন আর এই জগৎকে যেভাবে দেখেন বা মনকে যেভাবে দেখেন, ওই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সমাধি সরাসরি জড়িয়ে আছে।

ঠাকুর সমাধিতত্ত্ব বলিতেছেন। জড়সমাধি, চেতনসমাধি, স্থিতসমাধি, উন্মনাসমাধি। আগেও একবার এগুলোর উপর আলোচনা হয়ে থাকবে, আবার সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। ঠাকুর যে কটি সমাধির কথা বলছেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল জড়সমাধি। জড়সমাধি অনেকটা নির্বিকল্প সমাধির মত বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মত। অদ্বৈত মতের সাধকদের, অর্থাৎ যাঁরা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন, এই অদ্বৈত সাধনার শেষ অবস্থা নির্বিকল্প সমাধি। জ্ঞানীদের নির্বিকল্প সমাধি ও যোগীদের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে একটু তফাৎ আছে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতি থেকে যায়, যদিও প্রকৃতির বাঁধার কোন ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে প্রকৃতি বলে কিছু থাকে না, মায়া বলে কোন কিছু থাকে না। ওই সমাধি অবস্থায় দেখেন, চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই। সমাধি থেকে যখন নেমে আসেন, তখনও দেখেন চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই, বাকি সব নাম আর রূপের খেলা। সমাধিতে চলে যাওয়া মানে আমিত্বটা পুরো মিশে গেল। সমাধিতে আমিত্বটা আর থাকে না, নির্বিকল্প সমাধিতেও তাই হয়।

অন্য জায়গায় ঠাকুর ভাবসমাধির কথা বলছেন, এখানে অবশ্য নেই। যাঁরা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁরা কখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যান, যেখানে ঈশ্বর বই আর কিছু থাকে না। সেখানে আমিত্বের লয় হয় ঠিকই, কিন্তু খুব ক্ষীণ একটা আমিত্ব থেকে যায়, যেখানে শুদ্ধ চৈতন্য আর আমিত্ব ভাব, এই দুটোর মাঝখানে একটা ক্ষীণ আবরণ থাকে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে ভালবেসে পুরো এক হয়ে গেছেন, যেখানে ঠাকুর সতীর পতির উপর টানের কথা বলছেন, সেখানেও কিন্তু একটা ক্ষীণ আবরণ থাকে। কিন্তু মনটা পুরো ডুবে রয়েছে ঈশ্বরে –এটাকে বলে ভাবসমাধি। যাঁরা দ্বৈত মতে সাধনা করেন, তার মানে খ্রীশ্চানদের যে পরম্পরা রয়েছে, যেখানে ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠতম মনে করা হয় বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাঁরা আছেন, এনাদের ভাবসমাধি হয়। জড়সমাধি এনাদের কখন হবে না। কোনটাকেই এটা থেকে ওটা শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না। কারণ জড়সমাধির ফল যা হবে, ভাবসমাধির ফল তাই হবে। বিশিষ্টাদ্বৈতে বলেন, আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না। ঠাকুরও এই কথা বলতেন। তার মানে আমি ঈশ্বরের রস আস্বাদ করতে চাই। 'তুমি আমি আমি তুমি' হয়ে গেলে ওই রসের আস্বাদন হবে না।

তারপর বলছেন, চেতনসমাধি। চেতনসমাধিটা খুব জটিল, থিওরেটিক্যালি বুঝতে গেলেও দম বেরিয়ে যায়। কারণ চেতনসমাধি ভাবসমাধিরই একটা রূপ। ভাবসমাধিতে যেমন একটু আমি থেকে যায়, চেতনসমাধিতেও আমি থেকে যায়, ঠাকুর বলছেন, দাস আমি, সন্তান আমি, এই ভাবটা থাকে। এই যে ভাবটা থাকছে, এই ভাব কিন্তু সমাধির পরে থাকছে। ফলে কি হয়, তাঁদের নিত্য ঈশ্বরজ্ঞান, যেমন নিত্যসাকার; ঈশ্বরের উপস্থিতি, ঈশ্বরের সান্নিধ্য তাঁরা সব সময় অনুভব করছেন। তার সাথে অনুভব করছেন, ঈশ্বরের সাথে তিনি নিজে জুড়ে আছেন। আমরা যদি খুব সহজ করে ভাবতে যাই, কেন মীরাবাঈএরও এ-রকম হয়েছিল, তুলসীদাসও তো এ-রকম ছিলেন; এমনকি বড় বড় যাঁরা সাধক ছিলেন, তাঁদেরও তো এ-রকমই হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, চেতনসমাধি সে শুকদেবের হয়েছিল, দেবর্ষি নারদের হয়েছিল। এই মন্তব্যটা খুব জটিল করে দেয়। কারণ শুকদেব, নারদ এনারা এত উচ্চমানের সিদ্ধপুরুষ, সেখানে মীরাবাঈ আদি সিদ্ধ সাধক বা সাধিকার তুলনা করে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। আমি নিজে কিছু বোধ করে থাকতি পারি, কিন্ত এই বোধ আমার ভুলও হতে পারে, সমাধি নিয়ে তো বলার আমার কোন অধিকার নেই। আমি যা বলছি সবটাই কথামৃতকে আধার করে।

আমাদের কোথাও যেন একটা ভাবনা কাজ করে, শুকদেব, নারদ আদি মহর্ষিরা মীরাবাই, তুলসীদাস এনাদের থেকে আধ্যাত্মিক জগতে অনেক এগিয়ে। কেন এগিয়ে, কিভাবে এগিয়ে, এর যদি লজিক বা প্রমাণ চান, আমার কাছে কিছু নেই। সহজাতভাবে আমরা জানি, পবিত্র মন, যে মন ঈশ্বরের ভাবে ডুবে আছে, যে মন সর্বদা ঈশ্বরকে নিয়ে আলোচনা করে, ওই পবিত্র মনই হল গুরু। অমুক আনন্দ, অমুক গিরি, এনারা তো গুরু হন না, গুরু একমাত্র সচ্চিদানন্দই হয়, আর সচ্চিদানন্দের প্রকাশ পবিত্র ও শুদ্ধ মনে। আমি পূজনীয় রাম মহারাজের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। যখনই দেখা হত মহারাজকে একগাদা প্রশ্ন করতাম, উনি সেই বিরক্ত হয়ে এটাই বলতেন –মনকে শুদ্ধ কর, তোমার সব

প্রশ্নের উত্তর ওখান থেকেই আসবে। কামিনী, কাঞ্চন আর নামযশ, এই তিনটেকে যেদিন বাদ দিয়ে দেবেন, শাস্ত্র নিয়ে থাকুন, নিজেই সব উত্তর পেতে শুরু করবেন।

চেতনসমাধি নিয়ে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। কথামৃত পড়লে মনে হবে, এই সমাধি সবার সহজে হয় না। কিন্তু চেতনসমাধির যে বর্ণনা ঠাকুর দিয়েছেন, তাতে মনে হয়ে যেন এই সমাধি হতে পারে। সেখানে তফাৎ তাহলে এটাই হতে পারে –আমরা নিজেরা অনেক সময়, গভীর ভাব, গভীর ভালবাসা দেখে সেটাকে সমাধি বলে মনে করে নিই; এটাকে বুঝতে পারলে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। টিভিতে, ইন্টারনেটের চ্যানেলগুলিতে কত গুরু, কত বাবাজী উপদেশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন, এনাদের কি জ্ঞান আছে? অবশ্যই আছে। এনাদের কি উপলব্ধি আছে? অবশ্যই আছে। সমাধির উপলব্ধি নেই, আছে ভাবের। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, সেই ভালবাসাতে এত ডুবে গেছেন যে, আমরা তাঁকে সন্ত মনে করছি। কিন্তু সমাধি জিনিসটা তা না, আর অত সহজ জিনিসও না। আমরা অনেকেই ইন্টারনেট দেখি, আমিও দেখি; পুরো ইন্টারনেট একটা মিথ্যার জগৎ হয়ে গেছে। ওখানে একটা সাইট আছে, অনেক প্রশ্নোত্তর চলে, মাঝে মাঝে সাইটটা দেখি। সেখানে একজন প্রশ্ন করে জানতে চাইছেন যে, তাঁর মার কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়েছে, তারপর থেকে ওনার অনেক সমস্যার উদয় হয়েছে, কেউ যদি সমাধান দেন তো ভাল হয়। তার উত্তরে একজন লিখছে, কুড়ি বছর আগে একজন এসেছিল কুণ্ডলিনী জাগরণ করাবে বলে, কুড়ি লক্ষ টাকা আমাকে প্রণামী দিয়েছিল। দেখুন মানুষ কতটা নীচে নামতে পারে। যেমন প্রশ্নকর্তা, যে উত্তর দিচ্ছে সেও কত পতিত। একটা কেউ যে বলবে, এভাবে এই জিনিসগুলিকে খেলো করবেন না, সে-রকমও কেউ নেই। তার মার কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়েছে, সেখান থেকে তার মার সমস্যা হয়েছে। আমাদের মঠে কারুর কুণ্ডলিনী জাগরণ হলে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অনেক আগে আমাদের এখানে একজন ছিলেন, সবার আঙুল ধরে পিঠের কোথায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বলতেন, 'দেখো তো এখানে কেমন ফুলো ফুলো মনে হচ্ছে না'? কোন আব-টাব কিছু হয়েছিল হয়ত। 'জানো এটা কি? আমার কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়েছে'। আমাদের তখন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, প্রচণ্ড strict লোক ছিলেন। কি করে ওনার কাছে খবর গেছে, উনি ডেকে পাঠালেন। আসার পর বলছেন, 'কি হে তোমার নাকি কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়েছে'? সেই যে ওনার কুণ্ডলিনী নামল, আমরা আর কোন দিন দেখলাম না যে ওনার কুণ্ডলিনী উঠেছে। আমরা কিভাবে অনেক সময় নিজের মনের মত একটা জগৎ তৈরী করে নিই, সেখানে মনের মত চিন্তা-ভাবনা করে নিয়ে কল্পনা করতে থাকি আমার কুণ্ডলিনী জেগেছে। কিন্তু সব কটা হল মেন্টাল কেস; আর তা নাহলে দ্বিতীয় যেটা হয় –ফ্রডস্।

আমরা এখানে খুব উচ্চমানের কথা বলছি। আমাদের রাজযোগের লেকচারগুলো শুনে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাথে এটাকে কেউ যেন মেলাতে না যান, আমার মনে হয় না যে, মেলানো যাবে। অসম্প্রজ্ঞাত মুক্তি দেবে ঠিকই, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত নির্বিকল্প সমাধি নয়। সেইজন্য যখন যেটাকে নিয়ে চিন্তা করা হয়, তখন ওটাকে নিয়েই আলোচনা করা ঠিক, এর সাথে ওর, ওর সাথে তার মেলাতে নেই।

ঠাকুর স্থিতসমাধির কথা বলছেন। একদিকে রয়েছে জড়সমাধি আরেক দিকে আসছে স্থিতসমাধি। স্থিতসমাধি ভক্তিমার্গের, জ্ঞানমার্গের না। স্থিতসমাধি হল, মন যখন অনেকক্ষণ ঈশ্বরে ডুবে থাকছে। তার মানে, ভাবসমাধির যে কথা বলা হল, এই ভাবসমাধি খুব বেশিক্ষণ থাকে না। চেতনসমাধি হল নিত্যসমাধি, চব্বিশ ঘন্টা থাকছে। যেমন দেবর্ষি নারদ, তিনি লোকলোকান্তর নারায়ণ নারায়ণ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উনি সব সময় দেখছেন ঈশ্বর যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলছেন। এই দৃষ্টিতে যদি নেওয়া হয়, তাহলে স্থিতসমাধি চেতনসমাধির ছোটভাই হবে। ভাবসমাধি আর চেতনসমাধির মাঝখানে স্থিতসমাধি, যেখানে মন অনেকক্ষণ ঈশ্বরে ডুবে আছে। জড়সমাধিতে বলা হল, যেখানে নির্বিকল্প সমাধির মত হয়ে যায়, এখানে ঈশ্বরকে নিয়ে অনেকটা ওই রকম হয়ে যায়।

তার সাথে বলছেন – উন্মনাসমাধি। উন্মনাসমাধি কোন সম্প্রদায় থেকে এসেছে ঠিক জানা নেই। ঠাকুর উন্মনাসমাধিকে বলছেন, ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে একটা জায়গায় চলে এলো, আর সমাধি হয়ে গেল। সাধনা করে যে সমাধিগুলি হয়, উন্মনাসমাধি এই শ্রেনীর না। যোগশাস্ত্রে বিতর্ক, বিচারাদি সমাধিকে যেমন নিম্নস্তরের বলা হয়, উন্মনাসমাধি এই ধরণের কোন স্তরের হবে। আবার বলছি, আমার সে-রকম কোন আইডিয়া নেই। যাঁরা এখান ওখান থেকে পড়ে বা শুনে বলছেন, সেটারও কোন দাম নেই। যদি আপনার অনুভূতি না হয়ে থাকে, এগুলোকে নিয়ে না বলাই ভাল। এখানে কয়েক প্রকার সমাধির কথা এসেছে, এগুলোকে নিয়ে ঠাকুর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বলেছেন, সেটাকেই আমি এক জায়গায় এনে বললাম।

শেষের দিকে ঠাকুর মহাবায়ু ওঠার কথা বলবেন। যখনই এই সমাধিগুলি হয়, তখন অবশ্যই কুণ্ডলিনীর জাগরণ হবে। মহাবায়ুর ওঠা নিয়ে ঠাকুর বলছেন, অনেক সময় মনে হয় যেন পিঁপড়ে হাঁটছে, অনেক সময় মাছের মত সরাৎ সরাৎ করে চলছে, অনেক সময় সাপের মত তির্যক গতিতে মহাবায়ু উঠতে থাকে, কিংবা পাখির মত, এই ডালে বসছে, সেই ডালে বসছে আর তা নাহলে বানরের মত, বানর যেমন এক ডাল থেকে আরেক ডালে ঝাঁপ মারে। সত্যি কথা বলতে, আমরা এর কি বুঝব? আমাদের কোন অনুভূতিই নেই, তাই কিছু বলারও নেই।

আমি যখন নূতন ব্রহ্মচারী, কথামৃতে এ-সব পড়ার পর একজন মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মহারাজ আপনার কুণ্ডলিনী জেগেছে'? উনি খুব হিউমারাস ছিলেন। বলছেন, 'দেখো ভাই, সত্যি কথা বলতে কি, একবার আমার কুণ্ডলিনী উঠেছিল'। শুনে আমি খুব excited হয়ে গেছি। 'মহারাজ, তারপর কি হল'? 'আমি ভাবলাম কুণ্ডলিনী উঠেছে, নিশ্চয় ভাল কিছু হবে। তারপর হঠাৎ আমার মনে হল কুণ্ডলিনীটা নেমে যাচ্ছে। কুণ্ডলিনী ওঠা-নামা করছে দেখে আমার কি মনে হওয়াতে আমার হাতটা পিঠে দিলাম, দেখছি একটা পিঁপড়ে আমার পিঠ দিয়ে উপরে কখন উঠছে, কখন নামছে'। আমি বুঝলাম, উনি নিজের মত বানিয়ে বানিয়ে আমাকে খেলো করার জন্য বললেন। রামকৃষ্ণ মিশনের এই একটা বিরাট ব্যাপার, কোন সন্ন্যাসী ধাপ্পা মারতে পারেন না। তোমার যদি অনুভূতি হয়ে থাকে, ওটা তোমার ব্যাপার। যদি কাউকে এই সম্বন্ধে কেউ বলেছেন, তার মানে তুমি তাকে বোকা বানাতে চাইছ। আপনাদের সবারই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, আপনি কি সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, জানো ব্যাঙ্কে আমার কত টাকা আছে? যাদের টাকা নেই তারা এ-রকম বলতে চায়, যাদের টাকা থাকে তারা কক্ষণ বলে না। এই হলে সংক্ষেপে সমাধি প্রকরণ। এখান থেকে আমরা একটা নূতন টপিকে ঢুকছি, খুব interesting। এখন রাত নটা হয়ে গেছে, ঠাকুর এখনও মাস্টারমশাইদের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন।

সুখ-দুঃখের কথা হইতেছে। ঈশ্বর এত দুঃখ কেন করেছেন? এই যে করোনার প্রকোপ চলছে, এতে সবারই কত কষ্ট পেতে হচ্ছে। আমাদের সন্ন্যাসীদেরও সমস্যা হচ্ছে, আপনাদেরও সমস্যা হচ্ছে। অজানা আতঙ্কে আর কষ্টে মানুষ মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছে, লোকেদের খাওয়া-পরা নেই। কদিন আগে দেখলাম, গোয়াতে না কোথায় সবাই চার্চে গিয়ে সমবেত প্রার্থনা করছে –প্রভু করুণা কর যাতে করোনা বিদায় হয়। এই অংশে মাস্টার কথা বলা শুরু করছেন।

মাস্টার – বিদ্যাসাগর অভিমান করে বলেন, 'ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার! দেখ চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দী করলে; ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে, মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। কি করা যায়? ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে কি করা যায়। ওদের সব বধ কর; তাই কচকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হল না'।

ঠাকুর আগে একবার বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলছেন, কথা বলতে গিয়ে দেখলাম চুনো পুটি বেরিয়ে এলো। চুনোপুটি বেরিয়ে আসা এই শব্দটা ভাল না। পুকুরে মাছ ধরতে গেলে সবাই বড় মাছ ধরতে চায়। কিন্তু পুকুরের জলটাকে খুব ঘেঁটে দিলে পাঁক থেকে ছোট ছোট মাছগুলি উপরে বেরিয়ে আসে। স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ ছিলেন, ওনার সঙ্গে কোন কথা বললে উনি বলতেন, 'দেখছ, তোমার চুনোপুটি বেরিয়ে আসছে'।

চেঙ্গিস খাঁর সম্বন্ধে আপনারা অল্প-বিস্তর অনেক কথাই জানেন। এখন যেটা সেন্টাল এসিয়ার অঞ্চল বলা হয়, ওখানকার ছোট্ট একটা ট্রাইবাল মঙ্গোলিয়ান জাতিতে তার জন্ম। বাবা তাকে তেমন ভাবে গুরুত্ব দেয়নি। ওই ট্রাইবালদের প্রধান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তার সৎভাই। পরে মারামারি খুনোখুনি করে চেঙ্গিস ট্রাইবের মাথায় গিয়ে বসল। তার কিছু দিনের মধ্যেই সে একটা খুব শক্তিশালী মজবুত সৈন্যদল দাঁড় করিয়ে দিল। এই সৈন্যদের নিয়ে সে চারিদিকে লুটতরাজ করতে করতে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে দিল। কয়েকদিনের মধ্যে চীন থেকে শুরু করে তুর্কিস্থান পর্যন্ত একটা বিরাট সাম্রাজ্য পত্তন করে ফেলল। আজ থেকে আটশ বছর আগে সে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করে দিল। প্রচুর মুসলমানদের মেরেছিল। চেঙ্গিস খাঁ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বিজয়ী সম্রাট। নেপোলিয়ন তো তুলনায় অনেক কম, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের থেকেও চেঙ্গিস খাঁর বিজয়ের পরিসংখ্যান বেশি ছিল। চেঙ্গিস খাঁর নাতি কুবলাই খাঁ চীনের জাণ্ডুতে রাজধানী করেছিল। পরে পরে এরা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। সেন্ট্রাল এসিয়াতে খাদ্যের উৎপাদন খুবই কম ছিল, তিব্বতের মত ওদেরও খাবার-দাবার ছিল না। সেইজন্য ওরা চারিদিকে লুঠতরাজ করে বেড়াত, বিশেষ করে চীনে। দুশো বছর ওদের ক্ষমতার শীর্ষে চলে এলো তৈমুর লং। খোঁড়া ছিল, সে নিজেকে চেঙ্গিস খাঁর ঠিক ঠিক উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। তৈমুরের শিল্পকলার দিকে অনেক নজর ছিল। এর বংশজ হল বাবর, যেখান থেকে মোঘল সাম্রাজ্য এবং হুমায়ুন, আকবর আদির বংশধররা এসেছে। বাবর ছিল বাবার দিক থেকে চেঙ্গিস খাঁ, আর মায়ের দিক থেকে তৈমুর লং। সেখান থেকে এসেছে মঙ্গোলিয়ান সাম্রাজ্য, যেটাকে আমরা বলি মোঘল সাম্রাজ্য। চেঙ্গিস খাঁর যে বর্বরতা, সেটা মোঘলদের মধ্যে এসেছিল, আর তৈমুরের শিল্পকলার প্রতি যে প্রীতি, তার কিছুটা মোঘলদের মধ্যে এসেছিল। চেঙ্গিস খাঁ ছিল আগাগোড়া একটা বর্বর। ওর সম্বন্ধে অনেক বই আছে, বইগুলো পড়লে গা শিউড়ে ওঠে। যখনই কোথাও আক্রমণ করত, তখন ও এমন টেকনিকস করে দিত, তারপর প্রচুর ঘোড়া আদি এমন সব ছিল যে, জীবনে কখন সে পরাজিত হল না।

ওর বর্বরতার একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ওর এক বন্ধু ছিল, কোন কারণে সে একটু ওর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। বন্ধুকে ধরে আনার পর বন্ধু এতটুকু শুধু বলল, 'তোমার সঙ্গে রক্ত এক করে আমরা দুজনে বন্ধু হয়েছি'। ট্রাইবালদের নিয়ম ছিল, দুজনে নিজেদের হাতটা একটু কেটে দুজনে হাত ঘষে দিল, এর রক্ত ওর শরীরে ওর রক্ত এর শরীরে মিলে গেল মনে করত। বন্ধু বলছে আমার শরীর থেকে যেন রক্ত না বেরোয়। চেঙ্গিস খাঁ তখন তার লোকেদের বলে দিল, গরুর গাড়ির চাকাতে ওকে উলটো করে বেঁধে দিতে, এমন করে দিল যে রক্ত বেরোবে না, কিন্তু মারা যাবে। তাই হল, ওর যে মেরুদণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে গেল, বন্ধু শেষ। যেখানেই আক্রমণ করত, ওখানে সবাইকে বলে দিত, হয় তোমরা আত্মসমর্পণ কর, তা নাহলে তোমাদের সবাইকে মেরে দেব। আত্মসমর্পণ করলেও মেরে দিত। কত লক্ষ লক্ষ বন্দীদের মেরেছে কেউ জানে না। অনেক সময় সৈন্যদের দেখানোর জন্য যে, মৃত্যুর প্রতি কোন করুণা করবে না। বাচ্চা হোক, নারী হোক, লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিত আর সৈন্যদের বলত, তলোয়ার দিয়ে ওদের মুণ্ডুটা কেটে দাও, এতটাই নৃশংস আর বর্বর ছিল।

বিদ্যাসাগরের কাছে যে ঘটনাটা মাস্টারমশাই শুনেছিলেন, এই কাহিনী আমি কোথাও পাইনি। তবে লক্ষ লক্ষ লোক যে চেঙ্গিস খাঁ মারত, এরা সবাই বন্দি ছিল। সৈন্যদের এভাবে মারত না, সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে মারা যেত। এরপর শহর, গ্রামের লোকদের দাঁড় করিয়ে গলা কেটে দিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এটাকে নিয়ে বলছেন, ঈশ্বর তো এই হত্যালীলা সব দেখছিলেন, কই তিনি তো কিছু করলেন না।

আমাদের বিষয়টা চেঙ্গিস খাঁ না, আমাদের বিষয়টা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের করুণা। তিনি কার উপর করুণা করেন, কেন করেন, এই জিনিসটাকে আমরা একটু সংক্ষেপে দেখে নেব। ঈশ্বরের অবধারণা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানুষ এটাকে কিভাবে দেখে? প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীর একটা হল বেদান্তীদের দৃষ্টিভঙ্গী। কিংবা যারা কর্মবাদকে মানেন। সেখানে বলে, ঈশ্বর কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন না। ঈশ্বর হলেন বিধাতা, বিধাতার কাজ হল, যে যেমন কর্ম করে তাকে তিনি সেই অনুসারে ফল দেন। তিনি আবার সরাসরি দেন না, তিনি আছেন বলে যার যার কর্মের ফল তার তার কাছে পৌঁছে যায়। তার মানে, তুমি প্রার্থনা কর আর প্রার্থনা নাই কর, উনি কোনটাতেই নাক গলাবেন না। ঠাকুরও বলছেন, বেদান্তের যে দৃষ্টি তাতে ঈশ্বর হলেন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, যা কিছু হচ্ছে সব তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে। যাবতীয় যা কিছু নড়ছে, বাতাসের জন্য নড়ছে। গছের পাতাকে বাতাস যেমন নাড়াবে, পাতা তেমন নড়বে। সমুদ্রে বাতাস চলছে, নৌকার যেমন পাল, নৌকা তেমন চলবে, বাতাসের তাতে কিছু আসে যায় না। এটা একটা খুব নামকরা দৃষ্টিভঙ্গী, যেটা হল no will; no will মানে সবটাই তাঁর ইচ্ছাতে চলছে।

সেখান থেকে সরে এসে কিছু কিছু লোক আছে যারা মনে করে, কিছুটা আমার ইচ্ছা, কিছুটা ভগবানের ইচ্ছা। আমরা বেশির ভাগই হলাম এই দলের লোক। বাইরের এক সাধু হিসাব করে বললেন শতকরা ৬৬ ভাগ আমার ইচ্ছা আর বাকি এক তৃতীয়াংশ হল God's will, উনি গাণিতিক হিসাব কষে নাকি এটা বার করেছিলেন। এগুলো হল লোকেদের বোকা বানানোর বুদ্ধি। আরেকটা ধারণা হয়, ঈশ্বর উপরে কোথাও একটা সুপার কম্প্যুটার নিয়ে বসে আছেন, সেখান থেকে তিনি কলকাঠি নাড়ছেন। তিনি ইচ্ছা করলেন আমি হাত নাড়লাম, তিনি ইচ্ছা বন্ধ করলেন, আমার হাতনাড়াও বন্ধ হয়ে গেল। এরা ভক্ত ঠিকই, কিন্তু অধম ভক্ত। বিদ্যাসাগর মশাই ঠিক এই ধারণা নিয়ে চলতেন –রাজা যেমন দিল্লীতে বসে ভারতকে শাসন করছেন, ঠিক তেমনি ভগবান উপরে কোথাও বসে আছেন। তিনি সেখান থেকে সব শুনতে পাচ্ছেন। ঈশ্বরের ধারণা করা খুব কঠিন জিনিস। আগে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন, ভিতরে সোনা চাপা আছে খবর নাই। এই কথাগুলো শুনলে বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর মশাইএর এত পাণ্ডিত্য, ভিতরে এত দয়া, করুণায় তিনি পরিপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাপারে কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না।

তার সঙ্গে আরেকটা ধারণা হল –ঈশ্বরই নেই তার আবার কিসের ইচ্ছা। আজকের দিনের যারা বস্তুবাদী, বৈজ্ঞানিক, তারা এই কথাই বলে। কিন্তু ভগবানকে যাঁরা জানেন, বোঝেন, মানেন, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি এতবার করে বলছেন –তাঁর কৃপা সবারই উপর; তিনি বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হয়। কেন তিনি এই কথা বলছেন? খুব সাধারণ একটা উপমা দিলে বুঝতে পারবেন। বর্তমান কালে আমরা ক্লাশ থ্রী, ফোরে শিখে নিই যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী তাকে প্রদক্ষিণ করছে। এই কথা আমরা সবাই জানি, বাচ্চা বয়স থেকে শিখে আসছি। তাও আমরা রোজ বলি, সূর্য উঠেছে, সূর্য অস্ত গেছে। শুধু আমরাই বলছি না, সারা বিশ্বের লোক বলছে। যে কোন ভাষায় সাহিত্যে কখন লেখা হয় না যে, ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর মুখ এখন সূর্যের দিকে চলে এসেছে। সবাই বলে সূর্যোদয় হল, সূর্যাস্ত হল; অথচ সূর্য একই জায়গায় আছে।

ঈশ্বর ঠিক এই রকম, ঈশ্বরের যে প্রকাশ, ঈশ্বরের যে করুণা, সব সময় আছে। যখন আমার মনের মত সব কিছু হয়; 'আমার মনের মত' শব্দকে মনে রাখবেন, কারণ এই 'আমি ও আমার' যাওয়ার নয়। আমার মনের মত যখন সব কিছু হয়, তখন মনে করি ঈশ্বর আমাকে কৃপা করছেন। যে কোন ব্যাপারে যখন আমার মনের মত হবে না, তখন বলি, 'হে প্রভু তোমার কৃপা থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে'? আমার যদি কিছু ভাল হয়, তখন বলি, 'প্রভু তুমি কত করুণাময়'। আমি যাকে পছন্দ

করি না, তার যদি ভাল হয়, তখন বলি, 'হে প্রভু তুমি কি করে এই অবিচার করলে'? হয়ত বলব, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, প্রভু একদিন ঠিক বিচার করবেন'। আমার ভাল-মন্দতে, অপরের ভাল-মন্দতে আমার যে ধারণাগুলো রয়েছে, সেই ধারণা দিয়ে আমরা বিচার করি, ঈশ্বর এই বিচার করেছেন।

করোনার সময়ে সোস্যাল মিডিয়াতে দেখে থাকবেন, সবাই লিখে যাচ্ছে, ভগবান তোমাদের রক্ষা করছেন। কোথায় বলছে যে দায়ীত্ব ভগবানের? একমাত্র হিন্দু ধর্মই বলে –ভগবান মৃত্যুরূপে আসেন। একদিকে বস্তুবাদী মতবাদের আস্ফালন, অন্য দিকে চীন বলুন, আমেরিকা বলুন, সবাই মিলে পৃথিবীকে শুষে নিচ্ছে; এই সমষ্টি পাপের ফল আজকে করোনা রূপে এসেছে। আর লেখাপড়া জানা লোকেরা ভগবানের উপর দোষ চাপিয়ে যাচ্ছে। অন্য সময় এদের ভগবানকে মনে পড়ে না, করোনার সময় ভগবানকে খুব মনে পড়ছে। এতদিন যে তোমরা ভোগের মধ্যে ডুবে ছিলে, তখন তো ভগবানের কথা মনে পড়েনি। এখন তোমাদের ভগবানের কথ মনে পড়ছে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের এত পাণ্ডিত্য, ভিতরে এত দয়ার ভাব, তাঁর অন্য সময় ভগবানের কথা মনে পড়ল না, ভগবানের কত করুণা তাই আমি এত বিদ্যার্জন করতে পারলাম, ভগবানের এত করুণা আমি শিক্ষকের চাকরি পেয়ে গেলাম, ভগবানের কত করুণ যে আমি দান করতে পারছি। চেঙ্গিস খাঁ আটশ বছর আগে কাকে কাকে মেরেছে, সেটা নিয়ে তিনি বিচার করছেন –ভগবানকে ডেকে আমার কি দরকার?

নিকুচি করেছে, ভগবানকে তুমি ডাক আর নাই ডাক। সূর্যকে তুমি যাই মনে কর, সূর্য ঘুরছে কি ঘুরছে না, তাতে সূর্যের ভারি বয়ে গেল। কথামৃতেই আছে, একজন এসে বলছে, ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে কেউ আমাকে দেখিয়ে দিক। ঠাকুর বলছেন, কারুর ভারি ভয়ে গেছে তোমাকে দেখাতে। ঈশ্বরের ভারি বয়ে গেছে যে, তাঁর দয়া আছে কি নেই। আর যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁদেরও ভারি বয়ে গেছে তোমাকে বোঝাতে। আমাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই সংসার, যেখানে আমি রাজা। আমাকে কেন্দ্র করেই জগৎটা ঘুরছে। যেমনি এখানে একটু হাত পড়ল অমনি আমরা গেল গেল বলে চেঁচিয়ে সবাইকে অস্থির করে তুলি। দু-বছর, পাঁচ বছরের বাচ্চাদের সংসার খুবই ক্ষুদ্র। একটু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হলে সে চেঁচিয়ে, কেঁদে সবার মাথা খারাপ করে দেবে। আমাদের অবস্থাও সেই রকম, আমরা সবাই মোচওয়ালা শিশু। দাঁত পড়ে গেছে, চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে কিন্তু বুদ্ধিটা পাকেনি। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আমিটা দিয়ে সংসার তৈরী করে, সেটা দিয়ে আমরা সব কিছুকে বিচার করতে থাকি। আর যেটাই আমার মতের সাথে মিলল না, ঠাকুর তোমার বিচার করবেন। আরে ভাই, ঠাকুর বিচার করেছেন বলেই তো তাকে এই ক্ষমতাটা দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – **ঈশ্বরের কার্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন? তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার সবই করছেন**। বই পড়ে বা শুনে ঈশ্বরের ব্যাপারে যে ধারণা আর সত্যিকারের যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন; এই দুজনের ঈশ্বরের ধারণায় কি তফাৎ তা এই দুটো লাইনে বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর বললেন, এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন। হ্যাঁ অবশ্যই তিনি দেখলেন, শুধু দেখলেন না, তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। পৃথিবীর বোঝা কমালেন, এখন যেমন করোনাতে তিনি পৃথিবীর বোঝা কমাচ্ছেন। আমাদের মহারাজদেরও অনেকের করোনা হয়েছে, অনেকে মারা গেছেন, দুঃখ তো আমার হয়; যাঁরাই এখন মারা যাচ্ছেন সবাই আমার পরিচিত। এমনিও পরিচিত কেউ যখন মারা যান, তখনও দুঃখ হয়। কি দুঃখ হয়? আর এনার সঙ্গ লাভ হবে না, আর এনার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। এতটুকু বাদে হা-হুতাশ করার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, তাঁর উপর যাঁরা নির্ভরশীল, তাঁদের সত্যিই সমস্যা হয়ে যায়। বর্তমান কালে অনেক রকম সুবিধা এসে গেছে, লোকেরা আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখে যাতে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা না হয়। যদি কেউ না করে থাকে, তাহলে সে একটা অপদার্থ।

তিনি সংহার করেন, কেন সংহার করে, আমরা এর কি বুঝব? যাঁরা শুনছেন, আপনারা ভক্ত, মন দিয়ে শুনুন। মৃত্যু ঈশ্বর দেন, সংহার ঈশ্বর দেন। কেন? নূতন সৃষ্টি যাতে হয়। আমরা এখন মনে

করছি, আমরা বিরাট কিছু; দু-হাজার বছর আগে যারা ছিল, তারাও মনে করত তারা বিরাট কিছু। সত্তর দশকে কাউকে যদি এখান থেকে রাজস্থান যেতে হত, ট্রেনের রিজার্ভেশান করাতে তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত। বড় বড় স্টেশনে একটা করে কাউন্টার থাকত। ট্রেন এলে সেখানে টিটিরা দাঁড়িয়ে বলত, 'হ্যাঁ বার্থ আছে'। একটা বার্থ দেবে সেখানেও ঘুষ খেত। একটা রিজার্ভেশান করানো মানে নাকে চোখে জল বেরিয়ে যাবে। আজকে ইন্টারনেট এসে গেছে, ঘরে বসে আপনি টিকিট বুক করে নিতে পারছেন। গত পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের থেকে আমরা কত এগিয়ে গেছি। তাহলে দু হাজার বছর আগের পরিস্থিতি থেকে এখন আমরা কতটা এগিয়ে। কিন্তু দু হাজার বছর আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও নিজেদের ওই ভাবেই মনে করতেন। আর বিদ্যাসাগর যে চেঙ্গিস খাঁর কথা বলছেন, লক্ষ লক্ষ লোক যদি চেঙ্গিস খাঁর হাতে না মরত, তাহলে কি সভ্যতা আসত? আমার নিজের একটা বয়স হয়েছে, আমার জ্ঞানের একটা পরিধি আছে, কিন্তু এটাকেই আমি যদি ধরে রেখে দিই, অন্যকে আমি ছাড়ব না; তাহলে তো সমাজ ব্যবস্থাটা স্থবির হয়ে যাবে। সমাজে দেখুন বুড়ো-বুড়িগুলো ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। বৌমা এসে গেল, শাশুড়ী ক্ষমতা ছাড়বে না। রাজনীতিতেও তাই, অথচ চাকরি ক্ষেত্রে সবাইকে ষাট বছরে রিটায়ার করিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য স্থায়ী ভাবে রেখে দেন, সে কত আর পড়বে; একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যাবে। ফ্রেশ ব্লাড যদি না আসে সমাজ, জাতি এগোবে কোত্থেকে? ভগবান সেইজন্য রিসাইকেলিং করতে থাকেন। আমরা মিছিমিছি ভেবে মরছি, কত লক্ষ লোক করোনাতে মরে গেল। তাতে হলোটা কি, এমনিতেও তো মানুষ মরত, আদিখ্যেতা দেখে মনে হয় এমনি সময় কেউ যেন মারা যায় না। একটা বিপদ এসেছে, সরকার বলে দিয়েছে, ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন সাবধানে থাকবেন, বাকিটা তাঁর ইচ্ছা।

ঠাকুর বলছেন, তিনি কেন সংহার করছেন আমরা কি তা বুঝতে পারি? **আমি বলি, মা, আমার বোঝবারও দরকার নাই, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও। মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এই ভক্তিলাভ**। এটাই জীবনের উদ্দেশ্য, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যোগ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হবে; সমস্ত কার্য এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হবে, সমস্ত চেতনা এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত থাকবে –'তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও'। যেখানে সেখানে ভক্তি না, কেবল তোমার পাদপদ্মে ভক্তি, তোমাকেই যেন ভালবাসতে পারি। মানবজীবনের এটাই উদ্দেশ্য – ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ। **আর সব মা জানেন। বাগানে আম খেতে এসেছি; কত গাছ, কত ডাল, কত কোটি পাতা – এ-সব বসে বসে হিসাব করবার আমার কি দরকার! আমি আম খাই, গাছপাতার হিসাবে আমার দরকার নাই**।

এই যে ঠাকুর বলছেন, মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এই ভক্তিলাভ। আমরা যখন বাজারে যাই, তখন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই যাই। বাজারে আনাজ কিনতে এসেছি, সেখানে আনাজই কিনব। মানব জীবনের উদ্দেশ্য যদি ভক্তিলাভ হয়, তাহলে আমার যত চেষ্টা, আমার যে জীবনধারা, সেটা এই ভক্তিলাভের দিকেই থাকার কথা। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, 'তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও'।

এ্যমিবা থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত যত জীব আছে সবাই আহার, নিদ্রা, মৈথুনের মধ্যে ঘুরঘুর করছে। এদের মধ্যে একমাত্র মানুষই এর বাইরে একটু চিন্তা-ভাবনা করে, একটু সৃজনশীল হয়। পাখিরা যে বাসা বানায়, ওর মধ্যে একটা সৃজনশীলতা থাকে ঠিকই। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখবেন, ওরা বছরের পর বছর একই রকম বাসা বানায়। এক-একটা পাখির বাসা একই রকমের হয়। একমাত্র মানুষই সৃজনশীল হয় আর বৈচিত্র্যময় হয়। তার থেকেও বেশি, মানুষ আত্মচিন্তন করতে পারে। আত্মচিন্তন আর ঈশ্বরচিন্তন একই জিনিস। আত্মাকে আমি যখন বাইরে দেখি, সেটাই তখন ঈশ্বর; ভিতরে যখন দেখি সেটাই আত্মা। জ্ঞানী ঈশ্বরকে ভিতরে দেখে, ভক্ত ঈশ্বরকে বাইরে দেখতে চায়। এক-একটা জিনিসের এক-একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। ছুঁচ এক রকমের কাজ করে, তলোয়ার আর-এক রকমের কাজ করে। দুটোই ইস্পাত দিয়ে নির্মিত, দুটোই ছেদ করতে পারে; কিন্তু দুটোর বৈশিষ্ট্য আলাদা। একটা হাতির যে মন, একটা কুকুরের যে মন, একটা বাজ পাখির যে মন, মানুষের যে মন, সব কটা মনের আলাদা

আলাদা বৈশিষ্ট্য। মানুষের মনের বৈশিষ্ট্য এই –তার মনের আত্মসচেতনতা আছে। আত্মসচেতন মানে সে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে, নিজেকে সংশোধন করতে পারে। যে কোন প্রানী তার বাচ্চাদের, বিশেষ করে পাহাড়ী ছাগলগুলো বাচ্চাদের ট্রেনিং দেয় কি করে লাফ দিতে হয়। বাঘ, সিংহ এরা নিজেদের বাচ্চাদের ট্রেনিং দেয় কিভাবে শিকার করতে হয়। ভুল হলে তাকে শোধরায়, নিজের ভুল হলেও শোধরায়। কিন্তু মানুষ যেভাবে আত্মচিন্তন করতে পারে, এভাবে তারা পারে না।

কিন্তু তার থেকেও বেশি আরেকটা জিনিস মানুষের মধ্যে আছে, যেটা আমরা আগেও এক-দুবার আলোচনা করেছি। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরদর্শন হলে কি হয়? শ্রীশ্রীমাও বলছেন, তার কি দুটো শিং বেরোয়? ঠাকুর বলছেন, কেরানি জেল থেকে ছাড়া পেলে কি রাস্থায় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে, সে আবার সেই কেরানির কাজই করবে। এই যে প্রার্থনা করা হচ্ছে, হে প্রভু তোমার পাদপদ্মে যেন আমার ভক্তিলাভ হয়। ভক্তিলাভ হলে কি হয়?

আমার নিজের জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে আদর্শ দুটি। জগৎকে নিয়ে আমার সিদ্ধান্ত – *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, এই জগতে সুখের গন্ধ পর্যন্ত নেই। এখান থেকে শুরু করে স্বর্গ পর্যন্ত যত লোক আছে সব অনিত্য, এবং অসুখম্; এখানে কোন সুখ নেই। *ইমং প্রাপ্য*, অর্জুন তুমি আগে এটাকে ভাল করে বোঝ, বুঝে নিয়ে আমারই ভজনা করা, *ভজস্ব মাম্*; এই যে ঠাকুর বলছেন, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার ভক্তিলাভ হয়। আমার জীবনে এটাই সাধনা। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কখন সফল হই, কখন ব্যর্থ হই, কখন কষ্ট পাই, কখন নিজেকে সংযত রাখি। কিন্তু এই শ্লোকার্ধ ছাড়া আমার আর কোন সাধনা নেই। আমিও জীবনে প্রচুর কষ্ট পেয়েছি, আর এমন কষ্ট যে যেখানে মানুষ পুরো বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। তখনও, ওই অবস্থাতেও গীতার এই শ্লোকার্দ্ধ আমার সাধনা ছিল। আমার কাছে সবাই *অনিত্যম্*, আমার কাছে সবাই *অসুখম্*।

কিছু দিন আগে আমার ক্লাশের একজন বয়স্ক মহিলার সঙ্গে দেখা হল, উনি আগে নিয়মিত ক্লাশে আসতেন, ইদানিং সেভাবে আসেন না। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি ক্লাশে আসছেন না? আপনি ক্লাশে না এলে আমার ক্লাশ নিতে ইচ্ছে করে না'। কাছে অন্য একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, 'এই একই কথা আপনি কজনকে বলেন বলুন তো'? আমি বললাম, 'সবাইকে বলি, যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই বলি'। আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? না, কেন মিথ্যা কথা বলব, সত্যি কথাই বলছি। কিন্তু সত্যিই কি উনি ক্লাশে না এলে ক্লাশ নষ্ট হয়? না, কখনই নষ্ট হয় না। ইনি না থাকলেও আমার কষ্ট, উনি না থাকলেও আমার কষ্ট। অথচ উনি না থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না, ইনি না থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না। মানে আপনি এলে আমি খুশী, কিন্তু নির্বিকার কিছু না। গভীর স্তরে যখন যাচ্ছি, তখন কেউ কিছু না।

জগতে আছি কাজ চালানোর জন্য। জগৎ আছে জগতের মত, গীতাতে বলছেন না যে জগৎ নেই, জগৎ আছে কিন্তু অনিত্য ও সুখহীন। ভাই তুমি যেই হও না কেন, তুমি আমাকে সুখ দিতে পারবে না। আমি যখনই ভেবেছি এর কাছে সুখ পাব, তার কাছেই মার খেয়েছি। আর যখনই কোন মানুষের সঙ্গে পরিচিতি হয়, আমি তাকে শজারুর মত দেখি। একটা গল্প আছে, ছোটবেলা থেকে হাতি আর শজারু দুজনে বন্ধু ছিল। এবার দুজনেই বড় হয়েছে। শজারু হাতিকে বলছে, 'কিগো তুমি যে আমার সঙ্গে আর কথা বলছ না'? হাতি বলছে, 'ভাইরে তখন বন্ধুত্ব ছিল, এখন আর না, এখন তুমি বড় হয়ে গেছ'। শজারুর সঙ্গে হাতি যদি বন্ধুত্ব করে, হাতি জানে কি ফল হবে। জগৎটা হল শজারু, কাছে যাবে ওর কাঁটা বিদ্ধ করে দেবে –*অনিত্যমসুখম্*।

তাহলে কি? *ভজস্ব মাম্*, আমাকে ভক্তি কর। ভক্তি করলে কি হয়? জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য হয়, ঠাকুরই এই কথা বলছেন। পাণ্ডবদের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, সারা জীবন পাণ্ডবদের কত কষ্ট, কিন্তু তাঁদের মত ভক্ত কে আছে। যে কোন ঐশ্বর্য হলে যা হয়, জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য হলে তাই হয়। আপনার

যদি বন্দুকের ঐশ্বর্য থাকে, ওই বন্দুকের ঐশ্বর্য দিয়েই আপনি সব কিছু করতে পারবেন। গড ফাদার একটা নামকরা বই, অনেক দিন আগে আমি পড়েছিলাম। পড়ার পর ক্রিমিনালসরা কিভাবে জীবন-যাপন করে জেনে আমি চমকে উঠেছিলাম। ওই বই পড়েই আমার ডনদের সম্বন্ধে, গড ফাদার সম্বন্ধে আইডিয়া হয়। তাদের ঐশ্বর্য হল বন্দুক। যা কিছু করার বন্দুক নিয়ে করবে। বিয়ে করবে বন্দুকের জোরে, টাকা আয় করবে বন্দুকের জোরে। আর যাদের টাকার ঐশ্বর্য আছে, তারা সমস্ত কিছু করে টাকার জোরে। কিন্তু এদের যখন অসুখ হয়, যার বন্দুক আছে, বন্দুকের জোরে ডাক্তার নিয়ে আসবে। যার টাকার ঐশ্বর্য আছে সে টাকার জোরে নিয়ে আসবে। কিন্তু তোমার যে কষ্ট, তা তোমার কষ্ট। ওই জায়গাতে কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না, না টাকা, না বন্দুক।

রাজনৈতিক দলের নেতার ঐশ্বর্য হল ক্ষমতা। মন্ত্রী, নেতাদের কাছে থাকে রাজসত্তা, এটাই তার ঐশ্বর্য। তিনি সমস্ত কিছু জোগার করবেন এই ঐশ্বর্য দিয়ে। জ্ঞান ভক্তির যে ঐশ্বর্য, এই ঐশ্বর্য দিয়েই আমরা জীবন চালাই। কি রকম? যিনি ঠিক ঠিক ভক্ত, তিনি জানেন, এই যে কষ্ট এসেছে, তখন তিনি ওই ঐশ্বর্যটাকে কাজে লাগান। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন, ঠাকুর এই পরিস্থিতি এসেছে, কি করব? ঠাকুর কোন উত্তর দিলেন না। তখন তিনি এটি মনে করেন, আমাকে এই দুর্ভোগ ভুগতে হবে। তার মানে, যার টাকার ঐশ্বর্য আছে, বন্দুকের ঐশ্বর্য যার আছে, সব কিছু কি তার মনের মতে চলে? একেবারেই চলে না, টাকাও তখন কোন কাজে লাগে না, বন্দুকও কোন কাজে লাগে না। সেই রকম অবস্থায় ভক্তিও কোন কাজে লাগবে না। বরঞ্চ যার টাকা আছে, বন্দুক আছে সে বলে, আমার বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারলাম না। যে ভক্ত, সেও ঈশ্বরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে, তারপরেও বাচ্চা মারা গেল। ভক্ত বলে, যাঁর জিনিস তিনিই নিয়েছেন।

আমরা এটা বুঝতে পারি না যে, জ্ঞান ভক্তির যে ঐশ্বর্য হয়, আসলে এই ঐশ্বর্য দিয়ে জগতে জীবন চালানো অনেক সহজ হয়ে যায়; বন্দুকের ক্ষমতা, টাকার ক্ষমতা বা অন্যান্য ক্ষমতা থেকেও। সমাজে যাদের প্রচুর যোগাযোগ আছে, তাদেরও যখন দুঃখ-কষ্ট হয়, কোন যোগাযোগই যখন কোন কাজে লাগে না, তখন তারাও ভিতরে ভিতরে একটা অসহায় বোধ করে। জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্যে তার যে সাংসারিক জীবন সেটাও চলে, তার যে শান্তির জীবন, সেটাও চলে আর তার সাথে তার আধ্যাত্মিক জীবনটাও চলে। অন্যান্য ঐশ্বর্যের মত এই ঐশ্বর্য হারানোর কোন সম্ভবনা নেই। মীরাবাঈএর খুব নামকরা ভজন, পায়োজী ম্যায় রামরতন ধন পায়ো, চোর না লুটে; আমি রামরতন ধন পেয়েছি, কেউ এটাকে লুট করে নিতে পারবে না। তার সাথে বলছেন, দিন দিন বাড়াতো সহায়ো, দিনে দিনে এই ধন বাড়তেই থাকে। যার রাজসত্তা আছে, রাজসত্তা চলে যাবার ভয় থাকবে। বন্দুক থাকলে ভয় আছে অন্য কেউ ক্ষমতা পেয়ে যাবে। টাকা হলে ভয় টাকা নানান ভাবে চলে যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য কোন দিন যাবে না।

আমরা পারি না। আমি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ঠিক করে নিয়েছি, আমার জীবন চালানোর এটাই মন্ত্র–*অনিত্যমসুখম্ লোকমিমং প্রাপ্য*, এটাকে ভাল করে বোঝ, আর *ভজস্ব মাম্* ঠাকুরকে ধরো। আমি আম খাই, গাছপাতার হিসাবে আমার দরকার নাই, *অনিত্যমসুখম্*, কি হবে এগুলো জেনে, আসলটাকে ধরো।

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে আজ রাত্রে বাবুরাম, মাস্টার ও রামদয়াল শয়ন করিলেন।

গভীর রাত্রি, ২টা-৩টা হইবে। ঠাকুরের ঘরের আলো নিভিয়া গিয়াছে। তিনি নিজে বিছানায় বসিয়া ভক্তদের সহিত মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। ওই রাত দুটো তিনটের সময় ঠাকুর দয়া ও মায়া নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন।

কথামৃতে যত কথা আছে, সব কথাই আমাদের নেওয়া দরকার। যেমন যেমন আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে এবং আমাদের মনের জগতে এগোব, তত এই জিনিসটা বেশি বুঝতে পারব। কথামৃত হল ঈশ্বরীয় কথা তাও আবার অবতারের মুখ দিয়ে আসছে। যে কোন অবতারের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল, সেইজন্য কথামৃত পড়লে মনে হয় সব বুঝে গেছি। আরও মজার হল, যেমন যেমন এগোবেন, তত মনে হবে যেন আরও স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। যদি কেউ মনে করেন সব বোঝা হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে তার বৌদ্ধিক বিকাশ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে। আধ্যাত্মিক বিকাশ যদি হয়, বৌদ্ধিক বিকাশ যদি হয়, অন্তরের বিকাশ যদি হয়, তাহলে কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলোর আরও গভীর অর্থ স্পষ্ট হবে। আমি অনেক মহারাজদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। রাম মহারাজ (স্বামী মোক্ষদানন্দজী) ছিলেন, ওনাকে বেশি জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, উনি বুঝিয়ে দেবেন। অর্থ হল, যত আমাদের মন, বুদ্ধি পরিষ্কার হবে তত আমাদের ভিতরে যিনি ঈশ্বর আছেন, তাঁর যে স্বরূপ, সেটা নিজেই প্রকাশ হয়ে যাবে। বই পড়া, লেকচার শোনা, আলাপ-আলোচনা করা এই সব কিছু হল বুদ্ধিকে পরিষ্কার করার বিধি।

ঈশ্বরীয় কথায় ঠিক ঠিক শত্রু একটাই; আমরা কাম-ক্রোধাদি নিয়ে আলোচনা করছি না, কাম-ক্রোধাদিগুলি প্রাথমিক স্তরে শত্রু থাকে, কিন্তু উচ্চ অবস্থায় একটাই শত্রু –সেটা হল ইমোশানালিজিম্। যাদের এই ইমোশানালিজম্ আছে, যাদের মধ্যে ড্রামাবাজি আছে, এদের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক পথে এগোন খুব মুশকিল। স্বামীজী দেববাণীতে বারবার এই ফ্যানাটিসিজিম্‌কে নিয়ে বলছেন। মানুষ যখন ইমোশানাল হয়ে যায়, আমরা যেমন বলে থাকি 'ঠাকুর দেখছেন'; এটা আবার দুটো স্তরে চলে। যাঁরা ঠিক ঠিক ঠাকুরকে জেনেছেন, এক ওনারা এটা বলবেন; আর যাঁরা পূর্ণ রূপে শরণাগত, যে শরণাগত সন্ন্যাসী ছাড়া হওয়া যায় না। এই দুজন বাদে যারা বলে, 'ঠাকুর দেখছেন', তখন এই বলার মধ্যে কোথাও একটা ইমোশানালিজিম্ হয়ে যায়। এতে কি হয়, ভিতরে ইমোশানালিজিম্ থাকলে মনে হবে আমার নিষ্ঠা প্রচুর বেড়ে গেছে, বাইরে এটাই ফ্যানাটিসিজিমের দিকে নিয়ে চলে যায়। বিভিন্ন ধর্মে যে ফ্যানাটিসিজিম্ দেখা যায়, তা এই ইমোশানালিজিম্ থেকেই আসে। স্বামীজী এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করতেন। আমার এই কথাগুলো অনেকের হয়ত পছন্দ হবে না, কিন্তু আমি তো শাস্ত্রের বাইরে কোন কথা বলি না; ইমোশানালিজিম্ আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। শুধু ধর্ম জীবনের জন্য বড় শত্রু তা না, বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে বড় শত্রু; অন্য দিকে বুদ্ধির বিকাশ না হলে ধর্ম জীবন হয় না। পড়াশোনার সঙ্গে ধর্ম জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বুদ্ধির বিকাশের সাথে ধর্ম জীবনের সরাসরি সম্পর্ক।

রাত দুটো তিনটের সময়েও ঠাকুরের কথা চলছে। সেদিন সারাদিন কথা চলেছে, সারা বিকাল চলেছে, সন্ধ্যায় চলেছে, রাতে চলেছে, আর এখন গভীর রাত, একটু পরেই ভোর হবে, ঠাকুরের কথা চলছে। গীতায় ভগবান বলছেন, *যা নিশা সর্বভূতানাং*, ঠাকুর সত্যিই করে দেখাচ্ছেন। অথচ কোন ইমোশানালিজিম্ নেই, কোন যে নাচ-গান হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে, কিছুই নেই, শুধু ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ। মাস্টার এবং আরও ভক্তরা যাঁরা আছেন তাঁদেরকে ঠাকুর এবার বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – দেখ, দয়া আর মায়া এ-দুটি আলাদা জিনিস। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা; যেমন বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, এদের উপর ভালবাসা। যারা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়, এরা মানসিক রোগী, নিজেকে ছাড়া কিছু বোঝে না। মানুষ সচরাচর এ-রকম হয় না, দু-চারজনকে সে ভালবাসবেই, কাউকে না কাউকে সে ভালবাসবেই। যার ভিতরে ভালবাসা যত বেশি, বুঝতে হবে তার ভিতরে চৈতন্যের প্রকাশ তত বেশি। এখানে কোন ইমোশানালিজিম্ নেই। যেমন ঠাকুর বলছেন, মা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন। অনেকে যারা বিয়ে-থা করেনি, একা থাকে, তিনটে চারটে বিড়াল কুকুর নিয়ে থাকবে; আর সেটাও যদি না থাকে তাহলে পাড়ার কুকুরগুলিকে আদর করে বেড়াবে, ভিতরে যে ভালবাসা, সেটাকে কোন না কোন ভাবে বার করার জন্য এগুলো করা। এগুলো পুরোটাই ইমোশানালিজিম্, এর কোন দাম নেই।

আগে দেখুন, আপনার মনটা পুরো পরিষ্কার কিনা। মন পরিষ্কার, তার উপর আপনার মধ্যে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসার মধ্যে একটা ফিলজফি রয়েছে। ফিলজফি কি? এরা আমার। এটাই যখন আরও এগিয়ে যায়, তখন হয়, এরা সবাই মানবজাতি বা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। এরও উপরে উঠে গেলে, যেমন বেদান্তীরা বলে –এরা সবাই আমারই রূপ। অত উচ্চস্তরে আমরা যাচ্ছি না, ওর থেকে অনেক নিম্ন স্তরের কথা বলছি। প্রথমটা শুরু আপনজনকে ভালবেসে। ছোট্ট শিশু যেমন তার মাকে ভালবাসে, কারণ সেখান থেকে তার পেট ভরে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখন মা, বাবা, ভাই-বোন সবাইকে ভালবাসতে শুরু করে। এখানে নির্ভরতা নেই। আমরা প্রায়ই নির্ভরতাকে ভালবাসা বলে মনে করি, নির্ভরতা হল গোলামী, আমরা দাস হয়ে থাকতে চাইছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন আমরা কাউকে ভালবাসি, অজান্তায় আমরা আসলে তার দাস হতে চাইছি। আর দাস যখন হতে চাইছি, আসলে আমি তাকে দাস বানিয়ে রাখতে চাইছি। ভালবাসা তা না, ভালবাসা মানে – তুমি অনেক বড় হও, আমি তোমার পাশে আছি।

যদি আপনার ভিতরে সত্যিকারের ভালবাসা থাকে, যার প্রতিই হোক, আপনি বলবেন, 'তুমি যা করছ, আমি তোমার সঙ্গে এক মত নই, কিন্তু আমি তোমার পাশে আছি'। সে যদি বলে, 'আমি যদি চুরি-ডাকাতি করি পাশে থাকবে'? আপনি বলবেন, 'অবশ্যই থাকব, কিন্তু আমি এই কাজ অনুমোদন করি না, চুরি-ডাকাতি করা ভাল না। তবে চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে আপদে বিপদে পড়লে আমি পাশে আছি'। এটাকে বলে ভালবাসা; নিঃশর্ত ভালবাসা। আমাদের ভালবাসা সব সময় শর্ত সাপেক্ষে হয়। তুমি আমাকে ভালবাসবে, আমিও তোমাকে ভালবাসব। এরও বেশি হল, আমি তোমাকে প্রচুর ভালবাসব, আসলে দাসত্ব। মায়েদের ভালবাসাতেও অনেক সময় বলতে দেখা যায় –'আমি তোমার মা, আমার কথা তুমি শুনছ না'? আপনি যখন ছিলেন তখন ছিলেন, এখন কিসের। এগুলো হল দাসত্ব, যা কিনা আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বনাশ নিয়ে আসে। যদি আপনি কাউকে বন্ধনে রাখতে চাইছেন, যদি আপনি কারুর বন্ধনে থাকতে চাইছেন, আর যাই হোক, আধ্যাত্মিক জীবন আপনার দ্বারা চালানো কখনই সম্ভব হবে না। যে কোন বন্ধন, আপনি একজন ভাল লেখক হতে চাইছেন, আপনি জেনে রাখুন, ঈশ্বরদর্শন আপনার দ্বারা হবে না। আপনি যদি মনে করেন science is my God, আপনি ওই নিয়েই থাকুন, বিজ্ঞান ছাড়া আপনার দ্বারা আর কিছু হবে না। আপনি গড্ শব্দটা আর আনবেন না, গড্ আলাদা, যেখানে কোন বন্ধন থাকবে না। ঠাকুর আবার বলছেন, কোন একটা দিকে বেশি এগিয়ে গেলে ঈশ্বরের দিকে আপনি আর এগোতে পারবেন না। যে কোন বন্ধন, তমোগুণের বন্ধন, রজোগুণের বন্ধন, সত্ত্বগুণের বন্ধন, যে বন্ধনই থাকুক, ঈশ্বরের পথে এগোন যাবে না, অসম্ভব। এই যে ভালবাসা, ভালবাসা মানে, আমি তোমাকে স্বাধীন করলাম, আমিও স্বাধীন। তুমিও বড় হও, আমিও বড় হচ্ছি। তোমার দরকারে আমি তোমার জন্য আছি, কিন্তু আমার দরকার হলে কখন আমি তোমার কাছে যাব না, আমি আমার পায়ে নিজেই দাঁড়িয়ে যাব।

আপনি যদি ঠাকুরের ঠিক ঠিক ভক্ত হন, আপনি কোন দিন ঠাকুরের কাছে যাবেন না, ঠাকুরের কাছে কিছু চাইবেনও না। আপনি যদি ঠাকুরের কাছে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু চাইতে যান, তাহলে আপনি হলেন হীন ভক্ত। ঠাকুর বলছেন, বড়লোকের কাছে বেশি চাইতে গেলে সে আর তাকে ঢুকতে দেয় না। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সব ভক্তরা এসে কাঙালের মত খালি চাই চাই করত। শ্রীশ্রীমা দুঃখ করে তাই বলছেন, ঠাকুর আমার দিকে এই সব সাধারণ লোকেদের ঠেলে দিয়ে গেলেন। জল মেশানো দুধ কাঠের আগুনে জ্বাল দিতে দিতে উনুনের ধোঁয়ায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। বেশি ঘুরঘুর যদি করেন, ঠাকুর দূর থেকে দেখেই বলবেন, এই রে কাঙালীটা আবার আসছে। নিজের পায়ে দাঁড়ান, যা আছে তা নিয়েই খুশী থাকুন। যদি আপনার দু-চারজন বন্ধু হয়ে থাকে, তারা কখন আপনার চাওয়ার অপেক্ষায় থাকবে না, নিজেরাই এগিয়ে আসবে। যদি না এগিয়ে আসে, তাহলে আপনার সে বন্ধু ছিল না। কাঙালী বৃত্তি আপনাকে ছাড়তে হবে। এখানে মায়া হল আপনজনের প্রতি ভালবাসা। মায়া এখানে

খারাপ অর্থে বলা হচ্ছে না, এতে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্প্রসারিত হয়। এই যে ক্ষুদ্র আমি নিয়ে শরীর, এই ক্ষুদ্র আমি ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে।

আর দয়াকে বলছেন, **দয়া সর্বভূতে ভালবাসা; সমদৃষ্টি**। গীতাতে বলছেন, *সর্বভূতে হিতে রতাঃ*, ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতা বলতে এটাই –*সর্বভূতে হিতে রতাঃ*, সবারই মঙ্গল চায়। নিজের সন্তানেরও ভাল চায়, অপরের সন্তানেরও মঙ্গল চায়। তখন বুঝতে হয়, এর মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়েছে। সত্ত্বগুণ মানে সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি। সত্ত্বগুণে ক্ষুদ্র ভাবের জন্য যে কাম-ক্রোধাদি আসে, এগুলো চলে যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য তমোগুণ থেকে আসে আর নাহলে রজোগুণ থেকে হয়। নিদ্রা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা এগুও তমোগুণ আর রজোগুণ থেকে হয়।

কারু ভিতর যদি দয়া দেখ যেমন বিদ্যাসাগরের, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দক্ষিণেশ্বরের পাশেই ব্যারাকপুর, সেখানে চাণকে বড় মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট ছিল, শিখ সিপাহীরা দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই সেখান থেকে ঠাকুরের কাছে আসত। একদিন সিপাহীরা কথায় কথায় বলছে, ঈশ্বর দয়াময়। ঠাকুর তাদের বলছেন, 'ঈশ্বরকে কেন দয়াময় বলব'? 'কেন, তিনি সবাইকে খাওয়াচ্ছেন, দেখছেন'। ঠাকুর তখন বলছেন, 'সন্তানকে তিনি না খাওয়ালে বামুনপাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে'? ঠাকুর এখানে বলছেন ঈশ্বরের দয়া, আবার সিপাহীদের বিপরীত কথা কেন বলছেন? আধ্যাত্মিক জীবনে ইমোশানালিজিমের কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানে ইমোশানালিজিমের কোন স্থান নেই, সৃজনশীলতায় ইমোশানালিজিমের কোন স্থান নেই। ইমোশান হল মন বুদ্ধির চিরন্তন শত্রু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যে কোন ইমোশান আপনার মন, বুদ্ধির চিরন্তন শত্রু। এমনকি সত্যিই যদি এই ভাবে আপনি বলেন –ঈশ্বরের দয়ায় সব হচ্ছে, বুঝবেন সেখানে ইমোশান রয়েছে। মা আমার উপর কৃপা করবেন, মা আমাকে দেখবেন– ইমোশানালিজিম্। এখানে বোঝার চেষ্টা করুন, ঠাকুর কেন এখানে বলছেন, ঈশ্বরের দয়া আবার অন্য জায়গায় শিখ সিপাহীরা ঈশ্বর দয়াময় বলাতে তিনি আটকে দিচ্ছেন।

একটা ঘটনা বলেছিলাম, একজন বয়স্ক মানুষ এসে স্বামীজীকে বলছেন, 'স্বামীজী আমি ধর্মকর্ম সে-রকম কিছু করি না, কিন্তু নিত্য আমি গঙ্গায় স্নান করি, মনে করি তাতেই হবে'। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বলছেন, 'গঙ্গা স্নানে কিছু হবে না'। এখানে স্বামীজী ইমোশানালিজিমকে আটকাচ্ছেন। ইমোশানালিজিমে থাকলে ধর্মটা গোঁড়ামির পর্যায়ে চলে যায়, মানুষকে সর্বনাশ করে দেয়। তারপরেই একটি ছেলে এসে বলছেন, 'আমি এই গঙ্গা স্নান-ফান কিছু মানি না'। স্বামীজী তাকে বলছেন, 'গঙ্গা স্নান করে যাও ওতেই সব হবে'। ওখানেও ইমোশানালিজিম্, ওটা নেগেটিভ ইমোশানালিজিম্। ইদানিং কালে যারা নিজেদের যুক্তিবাদী বলে, বুদ্ধিজীবী বলে, এরা হল নেগেটিভ ইমোশানিলিজিমের দলের। ঠিক তেমনি যারা বলে তিলক কাটতে হবে, গলায় তুলসীর মালা পরতে হবে –ইমোশানালিজিম্। গীতার ক্লাশে একজন আমাকে নিয়ে কমেন্ট করে পাঠালো, 'ইনি গীতা পড়াচ্ছেন, ওনার গলায় তুলসীর মালা কোথায়'? খুব উচ্চমানের ভক্তরা এগুলো করেন যাতে কৃষ্ণের কথা সব সময় স্মরণ হয়। তাঁর শিষ্যরাও করেন, কারণ তাঁরা গুরুর পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলছেন। কিন্তু এটাই হতে হতে অন্যদের কাছে ইমোশানালিজিমে চলে যায়।

মনের বিরাট বড় শক্তি হল ইমোশানালিজিম্, ঠিক তেমনি ধর্ম জীবনে মহাশত্রু। ইমোশানালিজমকে বন্ধ করতে হবে, দৈনন্দিন জীবনে বন্ধ করতে হবে, আর ধর্মজীবনে কোন মতেই যেন ইমোশানালিজম্ প্রবেশ করতে না পারে। বলছেন, দয়া থেকে সর্বভূতের সেবা হয়, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া, এই দয়া ঈশ্বর থেকে এসেছে। মানুষ যখন ভালবাসে, তখন সে তার আপনজনকেই ভালবাসে, কোথাও তার মনের ভিতরে থাকে – ইনি আমার জন্য করেছেন, আমিও ওনার জন্য করি। কোথাও এই একটা ভাব থাকে, আজ আমি ওনার জন্য করছি, আগামীকাল উনিও আমার জন্য করবেন। গড ফাদার বইতে আছে, গড ফাদার যখনই কাউকে সাহায্য করত, সঙ্গে সঙ্গে বলত, তোমার

কাছে একটা ধার থাকল। যখন দরকার পড়বে তখন যার থেকে যা সাহায্য চাইবে গড ফাদারকে দিতে হবে। যদি না দেয়, গুলি করে দেবে। আমরা তো আর গুলি করে ওড়াতে পারব না, আমরা বলি, তোমার মত অকৃতজ্ঞ লোকের কথা মনে রাখব। আমরা যখনই কোন কিছু করি, কোথাও আমাদের মনের মধ্যে একটা প্রত্যাশা থাকে যে, পরে আমি এর প্রতিদান পাব। তারপরেই ঠাকুর বলছেন – **দয়া থেকে সর্বভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের**।

মায়া যে ঈশ্বরের নয়, তা না, মায়াও ঈশ্বরের, কিন্তু সেখানে আমিত্বটা অনেক বেশি জড়িয়ে থাকে। ঈশ্বরের তিনটে জিনিস, তাই তিনি সচ্চিদানন্দ; সচ্চিদানন্দের সৎ মানে অস্তিত্ব, চৈতন্য মানে জ্ঞান, আনন্দ মানে ভালবাসা। এই তিনটে জিনিস যেখানেই আছে, বা এই তিনটে যেখানেই মিলেমিশে আছে, বুঝবেন সেটা ঈশ্বরের। যেখানেই ভালবাসা, তা যে কোন রূপেই থাকুক, ওই ভালবাসা ঈশ্বরের। দেববাণীতে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন –যখন দেখছ বিড়াল বিড়ালের ছানাকে ভালবাসছে, সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশকে দেখার চেষ্টা করবে। যেখানে জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা বা জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যাবে, বুঝতে হবে ঈশ্বর এখানে কৃপা করছেন। যেখানে নিজের অস্তিত্বের উপরে আস্থা ও নিষ্ঠা দেখবেন, বুঝবেন সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়েছে। আজ ইউরোপ আমেরিকা কেন এত এগিয়ে গেল? নিজেদের অস্তিত্বের উপর অগাধ আস্থা ছিল, বিশ্বাস ছিল। স্বামীজী বারবার নিজের উপর বিশ্বাসের কথা বলছেন। নিজের উপর বিশ্বাস মানে, ঈশ্বরের যে সত্তা, সচ্চিদানন্দের সৎ দিকটা প্রকাশ পাচ্ছে। যখন আপনি বলছেন, আমি পারব না, বিশেষ করে অসহায় হয়ে, বিশেষ করে দুর্বলতার কারণে, কিংবা তমোগুণের জন্য; বুঝবেন ঈশ্বরের প্রকাশ সেখানে ক্ষীণ। আমি এটা পারব, আমি এটা করব। কম্যুনিস্টদের নামকরা গান, We shall overcome, এই যে ক্ষমতা, আমরা জয় করব; এটাই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ। ঈশ্বরের যে সৎ, অস্তিত্ব, সেখানে এটার প্রকাশ পাচ্ছে।

সারাদিন ধরে এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে ভাবতে থাকবেন –সৎ, চিৎ ও আনন্দ; জ্ঞানের প্রতি আপনার স্পৃহা বাড়ছে কিনা, জ্ঞানের বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা, ভালবাসা বাড়ছে কিনা আর আত্মবিশ্বাস বাড়ছে কিনা। আত্মবিশ্বাস আসে এই সৎ থেকে, সত্তা থেকে। ঠাকুর এখানে ভালবাসাকে নিয়ে বলছেন। মায়া এটাও ঈশ্বরের কিন্তু জড়িয়ে আছে আমিত্বের সাথে। দয়া মানে, আমিত্বটা অনেক কমে গেছে। যতক্ষণ আমরা তিনটে গুণের মধ্যে থাকব, ততক্ষণ আমিত্বটাও থাকবে, কিন্তু সত্ত্বগুণে, দয়াতে আমিত্বটা অনেক কমে যায়। কিন্তু জীবনমুক্ত পুরুষ, অবতার যিনি, একমাত্র তিনিই ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারেন, একমাত্র তিনিই ঠিক ঠিক কর্মযোগী হতে পারেন। ঠিক তার নীচেই হলেন বিদ্যাসাগরের মত লোকেরা, যাঁরা সবাইকে ভালবাসতে পারেন –*সর্বভূত হিতে রতাঃ*।

মায়া দ্বারা তিনি আত্মীয়দের সেবা করিয়ে লন। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলছেন, এই মায়া আছে বলে সংসার চলছে, সৃষ্টি চলছে। **তবে একটি কথা আছে; মায়াতে অজ্ঞান করে রাখে, আর বদ্ধ করে। কিন্তু দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধন মুক্তি হয়**। বন্ধন মানেই আমিত্ব, দয়া মানে inclusiveness, আমিত্বটা কমে যাচ্ছে, সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি। Inclusiveness, সবাইকে ভালবাসা, সবাইকে নিয়ে চলা, এগুলোর অনুশীলন করতে হয়। এই দুটিই আছে –চৈতন্য আর মনের জগৎ, এর বাইরে আর কিছু নেই। মনের জগৎ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় আমিত্বে। এই আমিত্ব থেকেই আসে মায়া। কিন্তু আমিত্ব যখন কমতে শুরু করে, সবাইকে ভালবাসছেন, সবারই প্রতি আপনার করুণা ছড়িয়ে যাচ্ছে, আমিত্বটা কমে যাচ্ছে, আপনার উপরে মনের আবরণটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এই বন্ধন তো কোন বাস্তবিক বন্ধন না, আমরা এই বন্ধন চেয়ে নিয়েছি, নিজেরাই বন্ধনে থাকতে চাইছি। এই চেয়ে নেওয়াটা স্বামী-স্ত্রী-সন্তান চেয়ে নেওয়া না, এই চাওয়াটা আরও গভীরে গিয়ে যেখানে আত্মা মনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। বলতে পারেন, ছেড়ে দিলেই তো হয়। এমনি এমনি তো ছাড়া যাবে না। ছাড়ার জন্য আগে রজোগুণ আর তমোগুণকে কমাতে হবে। তমোগুণের অন্ধকারকে কমাতে হলে সত্ত্বগুণের যে প্রকাশ, সেটাকে বাড়াতে হবে। বেশি বেশি inclusiveness নিয়ে আসতে হবে।

চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবান দর্শন হয় না। এর উপর আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। যোগশাস্ত্রে এটাকে বলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ। একটা পূজোর ঘর আছে, সেখানে অনেক কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আপনি মনে করলেন, কেমন অপরিষ্কার লাগছে। মনে হওয়াতে আপনি সব কিছু তুলে নিলেন। ওখানে যা কিছু ছিল, পূজোর ফুল থেকে সব কিছু তুলে সুন্দর করে পরিষ্কার করে রেখে দিলেন। দেখে আপনার মনে হবে, 'বাঃ কি সুন্দর পবিত্র লাগছে, সব কিছু পরিষ্কার মনে হচ্ছে'। আপনার যদি বেডরুম হয় তখন বলবেন, 'পরিষ্কার'; পূজার ঘর হলে বলবেন, 'পবিত্র পরিষ্কার'।

আসলে পুরো জিনিসটা কি হল, যার জন্য বলছি 'পবিত্র পবিত্র লাগছে'? কিছুই না, ব্যাপারটা হল, যেখানে যেটা থাকার কথা সেখানে সেগুলোকে গুছিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে আর অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনেও ঠিক তাই হয়। মনে যে চিন্তা-ভাবনা হয় এটাকে বলে বৃত্তি। যোগে বলেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, এটাই যোগ। বৃত্তি নিরোধ আর ঠাকুর বলছেন চিত্তশুদ্ধি, একই জিনিস। চিন্তা-ভাবনাগুলি হল মনের আবর্জনা, ওগুলোকে বার করে দেওয়া। আর যতটুকু মনে থেকে গেছে, সেটাকে গুছিয়ে রেখে দেওয়া। ব্যস্ শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেল। সারাদিন ঈশ্বরের চিন্তা নিয়ে থাকুন, বই যেটা পড়েন ঈশ্বরকে নিয়ে পড়ুন, লেখালেখি করছেন, ঈশ্বরকে নিয়েই করুন, রান্নাবান্না করছেন, ঈশ্বরকে মাথায় রেখে রান্না করছেন –সব কিছু গোছান, শুদ্ধ পবিত্র; এটাই চিত্তশুদ্ধি। মনে যখন অসংখ্য বৃত্তি আর অগোছালো, এটাই অপবিত্র মন। অপবিত্র বলতে আমরা মনে করি, মেয়ের পিছনে দৌড়ান, টাকার পিছনে দৌড়ান, তা একেবারেই না। মনে যদি পাঁচটা চিন্তা এক সঙ্গে চলে, এটাই অপবিত্র মন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ যা, চিত্তবৃত্তি কমানো যা, চিত্তশুদ্ধি একই জিনিস, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যখন মানুষ মায়াতে আবদ্ধ থাকে, মায়া বলতে এখানে আত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা, এটা অশুদ্ধ চিত্ত। সেখান থেকে শুধু যদি নিজের উপর কেন্দ্রিত থাকে, তখন আরও অশুদ্ধ। এই ভালবাসাই যখন সবার প্রতি সমান ভাবে ছড়িয়ে যায়, তখন চিত্ত শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে যায়।

কাম, ক্রোধ, লোভ –এ-সব জয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয়; তখন দর্শন হয়। ঠাকুর এই কথা ভক্তির দিক থেকে বলছেন, কিন্তু জানবেন, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ কোথাও কোন তফাৎ নেই। এই যে আমরা এক্ষুণি আলোচনা করলাম, কিভাবে যোগে যেমন বলছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ, জ্ঞানমার্গে বলছেন সৎ-অসৎ বিচার। অসৎ কি, এই জগতের যে কোন জিনিস যেটা আত্মা নয়, ব্রহ্ম নয়; সেটাকে ত্যাগ করা। ঠাকুর বলছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, এগুলিকে জয় কর; একই জিনিস, কোন তফাৎ নেই। এই কাম, ক্রোধ, লোভ জয় করাকে যদি মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখেন, এগুলোকে ধরে রাখা মানে আপনি exclusive হওয়ার চেষ্টা করছেন, সব কিছু যেন আমার থাকে, অন্যরা যেন না পায়। Inclusive মানে, কাম, ক্রোধ, লোভাদিগুলো খসে পড়ে যাওয়া। যোগশাস্ত্রে এটাকেই বলবে চিত্তবৃত্তি নিরোধ, ভক্তিশাস্ত্রে বলবে, এগুলোকে তুমি জয় কর; জ্ঞানযোগে বলবে এগুলোকে ত্যাগ কর, আত্মা ছাড়া যা কিছু আছে সব ত্যাগ কর, পূর্ণ ত্যাগ না হলে আত্মার দর্শন হবে না।

যোগশাস্ত্রে বলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেলে যোগ হয়ে গেল, *তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*, তখন নিজের স্বরূপে অবস্থা করবে, স্বরূপে অবস্থা আর ঈশ্বরদর্শন একই জিনিস। ভক্তিশাস্ত্রে তাই বলে, জ্ঞানশাস্ত্রে তাই বলে, সব একই। তাহলে তফাৎটা কোথায়? তফাৎ হল, আপনার মনের প্রবণতা কোন দিকে, স্বভাবে আপনি কি রকম। স্বভাবে আপনি যদি খুব ইমোশানাল হন, তাহলে আপনার জন্য ভক্তি। আপনি স্বভাবে নিজেকে গুছিয়ে রাখেন, কথা কম বলেন, আপনার আহার, নিদ্রা সংযমিত, আপনার জন্য যোগের পথ খুব সহজ পথ। আর আপনার যদি তুখোড় বুদ্ধি হয়, কচকচ করে অপরের কথাগুলো কেটে দিতে পারেন, আপনার জন্য জ্ঞানযোগ প্রশস্ত। ঠাকুর, স্বামীজী এবং আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন হল সমন্বয় যোগ, যেখানে চারটে যোগকে আমরা কাজে লাগাই। কিন্তু শেষমেশ যে সাধনা হয়, ওটা একটা

পথেই হয়। চারটে যোগ প্রথমের দিকে ঠিক আছে। এগুলো যখন একটু খসে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন একটা দিকেই এগোয়।

তোমাদের অতি গুহ্যকথা বলছি, কাম জয় করবার জন্য আমি অনেক কাণ্ড করেছিলাম। এমন কি আনন্দ আসনের চারিদিকে 'জয় কালী' 'জয় কালী' বলে অনেকবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম। আনন্দ আসন তন্ত্র সাধনার একটা বিষয়, এটাকে নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। এই যে কাম জয় করার কথা বলছেন ঠাকুর, যাঁরা ঈশ্বরের পথে পুরোদমে এগোচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই ঠাকুর বলছেন। কাম জিনিসটা বিভিন্ন ভাবে আসে। কাম বলতে ঠাকুর এখানে সেক্স বোঝাচ্ছেন, অন্য কিছু না। কিন্তু অন্যান্যা শাস্ত্রে কাম বলতে যে কোন ধরণের ভোগকে বলা হয়, কিন্তু ঠাকুর এখানে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে নিয়েই বলছেন। সেই স্তরের সাধক যাঁরা সমস্ত কিছু ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেছেন, ঠাকুর এখানে পুরোপুরি তাঁদেরকে নিয়েই এখানে বলছেন।

এই যে কামশক্তি, যেটা ভিতরে থাকে, এই কামশক্তিই কিন্তু ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। কামশক্তি যাদের মধ্যে নেই, তারা কিন্তু ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারে না। হিন্দিতে খুব নামকরা ভজন আছে, যেখানে বলছেন, নপুংসক তো অনেকেই আছে, তারা কি সবাই ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? না, এগোতে পারে না, আর বাস্তবে ওদের পক্ষে ঈশ্বরের দিকে এগোন খুব মুশকিল। আমাদের মধ্যে যে কামশক্তি আছে, এই শক্তির বেশির ভাগটাই বেরিয়ে যায় সংসারের সুখভোগ করতে গিয়ে। ওই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে যদি বশে আনা যায়, ওই শক্তি তখন ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। যার জন্য যাঁরা খুব সৃজনশীল হন, কবি, চিত্রকর, বড় বড় সঙ্গীত বিশারদ, এনাদের জীবনে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। ঠাকুর অবতার, অবতার যারা মানে না, তারাও জানে ঠাকুর মহাপুরুষ, এনাদের কাম ছিল কি ছিল না, আমরা কি করে জানব! হয়ত অবতারদেরও থাকে, শরীরের ধর্ম তো অস্বীকার করা যায় না। ঠাকুরও বলছেন, অবতারও শক্তির আণ্ডারে। কিন্তু ঠাকুর এখানে কাম জয় করার জন্য বলছেন, কারণ আধ্যাত্মিক জীবনে খুব উচ্চ অবস্থায় গিয়ে কাম তার বিরাট শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, কোন না কোন ভাবে ফেঁকড়ি দাঁড়িয়ে যায়। এটা আমার আপনার জন্য নয়। আমরা ওই অবস্থায় গেলে আমাদের সমস্যা হলে, ঠাকুর তখন ঠিক কোন গুরুকে পাঠিয়ে দিয়ে সব জানিয়ে দেবেন। আপনারা যাঁরা শুনছেন, সবাই আপনার সংসারে আছেন, সংসারে আপনাদের একটা ধর্ম আছে। সেইজন্য আমি বলি মহাভারত শুনতে, মহাভারত শুনলে ঠিক ঠিক বোঝা যায়, কিভাবে সংসারধর্ম পালন করতে হয়। এগুলো হল যাঁরা খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী বা খুব উচ্চমানের সাধক তাঁদের জন্য। কথামৃত আসলে সবার জন্য নয়।

ঠাকুর আবার নিজের ছোটবেলার কথায় চলে যাচ্ছেন। গভীর রাত খুব মজার ব্যাপার। আপনি রাত একটা-দুটোর সময় জেগে দেখুন। আপনার আশেপাশে যেই থাকুন, আপনি তাঁর সাথে কথা বলুন, তখন দেখুন, আপনি কি কথা বলছেন। যে কথা বলছেন, বুঝবেন এটাই আপনার ব্যক্তিত্ব। রাত একটা দুটোর সময় জাগ্রত অবস্থায় আপনি কি করতে চাইছেন, দেখুন। যারা মদ্যপ, রাত একটা দুটোর সময় যদি জেগে থাকে, পুরোদমে মদ পান করতে থাকবে। এগুলো দিয়ে বুঝতে হয়, সে কি ধরণের লোক। তবে সেখানে সে একটু শান্ত হতে শুরু করে। সাধুদের খুব সুন্দর একটা ছড়া আছে –প্রথম প্রহর মে হর কৈ জাগে, প্রথম প্রহরে সবাই জাগে। দ্বিতীয় প্রহর মে ভোগী, রাত বারোটা পর্যন্ত যারা ভোগী তারা জেগে থাকে। তৃতীয় প্রহর মে ডাকু তস্কর, এই প্রহরে চোর ডাকাতদের চলাফেরা শুরু হয়। চতুর্থ প্রহর মে যোগী। ভোর তিনটের পর থেকে, কি চারটের পর থেকে যোগী ছাড়া জাগতে পারে না।

স্বামী প্রমেয়ানন্দজী আমাদের সহাধ্যক্ষ ছিলেন, উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওনার সাথে আমার নিয়মিত কথাবার্তা হত। তিনি এই কথাই বলতেন –সাধু মাত্রই ভোর থাকতে উঠবে। রাত দুটো তিনটের সময় আপনি কি করতে ভালবাসেন, বিশেষ করে কারুর সঙ্গে যদি কথা বলেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাবে আপনার ব্যক্তিত্ব কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। রাত দুটোর সময় স্বামী-স্ত্রী যদি ঘর-সংসারের

ঝামেলা নিয়ে কথাবার্তা করে, স্বামীর ঘুম হচ্ছে না, অর্থাভাব চলছে; বুঝতে হবে সমস্যায় পড়ে আছে। ভোগের কথা নিয়ে যদি আলোচনা করে, বুঝতে হবে এরা ভোগে ডুবে আছে। আমি দেখেছি, ট্রেনে পরিচিত কারুর সাথে যাচ্ছি, যেমনি রাত হয়ে গেলে, এই এগারোটা কি বারোটা, তারপর থেকে তাদের সাথে আলোচনা শুরু হত, অবশ্যই তা উচ্চ দর্শনের বিষয় নিয়ে। প্রকৃতি যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন আপনার ভিতরে যেটা আছে সেটা বেরোতে শুরু হয়ে যায়। ঠাকুর যে অল্প একটু ফচকিমি করতেন, এই মজা, সেই মজা করছেন, নৃত্য করছেন, গান করছেন, এগুলো সব বন্ধ, বলে যাচ্ছেন উচ্চ আধ্যাত্মিক পথে কি দেখবেন।

আমার দশ-এগার বৎসর বয়সে যখন ও-দেশে ছিলুম, সেই সময় ওই অবস্থাটি (সমাধি অবস্থা) হয়েছিল; মাঠ দিয়ে যেতে যেতে যা দর্শন করলাম তাতে বিহ্বল হয়েছিলাম। ঠাকুর মাঠ দিয়ে যেতে যেতে দেখেন কালো মেঘের বুক চিরে সাদা বক সারিবদ্ধ ভাবে উড়ে যাচ্ছে, দেখে মন সমাধিতে চলে গেল। কেন হল, আমাদের জানা নেই। এই যে বলছেন, যা দর্শন করলাম তাতে বিহ্বল হয় গেলাম, এখানে বকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বলছেন যা দর্শন করলাম, যেটা উনি দর্শন করলেন, সেটা দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন।

বলছেন, **ঈশ্বরদর্শনের কতকগুলি লক্ষণ আছে। জ্যোতি দেখা যায়, আনন্দ হয়। বুকের ভিতর তুবড়ির মতো গুরগুর করে মহাবায়ু ওঠে**। ঈশ্বরদর্শনের একটা বিরাট লক্ষণ –আনন্দ হয়। আমাদের একজন নামকরা মহারাজ একজন সাধুর নামে বলতেন, 'ওনাকে দেখো, মনে হয় যেন চেরাপুঞ্জি', ওনার পিছনে না, একেবারে সামনেই বলতেন। কেন বলছেন? মুখটা সব সময় ভার করে আছেন। ইংরাজীতে বলে, clouded, ওই জন্য চেরাপুঞ্জি বলতেন, সব সময় মেঘলা। চেরাপুঞ্জিতে সব সময় মেঘলা করে থাকে। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, সেই আনন্দের প্রকাশ চোখ মুখ দিয়ে ফেটে বেরোবে। আপনি তাঁর দর্শন করছেন, আপনার আনন্দ হবে না? কি করে আপনি গোমড়া মুখ নিয়ে থাকবেন, কি করে আপনার জীবনে দুঃখ থাকতে পারে।

কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতা যমরাজের কাছে গেছেন; নচিকেতাকে পরীক্ষা করার পর যমরাজ খুব খুশী, একটা ভাল আধার পেলাম যাকে আত্মার কথা বলা যেতে পারে। সেই সময় ওঁকারের বর্ণনা করতে গিয়ে যমরাজ বলছেন –*স মোদতে মোদনিয়ং হি লব্ধা*। এই যে যোগীরা, সব সময় *মোদনিয়ং*, যেটা পেলে অত্যন্ত আনন্দ পায়, *মোদতে*, আনন্দে ভাসছে। *বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে*, আমি মনে করি নচিকেতা সেই দরজায় পৌঁছে গেছে। আমি ইয়ং ব্রহ্মচারী অবস্থায় কঠোপনিষদ মুখস্ত করেছিলাম, সেই সময় এই মন্ত্রটা আমার এত সুন্দর লেগেছিল, তখন মনে হত, আহা অজান্তায় আমরা সেই বাড়ির দোরগড়ায় এসে গেছি, যে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেই পরম আনন্দ। যাঁরা শুনছেন, আপনারাও সেই বাড়ির সিংহদুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু একটা টোকা দেওয়া বাকি। টোকা মারলেই সেই সিংহদুয়ার খুলে যাবে, আর যেখানে ঢুকবেন সেটা হল সিটি অফ জয়, জয় অফ ক্যাসেল, যেখানে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। এগুলো আমার কথা না, আর ইমোশানালি আমি কোন কথা বলি না –*স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা*। যে জিনিসটাকে পেলে মানুষ আনন্দ করে, সেই জিনিসটাকে তিনি পেয়ে গেছেন, তিনিও আনন্দ করছেন। তারপর আরও আনন্দের কথা বলছেন যমরাজ – *বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে*, নচিকেতা সেই আনন্দপুরীর দরজার দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। আপনারাও তো সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু ভাবুন –ঠাকুর আনন্দস্বরূপ, মা আনন্দস্বরূপিণী, স্বামীজী আনন্দস্বরূপ। স্বামীজীর লেখাগুলো থেকে শুধু শক্তির স্ফুরণ হয়ে যাচ্ছে, শুধু শক্তি, শক্তি, শক্তি। শক্তি মানেই আনন্দ, কাপুরুষদের কখন আনন্দ হয় না। যারা ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ, সব নিকৃষ্ট, এদের কি আনন্দ হবে! এনারা তিনজনই আনন্দস্বরূপ, আনন্দের এক একটা দিক।

ঠাকুর এটাই বলছেন, জ্যোতি দেখা যায়, আনন্দ হয়। যাঁদের জ্যোতিদর্শন হয়, তাঁরাই জানেন, বলে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এই জ্যোতি কোন ফিজিক্যাল আলো নয়, টিউবলাইটের আলো নয়; এ আলো হল চৈতন্যের আলো। এই যে বলছেন, বুকের ভিতর তুবড়ির মতো গুরগুর করে মহাবায়ু ওঠে, এটা হল কুণ্ডলিনী জাগরণের লক্ষণ।

এরপর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরের দিন ভোর হয়েছে, বাবুরাম ও রামদয়াল বাড়ি চলে গেছেন। মাস্টার সেইদিনও আছেন, বলছেন, **সেদিন তিনি ঠাকুরবাড়িতেই প্রসাদ পাইলেন**। মাষ্টারমশাই পরের দিনের অংশটা নবম পরিচ্ছেদে নিয়ে যাচ্ছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে মারোয়াড়ী ভক্তগণসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

সারাদিন কেটে গেছে, এখানে সারাদিনের আর কোন বর্ণনা নেই। বিকাল হয়েছে, মাস্টার ও দু-একটি ভক্ত আছেন। কয়েকজন মারোয়াড়ী ভক্তরা এসেছেন, কলকাতায় ব্যবসা করেন। **তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতেছেন, আপনি আমাদের কিছু উপদেশ করুন। ঠাকুর হাসিতেছেন**। আমাদের কাছেও ভক্তরা আসেন, এসে বলেন, মহারাজ কিছু কথা বলুন। ঈশ্বরের কথা কি খোস গপ্পের মত নাকি। ঠাকুর কিন্তু করুণাসাগর, তিনি বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মারোয়াড়ী ভক্তদের প্রতি) – দেখ, 'আমি ও আমার' এ-দুটি অজ্ঞান। একটু আগে আমরা এই জিনিসটাই আলোচনা করছিলাম। **হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর তোমার এই সব এর নাম জ্ঞান**। যখন বোধ হতে শুরু হয় তখন বোঝা যায় যে, আমি জিনিসটা মনের রাজ্যের, মনের রাজ্য আমিকে নিয়ে চলে। যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি ঈশ্বর, তিনিই সব কিছুর মালিক –এই যে বোধ, এটাই জ্ঞান। Without any emotion এটাকে বোঝা যে –সবটাই তাঁর ইচ্ছাতে চলছে। 'ঠাকুরের ইচ্ছা', এই কথা আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করি। আমরা এখানে এটা বলতে চাইছি না যে যারা 'ঠাকুরের ইচ্ছা' বলছে, তাদের জ্ঞান হয়ে গেছে। আমরা বলতে চাইছি, যদি আপনি ভাব আরোপ করতে চাইছেন, সেটা তো আমরা এমনিই বুঝতে পারব; আপনি তো আচার্য নন যে আমাকে উপদেশ দেবেন। এগুলো হল, একটা উচ্চ জিনিসকে সাধারণ বানিয়ে দেওয়া। এতে নিজের যেমন ক্ষতি হয়, যারা শুনছে তাদেরও ক্ষতি হয়, এগুলো করতে নেই।

আর 'আমার' কেমন করে বলবে? কথামৃতে এই লাইনটা আণ্ডারলাইন করে রাখতে পারেন। **বাগানের সরকার বলে, আমার বাগান, কিন্তু যদি কোন দোষ করে তখন মনিব তাড়িয়ে দেয়, তখন এমন সাহস হয় না যে, নিজের আমের সিন্দুকটা বাগান থেকে বের করে আনে**। এই জীবনটা কি আশ্চর্যের। আগেকার দিনে বড় বড় বাগান থাকত, বাগানবাড়ি থাকত, সেখানে কর্মচারী রাখা হত। সেই কর্মচারী বলে, আমার বাগান। মালিক যদি কোন কারণে রেগে গিয়ে তাকে বরখাস্ত করে বাইরে বার করে দেয়, সে আর ভিতরে ঢুকতে পারবে না। এতদিন আমরা এই সংসারে, এই জগতে এসে আমার আমার করতে থাকলাম, এক মুহুর্তের মধ্যে সব শেষ। আমার আপনার সাথে এটাই দিনরাত হচ্ছে। মৃত্যু আসবে, এসে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলে যাবে।

কিছু দিন আগে আমরা মহারাজরা অনেকে মিলে মজা করে গল্প করছিলাম। সেখানে আমি বললাম, আমার খুব ইচ্ছে, করোনা আমাদের কি কি শিক্ষা দিয়েছে, পয়েন্ট করে সাজিয়ে লিখে ফেসবুকে ছেড়ে দিই। যেমন এক নম্বর –ক্রেডিট কার্ডে বিশ্বাস করো না। যা আয় করছ তার পঞ্চাশ ভাগ বা দুই তৃতীয়াংশ ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে রাখ। এই শিক্ষা করোনা দিয়েছে। ধর্মের জগতে সবচেয়ে বড় শিক্ষা – organized religion completely collapsed, মন্দিরে যাওয়া, মসজিদে

যাওয়া, গীর্জায় যাওয়া, completely collapsed। বেলুড় মঠ বন্ধ, দক্ষিণেশ্বর বন্ধ, কালীঘাট বন্ধ, সমস্ত মসজিদ, চার্চ বন্ধ। কি থাকবে তাহলে? হিন্দুদের সেই প্রাচীন কথা –ঘরে বসো, সম্ভব হলে একটা ছোট্ট ঘরকে ঠাকুর ঘর করে রাখ, সেখানে বসে শুধু গায়ত্রী জপ কর। মন্ত্র জপ কর, ধ্যান কর। তুমি রিচুয়ালিস্টিক? গণেশ, সূর্য আদি পঞ্চ দেবতার পূজা কর। যা করবে, নিজের ভিতরে, ঠাকুর যেমন বলছেন –মনে বনে কোণে। প্রত্যেকটি ঘর যেন বন হয়ে গেছে, কেউ আসে না, কেউ যায় না। কোন লোকজন আসে না, বাড়িটাই কোণা হয়ে গেছে। মন আপনার, মনে বনে কোণে হাতের মুঠোয়, জপ করুন, ধ্যান করুন। এটাই ঠিক ঠিক ধর্ম –করোনা এই শিক্ষা দিল। Congregational ধর্ম, যেখানে সবাই মিলে এক সঙ্গে পূজা করছি, প্রার্থনা করছি; সমস্ত বন্ধ। তার মানেই হল, যে জিনিসটা বিপদ অবস্থায় থাকে না, বুঝবেন ওটা সত্য নয়।

মৃত্যু এসে যখন আমাদের টেনে নিয়ে চলে যায়, তখন আম কাঠের সিন্দুক দূরে থাক, একটা কাগজের টুকরোও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তার মানে বাড়ি, জমি, টাকা, আত্মীয়, বন্ধু কোন কিছুই আপনার নয়। মনুস্মৃতিতে পরিষ্কার বলছেন, মানুষ যখন মরে যায়, কেউ সঙ্গে যায় না, সঙ্গে যায় শুধু তার ধর্ম। যাকে আপনি যত ভালবাসুন, বাবা হোক, মা হোক, স্ত্রী হোক, সন্তান হোক, স্বামী হোক, কেউ কিছু না। সব সময় এটা মনে রাখতে হবে, মৃত্যু যখন আসবে, মৃত্যু ভয় যখন আসবে, তখন আপনার সঙ্গে কি থাকছে দেখুন। যেটা থাকছে সেটাই আসল আপনি, শুধু সেখানে নিজেকে ফোকাস করুন। ওখানে ফোকাস করুন সত্যি সত্যি আপনি মহাপুরুষ হয়ে যাবেন।

করোনা আমাদের সব কিছু আজ ভেঙে দিয়ে গেছে। কি ভেঙে দিয়েছে? কারুর উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না, বন্ধুর উপর নির্ভর করতে পারি না, আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভর করতে পারি না, মন্দির, মসজিদ, গীর্জার উপর নির্ভর করতে পারি না, Community prayers করতে পারি না; যা করব, নিজের উপরে নির্ভর করে করতে হবে। বেদান্ত প্রথম থেকে এই একই কথা বলে আসছে। ঠাকুর যে এখানে বলছেন, তাতে বলছেন – কাঠের যে সিন্দুক সেটাও নিয়ে যাবার জো নাই। আপনার কোন কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না, কোন কিছুই না। তাহলে আমাদের এত 'আমার' 'আমার' করে কি লাভটা হচ্ছে? অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। কত সময়, কত শক্তি, কত ইমোশানস, কত সম্পদ লাগাচ্ছি, কিসের জন্য লাগাচ্ছি একবার ভাবুন।

কাম, ক্রোধ আদি যাবার নয়; ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। কামনা, লোভ করতে হয় তো ঈশ্বরকে পাবার কামনা, লোভ কর। বিচার করে তাদের তাড়িয়ে দাও। হাতি পরের কলাগাছ খেতে গেলে মাহুত অঙ্কুশ মারে। আমরা এর উপর আগে কয়েকবার বিস্তারে আলোচনা করেছি। মহাভারতে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কাহিনীতে ঔর্ব মুনির কাহিনী আছে, সেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে ইমোশানসকে রূপান্তরিত করে দেওয়া যায়। ঠাকুর এখানে ইমোশানসগুলিকে সত্য রূপে নিচ্ছেন, এগুলো আমাদের ভিতরে আছে। ইমোশানস সব সময় একটা expression খোঁজে। যাদের ভিতররে ভালবাসা আছে, কুকুর বেড়ালকে ভালবেসে ইমোশানসকে express করে দিচ্ছে। এগুলোকে ঈশ্বরের দিকে মোর ফিরিয়ে দিতে হয়। এই বলে ঠাকুর একটা খুব মূল্যবান কথা বলছেন।

তোমরা তো ব্যবসা কর, ক্রমে ক্রমে উন্নতি করতে হয় জানো। বইতে এই লাইনটা খুব সুন্দর করে আণ্ডারলাইন করুন, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। জীবন মানেই evolve, evolve, evolve, চড়োইবেতী, চড়োইবেতী। গত এক বছরে আপনি কতটা উন্নতি করেছেন? এক বছর একটু কম সময়, ঠিক আছে, গত পাঁচ বছরে কি উন্নতি করেছেন? যিনি আপনাকে কাছ থেকে জানেন, দূর থেকে জানেন, পাঁচ বছর পর আপনাকে দেখে তাঁরা আপনাকে নিয়ে কি বলছে দেখুন। আমি যে লেখালেখি করি, এটা আমার জীবনধারা না। আমার হাতে প্রচুর সময় আছে, সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছি এই যা, এতে আমার কোন আগ্রহ নেই। চারজন মানুষ পড়ে ভাল বললে, ভাল লাগে; এর বেশি কিছু না। আমার পরিচিত

লোকেরা দেখা হলে বলে, আপনি এখন কি লিখছেন? নূতন কি বই বেরোল? আরে ভাই, আমি আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করছি। ওনারা ঠিক ওই অর্থে বলছেন না, কিন্তু মূলটা তাই, আপনি কতটা এগোলেন। আপনার সঙ্গে দু-বছর পর যদি দেখা হয়, আমি এটাই জিজ্ঞেস করব, এই দু-বছরে আপনি কতটা এগোলেন। বাচ্চাদের আমরা যেমন জিজ্ঞেস করি, এখন তুমি কোন ক্লাশে পড়ছ? আসলে আমরা জানতে চাইছি, কতটা তুমি এগিয়েছ।

আপনি কি এগোচ্ছেন? চাকরি যাঁরা করেন, তাঁর প্রমোশন চান; যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁরা ব্যবসাকে বাড়াতে চান; ব্যাঙ্কে, এলআইসিতে যারা টাকা রাখে, তারা সুদের মারফতে নিজের সম্পত্তি বাড়াতে চান। আপনার যে ব্যক্তিত্ব; আধ্যাত্মিক জগৎ, মনের জগৎ; এই দুটো জগতে কি আপনি এগোচ্ছেন? অদ্বৈত আশ্রমে থাকার আমার এক বন্ধু ছিলেন, ফিজিক্সের বিরাট পণ্ডিত আবার সংস্কৃতেও পণ্ডিত ছিলেন, ইলেক্ট্রনিকসের অভিজ্ঞ ছিলেন। উনি কখন-সখন আসতেন, ওনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগত। উনি স্বামী অভেদানন্দজীর প্রচুর সঙ্গ করেছেন, তখন ওনার বয়স খুব কম ছিল। উনি বলতেন, স্বামী অভেদানন্দজীর কাছে গেলেই উনি জিজ্ঞেস করতেন, আজকাল তুমি কি বই পড়ছ? এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন আমার কথা হত তখন আমার বয়স খুব কম ছিল, ব্রহ্মচারী ছিলাম; কথাটা আমার খুব সুন্দর লেগেছিল। উনি যখনই মহারাজের কাছে যেতেন খুব সজাগ থাকতেন, বই তিনি প্রচুর পড়তেন, তাও খুব সজাগ থাকতেন, মনে রাখার চেষ্টা করতেন এই কদিনে আমি কি কি বই পড়েছি, বইগুলোর নাম যেন ঠিক ঠিক বলতে পারি। পরেও উনি বইয়ের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছেন।

আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন, যাঁরা নিয়মতি ভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা ইদানিং আপনি কি বই পড়ছেন? আমিও আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, শেষ যেদিন দেখা হল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কি কি বই পড়েছেন? হ্যাঁ মহারাজ, কথামৃত পড়েছি। আরে ওটা তো আপনার ওয়ে অফ লাইফ। রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করার পর এক বছর কি দু-বছর হয়েছে। বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্বামী সুহিতানন্দজী তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমার সন্ন্যাস জীবনের হাতেখড়ি ওনার হাতে। উনি একটা কথা বলেছিলেন, তখন আমার এত সুন্দর লেগেছিল যে এখনও মনের মধ্যে গেঁথে আছে। 'দেখ, তুমি ঠাকুরের ভাবধারায় এসেছ, ঠাকুরের কথা জানবে, হিন্দু ধর্মের কথা জানবে, এটাই তোমার স্বাভাবিক। কিন্তু এর বাইরে অন্য ধরণের কথাও তোমাকে জানতে হবে'। আমি দেওঘরে ওনার ছাত্র ছিলাম, ক্লাশ সেভেন-এইটে ওনার কাছে আমি ইংরাজী শিখেছিলাম। পরে আমি বই লিখলাম, World of Religions, পাবলিশ হওয়ার পর প্রথম বইটা নিয়ে ওনার কাছে গেলাম, হাতে বইটা দিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে বললাম, মহারাজ, আপনার কাছে ইংলিশ শিখেছিলাম; জয়েন করার পর আপনি বললেন, নিজের ধর্ম তো সবাই জানে, অপরের ধর্মও তোমাকে জানতে হবে। আপনার প্রেরণায় বিশ্বের আটটা ধর্মকে নিয়ে এই বইটা লিখলাম, বইটা আপনাকে প্রণামী দিচ্ছি। এখানে আমি আমার স্তুতি করছি না, আইডিয়া হল, সচেতন হতে হয়, ঠাকুর যেমন বলছেন, তোমরা তো ব্যবসা কর, ক্রমে ক্রমে উন্নতি করতে হয় জানো। Are you evoloving?

কেউ আগে রেড়ির কল করে, আবার বেশি টাকা হলে কাপড়ের দোকান করে। তেমনি ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যেতে হয়। হল, মাঝে মাঝে দিন কতক নির্জনে থেকে বেশি করে তাঁকে ডাকলে।

তবে কি জানো? সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগকর্ম অনেক বাকি থাকে। তাই জন্য দেরিতে হয়। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলছেন, সন্ন্যাসী কারুর বাড়ি গিয়ে দুটো পয়সা চাইলে গৃহস্থ দিয়ে দেবে। কিন্তু প্রথমেই যদি একেবারে কাশীর ভাড়া চেয়ে বসে, কে দেবে? কাল আপনি ধর্মের কথা শুনলেন, পরের দিন থেকে বলতে শুরু করলেন, কই আমার তো ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে না। তা কি কখন হয় নাকি? ক্রমে ক্রমে হয়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, *শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া,*

শনৈঃ শনৈঃ ধীরে ধীরে ওটাকে ধরে টেনে তুলতে হয়। ঠাকুর বলছেন, কারু কারু ভোগকর্ম অনেক বাকি থাকি, সেইজন্য এদের অনেক দেরীতে হয়।

ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে। ছেলে বলেছিল, মা, এখন আমি ঘুমুই আমার বাহ্যে পেলে তখন তুমি তুল। মা বললে, বাবা, বাহ্যেতেই তোমায় তুলবে, আমায় তুলতে হবে না। সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। যতই আপনি আম গাছের গোড়ায় জল দিন না কেন, যখন সময় হবে তখন আম গাছে মুকুল আসবে, ফল ফলবে।

এরপর কিছু কথা বলার পর ঠাকুর বলছেন – **সর্বদা তাঁর নাম করতে হয়। কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখতে হয়। আমার পিঠে ফোঁড়া হয়েছে, সব কাজ করছি, কিন্তু মন ফোঁড়ার দিকে রয়েছে। রামনাম করা বেশ। যে রাম দশরথের ছেলে; আবার জগৎ সৃষ্টি করছেন; আর সর্বভূতে আছেন। আর অতি নিকটে আছেন। অন্তরে বাহিরে। এই বলে খুব নামকরা হিন্দি ছড়া বলছেন**।

ওহি রাম দশরথকী বেটা,
ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা,
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সব সে নিয়ারা।

ছড়ার প্রথম লাইনটা ভুল আছে, মাস্টারমশাই হিন্দিটা হয়ত ভাল জানতেন না, লাইনটা হবে যো রাম দশরথকা বেটা।